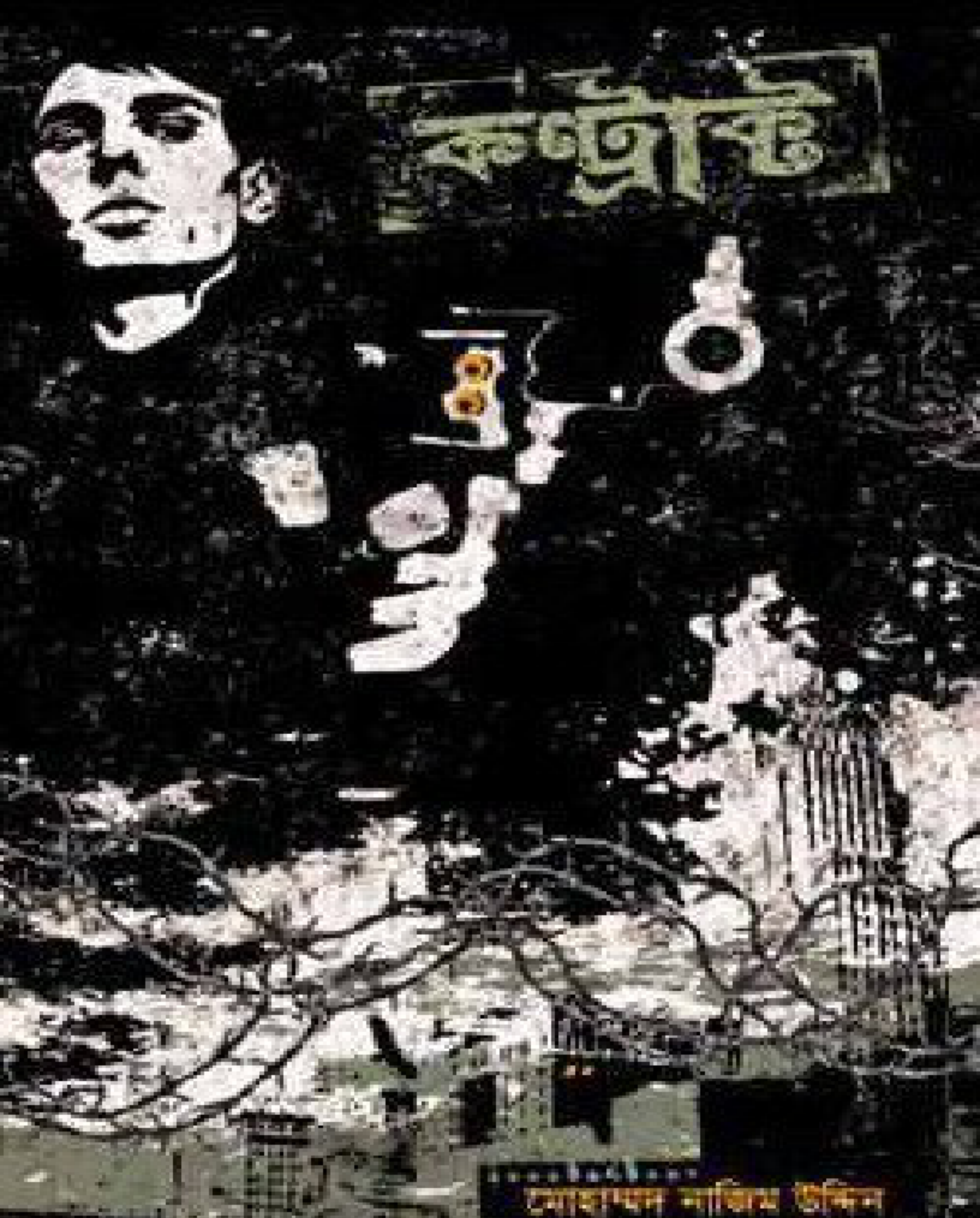

কন্ট্রাক্ট
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

বাতিঘর প্রকাশনী

কন্ট্রাক্ট

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

ষষ্ঠ সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৭
পঞ্চম সংস্করণ : অক্টোবর ২০১৬
চতুর্থ সংস্করণ : মার্চ ২০১৫
তৃতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১২
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০১১

২০২১ সালে এর ওয়েবসিরিজ তৈরী হয়

প্রচ্ছদ : সিরাজুল ইসলাম নিউটন

বাতিঘর প্রকাশনী
৩৭/১ বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তল), ঢাকা-১১০০
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কতৃক প্রকাশিত
মুদ্রণ: একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট
৩৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
কম্পোজ: লেখক

নেমেসিস পড়ার পর যারা আমাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে, যারা আমাকে উৎসাহ দিয়েছে, যারা বিশ্বাস করে বাংলা ভাষায় বিশ্বমানের মৌলিক-থ্রীলার লেখা সম্ভব...

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় থাকে না।) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এ

এই সময়: কলকাতায় চিকিৎসা করাতে এসে রহস্যজনকভাবে খুন হয়ে গেলেন বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম আনার (৫৬)। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও ঝিনাইদহ-৪ এর সাংসদের দেহ উদ্ধার করা যায়নি। নিউটাউনের অ্যাকোয়াটিকা ওয়াটার পার্ক লাগোয়া সঞ্জীবা গার্ডেন নামে একটি অভিজাত আবাসনে তাঁকে কয়েকজনের সঙ্গে শেষবারের মতো ঢুকতে দেখা গিয়েছিল। পুলিশ ওখানকার একটি ফ্ল্যাটে রক্তের দাগ খুঁজে পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গত ১৩ মে সন্ধ্যা থেকে আজিম নিখোঁজ ছিলেন। আওয়ামি লিগের এই সাংসদকে পরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

মঙ্গলবার ঢাকায় এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'খুনের ঘটনায় জড়িত আমানুল্লা, ফয়জল ও মুস্তাফা নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি (গোয়েন্দা শাখা)। খুনের মোটিভ নিয়ে বাংলাদেশ ও ইন্ডিয়ার পুলিশ একযোগে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক আমাদের যতটুকু করা দরকার, তা আমরা করছি। ভারতের কেউ এতে জড়িত নয়। এখনও পর্যন্ত যা খবর, তাতে আমাদের দেশের লোকেরাই সাংসদকে খুন করেছে।' এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সিআইডি-র আইজি অখিলেশ চতুর্বেদী বলেন, '১৮ তারিখ বরাহনগর থানায় সাংসদের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে ডায়েরি করেন গোপাল বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি। ২০ তারিখ বিদেশ মন্ত্রক থেকে রাজ্য সরকারকে সাংসদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার দ্রুত তদন্ত করতে বলা হয়। ২২ তারিখ আমরা একটি ইনপুট পাই যে ওঁকে খুন করা হয়েছে। যদিও আমরা এখনও দেহ উদ্ধার করতে পারিনি।' অন্যদিকে, বাংলাদেশে এই ঘটনার তদন্তে যুক্ত ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ বলেন, 'কয়েকজন অপরাধীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন সাংসদ। মোটিভ বুঝতে তদন্ত চলছে।' তবে, এই খুনের ঘটনার পিছনে কোনও ব্যবসায়িক কারণ, নাকি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি।

তিনবারের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম আনারের বাড়ি ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের মধুগঞ্জ বাজার এলাকায়। মাঝেমধ্যেই তিনি কলকাতায় আসতেন

গ্রেপ্তার ৩ অভিযুক্ত

স্নায়ুরোগের চিকিৎসার জন্য। এবারও ডাক্তার দেখানোর কথা বলে গত ১২ মে দর্শনা সীমান্ত দিয়ে এদেশে প্রবেশ করেন সাংসদ। বাংলাদেশের পতাকা লাগানো সাইকেল ভ্যানে তিনি গেদে সীমান্তে প্রবেশ করছেন, এমন একটি ভিডিয়োয় তাঁকে দেখা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, কলকাতায় এসে



আনোয়ারুল আজিম আনার

বরাহনগরের সিঁথি এলাকায়
ব্যবসায়ী বন্ধু গোপাল বিশ্বাসের ব
ওঠেন সাংসদ। ১২ তারিখ রাতে
সেখানেই ছিলেন। ১৩ তারিখ
একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করেন।
পৌনে দুটো নাগাদ গোপাল
জানান, তাঁর গাড়ি সেদিন নেই,
বাইরে গেলে যেন গাড়ির ব্যবস্

নির্জন করিডোর দিয়ে অ্যাপ্রোন পরা এক লোক ভীরু পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই হাসপাতালে বছর তিনেক ধরে কাজ করছে, এই করিডোর দিয়ে অসংখ্যবার যাওয়া আসা করেছে তারপরও আজ একটু নার্ভাস। নিজের হাটার মধ্যে যে অস্বাভাবিকতা আছে সেটা কোনোভাবেই দূর করতে পারছে না। কাজটা করবার জন্য যখন রাজি হয়েছিলো তখন ভেবেছিলো তেমন একটা কঠিন হবে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে হাসপাতালের এই সুদীর্ঘ করিডোরটা যেনো শেষ হবার নয়। ডাক্তার হিসেবে এরকম নার্ভাস হওয়া তার সাজে না, কিন্তু এটাও তো ঠিক কাজটা ডাক্তারি বিদ্যার সাথে একদমই খাপ খায় না।

বাম দিকে মোড় নিতেই করিডোরের শেষ মাথায় যে কেবিনটা আছে সেটা দেখতে পেলো। এই হাসপাতালের সবচাইতে সুরক্ষিত কেবিন। কেবিনের সামনে যথারীতি দু'জন কনস্টেবল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। না, পুলিশ নিয়ে তার দুশ্চিন্তা নেই। বরং তাদেরকে দেখে একটু সাহসই পেলো, ওদেরকে ম্যানেজ করা হয়েছে। তার দুশ্চিন্তা অন্য লোকগুলোকে নিয়ে। তাদেরকে অবশ্য দেখতে পাচ্ছে না। আশেপাশে আছে কিনা সে ব্যাপারেও নিশ্চিত নয়। হয়তো ক্যান্টিনে গেছে। বিকেলের এই সময়টাতে তারা কিছুক্ষণের জন্যে ক্যান্টিনে যায়। কয়েক দিনের অবজার্ভেশনে এটা জানতে পেরেছে সে। ঠিক এটাই চেয়েছিলো। ঠিক সময়েই এসেছে তাহলে।

৭ নাম্বার কেবিনের সামনে আসতেই কনস্টেবল দু'জন তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তাদের দৃষ্টিতে কিছু একটা আছে। ডান দিকের কনস্টেবল গেটের তালা খুলে দিলে একটু থেমে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো ডাক্তার মুহতাসিম বিল্লাহ।

***

মিরাজ শেখ প্রবল উত্তেজনা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে হনহন করে উঠে গেলো। তার সারা শরীরে রক্ত টগবগ করছে। প্রতিবারই এমন হয়। কাজটা করার আগে হাত-পা পর্যন্ত কাঁপতে থাকে। ভয়ে নয়, উত্তেজনায়!

আজকের উত্তেজনাটা আরো বেশি। কোনো শিকারী যদি দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর শিকারকে বাগে পেয়ে যায় তাহলে এমনই তো হবে। মিরাজ শেখের ইচ্ছে হলো শিষ বাজাবে, কিন্তু সেটা করা ঠিক হবে না। করিডোরে এসে দু'পাশে তাকালো। এ সময় যেমন থাকার কথা-একেবারে ফাঁকা। এটা হলো ভিআইপিদের জায়গা। যে কেউ ইচ্ছে করলেই এখানে আসতে পারে না, কিন্তু মিরাজ শেখ পারে, কারণ এই হাসপাতালের তৃতীয়শ্রেণী কর্মচারি ইউনিয়নের ছোটোখাটো এক নেতা সে।

বড়সড় তালা মারা একটি দরজার সামনে এসে থামলো সে। পকেট থেকে চাবিটা বের করে তালা খুলে ঢুকে পড়লো ভেতরে। এটা একটা স্টোররুম। পাঁচ-দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে তাকে। তারপরই অবসান হবে দীর্ঘ প্রতীক্ষার।

***

কেবিনে ঢুকেই ডাক্তার মুহতাসিম বিল্লাহ দেখতে পেলো ভিআইপি রোগী নিজের বিছানায় শুয়ে এক পায়ের উপর আরেক পা ভাঁজ করে রেখে পায়ের পাতা দুলিয়ে যাচ্ছে। প্রতীক্ষায় থেকে থেকে অধৈর্য হয়ে গেছে সে।

হালকা করে কাশি দিলো ডাক্তার। ভিআইপি রোগী চমকে উঠলো না। ডাক্তারকে দেখেই বিছানা থেকে নেমে এগিয়ে এলো। রোগী কে নিঃশব্দে সালাম ঠুকলো মুহতাসিম বিল্লাহ। দু'জন মানুষ কিছুই বললো না। বলার দরকারও নেই। ডাক্তার তার অ্যাপ্রোনের পকেট থেকে ছোট্ট একটা জিনিস বের করে ভিআইপি রোগী র হাতে তুলে দিলো। রোগী জিনিসটা হাতে নিয়ে আর দেরি করলো না, ঢুকে পড়লো কেবিনের অ্যাটাচড় বাথরুমে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলো ডাক্তার। আর দেরি করলো না, বের হয়ে গেলো কেবিন থেকে।

করিডোর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাবার সময় ডাক্তার মুহতাসিম বিল্লাহ নিজের খুশিটা আর চেপে রাখতে পারলো না। সামান্য একটা কাজ অথচ কতো ভয়ই না সে পেয়েছিলো। যাক,

শেষ পর্যন্ত কাজটা ঠিকঠাকমতোই করতে পেরেছে। জীবনে এতো অল্প সময়ে পাঁচ লক্ষ টাকা রোজগার করে নি। হ্যাঁ, পুরো পাঁচ লাখ। আর সেটা অগ্রীম।

ডাক্তার মুহতাসিম বিল্লাহ তার প্রিয় একটা গানের শিষ বাজাতে বাজাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

ওদিকে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে এইমাত্র ডাক্তারের কাছ থেকে পাওয়া মোবাইল ফোনটা সুইচ টিপে চালু করলো ভিআইপি রোগী । নেটওয়ার্ক পেতেই কন্ট্যাক্ট থেকে একটা নাম্বার ডায়াল করলো সে। চার-পাঁচবার রিং হবার পর ওপাশ থেকে কলটা রিসিভ করা হলো।

"ওয়ালাইকুম সালাম..." বললো ভিআইপি রোগী ।

***

মিরাজ শেখ স্টোররুমের ভেতর একটা চাদর বিছিয়ে শুয়ে আছে। ভেতরের মালপত্র সরিয়ে আজ সকালেই বিছানাটা তৈরি করে রেখেছিলো সে। তার হাতে কোনো ঘড়ি নেই, তারপরও অনুমাণ করতে পারলো মাত্র দু'তিন মিনিট অতিক্রম হয়েছে। এই ভবনের পাশে যে বড় বিল্ডিংটা আছে সেখান থেকে কারো আসতে কম করে হলেও পাঁচ-দশ মিনিট তো লাগবেই। নিজেকে প্রবোধ দিলো সে।

হঠাৎ একটা চাপা কণ্ঠস্বর তার কানে এলে কিছুটা চমকে ঘরের ভেতরটা তাকিয়ে দেখলো। কোত্থেকে আসছে? বুঝতে পারলো না। কিন্তু চাপা কণ্ঠস্বরটা খুব কাছ থেকেই যে আসছে সেটা বুঝতে পারলো। আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। বেশ ভারিক্কি গলার একজন মানুষ কথা বলছে। কণ্ঠটা বেশ সতর্ক, জোর করে চেপে রাখার চেষ্টা করছে, কিন্তু ভারিক্কি গলার কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না।

মিরাজ শেখ তার বাম দিকের দেয়ালে তাকালো। দেয়ালটা তার থেকে মাত্র দুই ফুট দূরে। আগে এখানে একটা বেসিন ছিলো। বছর দুই আগে এই বাথরুমটাকে স্টোররুম বানানো হয়েছে। বেসিনটা যেখানে ছিলো সেখানে এখনও পানির পাইপের দাগ রয়ে গেছে। মাটি থেকে দেড় ফুট উঁচুতে একটা ফুটো আছে। এখান দিয়ে পানির পাইপ চলে গেছিলো। এতোদিন স্টোররুমে রাখা কার্ডবোর্ড বাক্সের আড়ালে ছিলো ফুটোটা, কিন্তু আজ সকালে কিছু বাক্স সরিয়ে বিছানা তৈরি করার ফলে ফুটোটা দৃষ্টির গোচরে চলে এসেছে। এটার ব্যস দুই ইঞ্চির বেশি হবে না। আওয়াজটা সেখান দিয়েই আসছে। মিরাজ শেখ আস্তে করে ফুটোটায় চোখ রাখলো।

***

৭ নাম্বার কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কনস্টেবল দু'জন দেখতে পেলো সাদা পোশাকের এক অফিসার তাদের দিকে ছুটে আসছে। কনস্টেবল দু'জন একে অন্যের দিকে তাকালো। শালারা কেমনে টের পায়! ডান দিকের কনস্টেবল জোরে একটা কাশি দিলেও বুঝতে পারলো এতে কোনো লাভ হবে না, কারণ কেবিনের ভেতরে ভিআইপি রোগী এখন বাথরুমের ভেতর আছে।

"ভেতরে কে আছে?" অফিসার জানতে চাইলো কনস্টেবল দু'জনের কাছে।

"কেউ নাই, স্যার..." তাদের মধ্যে একজন জবাব দিলো।

"আমি শুনলাম ভেতরে নাকি একটু আগে একজন ডাক্তার ঢুকেছিলো?" ভুরু কুচকে জানতে চাইলো সে।

হায় আল্লাহ! এরা কি সব দ্যাখে নাকি!

"ঢুকছিলো, বাইর হয়া গেছে, স্যার," অন্য একজন কনস্টেবল বললো।

"কোন্ ডাক্তার ঢুকেছিলো?" অফিসারের প্রশ্নটা শুনে কনস্টেবল দু'জন চুপ মেরে রইলো। যদি বলে ডাক্তারকে চেনে না তাহলে দায়িত্বের অবহেলার শাস্তি জুটবে।

"ডাক্তার মুহতাসিম, স্যার।"

সাদা পোশাকের অফিসারকে বেশ সন্দিহান দেখালো। "তালা খোলো।"

সঙ্গে সঙ্গে একজন কনস্টেবল দরজার তালা খুলে দিলে অফিসার কেবিনের ভেতর ঢুকেই দেখতে পেলো ভিআইপি রোগী টি বিছানায় নেই। বাথরুমের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। আস্তে করে বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে কান পাতলো সে। ভেতর থেকে যে কথাবার্তা ভেসে আসছে সেটা পরিস্কার শুনতে পেলো না কিন্তু কেউ একজন যে কারো সাথে ফোনে কথা বলছে সেটা বুঝতে বাকি রইলো না। আর সেই লোকটি হলো ভিআইপি রোগী , যাকে পাহারা দেবার দায়িত্ব নিয়ে তারা কয়েকজন দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা পালাক্রমে এখানে থাকে।

দরজায় সজোরে লাথি মারলো অফিসার। পর পর তিনটি। “দরজা খুলুন! দরজা খুলুন!” চিৎকার করে বললো সে। কোনো সাড়াশব্দ নেই। অস্থির হয়ে আবারো লাথি মারলো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কনস্টেবল দুজন কেবিনের ভেতর উঁকি মারতেই অফিসার তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো, “এদিকে আসো...দরজায় লাথি মারো!...জলদি!”

কনস্টেবল দু’জন পর পর কয়েকটা লাথি মারলেও দরজাটা ভাঙলো না। এদিকে সাদা পোশাকের অফিসার ওয়াকিটকিতে খবরটা জানিয়ে দিতে শুরু করলো তার লোকজনকে।

হঠাৎ বাথরুমে ফ্ল্যাশ করার শব্দ শুনে অফিসার চিৎকার করে বললো, “স্যার! কোনো লাভ হবে না...কোনো লাভ হবে না!” এরপর আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলো না। কনস্টেবল দুজনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে রেগেমেগে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি মারলো দরজায়। দরজাটা তো খুললোই চৌকাঠ পর্যন্ত নড়বড়ে হয়ে গেলো।

অফিসার বাথরুমের ভেতর ঢুকেই দেখতে পেলো ভিআইপি রোগী কমোডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কমোডটা ফ্ল্যাশ করে দেয়া হয়েছে। এখনও সেটা পানি ফ্ল্যাশ করে যাচ্ছে।

“কমোডে ফেলে দিয়েছেন!” বলেই ভিআইপি রোগী র কাছে এসে একেবারে তার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বললো অফিসার। রোগী র নাক আর তার নাকের মধ্যে মাত্র এক ইঞ্চির কম দুরত্ব। “লাভ হবে না...আমরা ঠিকই বের করতে পারবো!”

ভিআইপি রোগী অফিসারের মারমুখি আচরণে মোটেও ভয় পেলো না। মুচকি হেসে বললো, “আমার সাথে আজেবাজে কথা বলবে না।” অফিসারকে অনেকটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে বাথরুম থেকে বের হয়ে গেলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো আরো ছয়-সাতজন লোক। তারা সবাই গোয়েন্দা সংস্থার সাদা পোশাকধারী।

“কি হয়েছে?” গোয়েন্দাদের একজন জানতে চাইলো।

“মোবাইলটা কমোডে ফ্ল্যাশ করে দিয়েছে,” বাথরুম থেকে বের হতে হতে অফিসার জবাব দিলো।

ভিআইপি রোগী নিজের বিছানায় বসে নির্বিকারভাবে চেয়ে রইলো তাদের সবার দিকে। তার চারপাশে গোয়েন্দার দল।

সাদা পোশাকের অফিসার সবার উদ্দেশ্যে বললো, “গেটটা সিকিউর করো...আর ডাক্তার মুহতাসিম বিল্লাহকে অ্যারেস্ট করো, এক্ষুণি।”

ঘর থেকে তিনজন সাদা পোশাকধারী বেরিয়ে গেলেও বাকিরা থেকে গেলো।

“এই দুই বানচোতকেও অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে হবে,” কনস্টেবল দু’জনকে দেখিয়ে বললো। তাদের চোখেমুখে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। ওদের রিপ্লেসমেন্ট করো...পরে আমি বানচোত দুটোকে দেখবো।”

অফিসার আবারো ঢুকে পড়লো বাথরুমে। যদিও জানে কিছুই পাবে না, তারপরও কী মনে করে ঢুকলো সে নিজেও জানে না। বাথরুমটার চারপাশে চোখ বুলালো। একটা কমোড আর একটা লোপ্যান ছাড়াও মাঝারি সাইজের বেসিন আর শাওয়ার ট্যাপ আছে। বাথরুমটা বেশ বড়। আজকাল এরকম বড় বাথরুম কেউ বানায় না। হাসপাতালটা অবশ্য ত্রিশ-চল্লিশ বছরের পুরনো। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বের হতে যাবে অমনি আবার ফিরে তাকালো। কিছু একটা তার চোখে ধরা পড়েছে।

বেসিনের নীচে দেয়ালে একটা ফুটো!

ফুটোটা বেশ বড়। ব্যস দুই ইঞ্চির কম হবে না। দেখেই বোঝা যায় এক সময় ওখান দিয়ে পানির পাইপ চলে গিয়েছিলো দেয়ালের ওপাশে।

হাটু গেঁড়ে উপুড় হয়ে ফুটোটাতে চোখ রাখতে যাবে অমনি একটা কিছু লক্ষ্য করলো অফিসার।

ফুটো দিয়ে যে মৃদু আলো আসছিলো সেটা যেনো হুট করে মিইঁয়ে গেলো।

দ্রুত উঠে দাঁড়ালো সে। ঘর থেকে বের হতে হতে হাতে তুড়ি বাজিয়ে তর্জনী উঁচিয়ে সাদা পোশাকধারীদের উদ্দেশ্যে বললো, “দু’জন আমার সাথে আসো...বাকিরা এখানেই থাকো!”

ভিআইপি রোগী এই প্রথম একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো, সে বুঝতে পারছে না কী হয়েছে। নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে দরজার দিকে চেয়ে রইলো। হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সাদা পোশাকের তিনজন লোক।

ব্যাপারটা কী?

ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বাজার পনেরো মিনিট আগে হোটেল র‍্যাডিসনের সামনে এসে থামলো এক লোক। রোদে পোড়া গায়ের রঙ। পরনের সবকিছু কালো, শুধু চশমাটা সিলভার রঙের। তার চোখে কোনো সমস্যা নেই, চশমাটা একেবারে ভিন্ন একটি কারণে ব্যবহার করছে।

ইচ্ছে করেই পনেরো মিনিট আগে এসেছে। রাস্তার ওপার থেকে হোটেলটা ভালো করে দেখে দ্রুত রাস্তা পার হয়ে গেলো সে।

হোটেলের ভেতর পার্কিং এরিয়ায় এসে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো। খুঁজে পেতে তেমন অসুবিধা হলো না। হলুদ রঙের গাড়িটা অন্য সব গাড়ির মাঝে চট করেই চোখে পড়লো। এই রঙের গাড়ি খুব কমই ব্যবহার করা হয়। পকেট থেকে একটা চাবি বের করে গাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আরেকবার চারপাশটা দেখে নিলো ভালো করে। প্যাসেঞ্জার সিটের দরজা খুলে সিটের উপর থেকে একটা জিনিস বের করলো। একটি সুটের জিপারব্যাগ।

দরজা লাগিয়ে হ্যাঙ্গারটা একহাতে ধরে ব্যাগটা নিয়ে এগিয়ে গেলো হোটেলের ফ্রন্টডেস্কের দিকে।

"মে আই হেল্প ইউ, স্যার," ডেস্কের স্মার্ট ক্লার্ক মেয়েটি এগিয়ে এসে জানতে চাইলো।

ব্যাগটা ডেস্কের উপর রেখে লোকটা বললো, "লেটনাইট পার্টি আছে...দশটার মধ্যে ডেলিভারি দেয়া যাবে তো?"

মুখে কৃত্রিম হাসি এঁটে ক্লার্ক মেয়েটি সুটব্যাগটা নিয়ে নিলো। "অফকোর্স, স্যার। আপনি কি চেকইন করেছেন?"

লোকটা কোনো কথা না বলে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দেখালে ক্লার্ক মেয়েটি কার্ডটা হাতে নিয়ে কম্পিউটারের কাছে চলে গেলো।

চারপাশটা আবারো ভালো করে দেখে নিলো লোকটা। সে নিশ্চিত তাকে দেখে তার পরিচিতজনেরাও চিনতে পারবে না। মাথার চুল একেবারে ছোটো ছোটো। প্রায় ন্যাড়া করে ফেলেছে। চোখে চশমা। কাঁচের রঙ হালকা হলুদ। একটা ফুলহাতা কালো গেঞ্জি আর কালো প্যান্ট পরেছে, বেশভূষা দেখলে মনে হবে সদ্য বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে সে। কথাটা মিথ্যে নয়।

ক্লার্ক মেয়েটি ডেস্কের কাছে ফিরে এসে কার্ডটা ফিরিয়ে দিলো তাকে। "আপনার রুমে কি ডেলিভারি দেয়া হবে..নাকি-"

"রুমে," চট করে বললো লোকটা।

"থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।"

মেয়েটার ধন্যবাদের প্রত্যুত্তর না দিয়ে লোকটা সোজা চলে গেলো লবির দিকে।

এটা হলো দ্বিতীয় তলার লবি। অনেকটা বড়সর বেলকনির মতো। ছয় সাতটা রাউন্ড টেবিল আর কিছু চেয়ার আছে। প্রায় সবটাই দখল করে রেখেছে সাদা চামড়ার বেশ কয়েজন নারী-পুরুষ।

এখান থেকে নীচের লবিটা ভালো করে দেখা যায়। হাতঘড়িটা দেখলো। সাড়ে সাতটা বাজে। লোকটা আস্তে আস্তে অলসভঙ্গিতে এগিয়ে গেলো রেলিংয়ের দিকে। নীচের লবিতে, এককোণের একটা টেবিলের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো। দুজন লোক বসে আছে। তাদের হাতে ফ্রুটজুস। তবে তাতে চুমুক দিচ্ছে না। চুপচাপ বসে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না।

ঠিক করলো আরেকটু অপেক্ষা করবে। পেছনে ফিরে দেখতে পেলো একটা রাউন্ড টেবিল খালি হয়েছে এইমাত্র। আস্তে করে সেটাতে গিয়ে বসলো। এখানে বসেও নীচের লবিতে লক্ষ্য রাখা যাবে। তার মনের একটা অংশ প্রশ্ন করছে, এতোটা সতর্কতার আদৌ কোনো দরকার আছে কিনা। কিন্তু সে জানে, সতর্কতা হলো এক ধরণের অভ্যাস-এর ব্যত্যয় ঘটানো ঠিক হবে না।

দশ মিনিট পর উঠে গেলো সে।

***

নীচের লবির এক কোণে বসে আছে দু'জন সুট-টাই পরা কেতাদুরস্ত লোক। একজন ক্লিনশেভ হলেও অন্যজনের বেশ স্টাইলিশ ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। হুট করে দেখলে মনে হবে তাদের মধ্যে কোনো তাড়া নেই। নিতান্তই সময় কাটানোর জন্য এখানে এসেছে, কিন্তু ক্লিনশেভ একটু পর পর আড়চোখে হাতঘড়ি দেখছে। তাদের টেবিলে মোট তিনটি চেয়ার। একটা চেয়ার এখনও খালি।

"সময় হয়ে গেছে না?" ফ্রেঞ্চকাট বললো।

"পনেরো মিনিট লেট," জবাব দিলো ক্লিনশেভ।

"ফোন করবে?"

মাথা নাড়লো ক্লিনশেভ। "দরকার নেই...মনে হয় এসে পড়েছে!"

ফ্রেঞ্চকাট একটু চমকে আশেপাশে তাকালো। লবির পাশেই একটা সুইমিংপুল আছে, সেটার পাশ দিয়ে এক এগিয়ে লোক আসছে তাদের দিকে। কালো পোশাক পরা।

দুজন লোক নড়েচড়ে বসলো। কালো পোশাক পরা লোকটি কিছু না বলে খালি চেয়ারটায় বসে বললো, "দেরির জন্য সরি।"

সুট-টাই পরা দু'জন ভদ্রলোক পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো লোকটার দিকে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে তাদের প্রত্যাশার সাথে বিরাট ফারাক তৈরি হয়েছে। যার সাথে দেখা করার জন্য এখানে এসেছে তার সম্পর্কে যা শুনেছে আর মনে মনে যে ছবিটা একেছিলো তার সাথে একদমই মিলছে না।

"আপনাদের মধ্যে মি. বারী কে?" কালো পোশাকের লোকটা ফ্রেঞ্চকাটের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো।

"আ-আমি..." কথাটা বলার সময় মি. বারী একটু তোতলালো।

লোকটা এবার ক্লিনশেভের দিকে ফিরলো তবে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলো না। এটার কোনো দরকার নেই। "মি. হাশেম, কাজের কথায় আসা যাক, নাকি?" ক্লিনশেভের উদ্দেশ্যে বললো সে।

"শিওর..." মনে মনে একটু গুছিয়ে নিলো মি. হাশেম। "উমম...প্রথম থেকেই বলি, কেমন?"

কালো পোশাক পরা লোকটা আলতো করে মাথা নাড়লো কেবল।

"এক সপ্তাহ আগে শীর্ষ সন্ত্রাসী ব্ল্যাক রঞ্জু আমার কাছ থেকে বিরাট অঙ্কের চাঁদা দাবি করেছে... আপনি হয়তো জানেন সে এখন কোলকাতায় আছে।"

"না, আমি জানি না। আপনি কী করে জানলেন সে কোলকাতায় আছে?" কালো পোশাকের আগন্তুক জিজ্ঞেস করলো।

"ওর ফোন নাম্বার দেখে। তাছাড়া এটা সবাই জানে দীর্ঘদিন থেকেই ও কোলকাতায় বসে চাঁদাবাজি করে যাচ্ছে। এর আগেও আমার কাছ থেকে একাধিকবার চাঁদা নিয়েছে...দিন দিন তার ডিমান্ড বেড়ে যাচ্ছে। বলতে পারেন তার মতো একটা রাস্তার লোকের কাছে আমি জিম্মি হয়ে পড়েছি।"

"কতে চেয়েছে?" কালো পোশাকের লোকটা জানতে চাইলো।

"দু'কোটি..." কথাটা বলেই মি. হাশেম চুপ মেরে গেলো। মি. বারীর দিকে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করলো সে। "আমার মতো একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি তার মতো এক গুণ্ডাবদমাশের কাছে জিম্মি হয়ে থাকবে...এটা মেনে নিতে পারছি না।" পাশে বসা মি, বারী মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"আপনি এখন কি করতে চাচ্ছেন?" কালো পোশাকের লোকটা সরাসরি জিজ্ঞেস করলো মি. হাশেমকে।

গভীর করে দম নিয়ে টাইয়ের নট আলগা করে নিলো বিশিষ্ট শিল্পপতি ব্যবসায়ী আবুল

হাশেম। কালো পোশাক পরা আগন্তুক জানে এই লোক কম করে হলেও হাজার কোটি টাকার মালিক।

"আমি ঐ ব্ল্যাক রঞ্জুর হাত থেকে নিস্তার পেতে চাই।"

কালো পোশাকের লোকটা কিছু বললো না। চেয়ে রইলো নিষ্পলক। আবুল হাশেম খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছে।

"তাকে খুন করতে চান?"

আবুল হাশেম যেনো একটু বিব্রত হলো, তারপর বেশ দৃঢ়তার সাথে বললো, "হ্যাঁ।"

কালো পোশাকের আগন্তুক মাথা নড়লো আলতো করে। "মি. হাশেম, আমাকে যেহেতু ডেকেছেন ধরে নিচ্ছি পুলিশ এ ব্যাপারে কিছু জানে না। "

ব্যবসায়ী দু'জন মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"পরিস্থিতিটা এমন যে, পুলিশ চাইলেও কিছু করতে পারবে না," মন্তব্য করলো মি. হাশেম। "পুলিশের কাছে গেলে কোনো লাভ হবে না।"

আগন্তুক একটু চুপ থেকে আবার বলতে লাগলো, "ব্ল্যাক রঞ্জুকে খুন করতে হলে তার অনেক সহযোগীকেও হত্যা করতে হবে। শুধু তাকে একা মারা সম্ভব হবে না।"

"তাকে মারার জন্যে যা করার তাই করবেন, আবুল হাশেম বললো। "দু'জন... তিনজন... পাঁচজন... যতোজন লাগে।"

আগন্তুক একটু ভেবে মাথা নেড়ে সায় দিলো। "রঞ্জুর নাগাল পেতে হলে দেশের বাইরে যেতে হবে।"

"সেজন্যেই আপনাকে ডাকা হয়েছে, এবার মুখ খুললো, এতোক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে থাকা মি. বারী। "যতোটুকু জেনেছি, এরকম একটা কাজ আপনিই করতে পারবেন।"

তারা জানে, এই পেশাদার খুনি পাকিস্তানে গিয়ে একটি কিলিং মিশন সফলভাবে শেষ করে আসতে পেরেছে। করাচির মতো এক শহরে, ভয়ঙ্কর সেই মিশনটি ছিলো ধারণার চেয়েও কঠিন-আদতে যা ভাবা হয়েছিলো বাস্তবে দেখা গেছে মওলানা ইউসুফ তার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষমতাবান আর ভয়ঙ্কর। এই গল্পটি যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে এ মুহূর্তে তাদের সামনে যে লোকটি বসে আছে সে-ই পারবে কুখ্যাত সন্ত্রাসী ব্লাক রঞ্জুকে বিদেশের মাটিতে খুঁজে বের করে খুন করতে।

"কিন্তু এতে একটা ঝুঁকি আছে," আগন্তুক বললো। সামনে বসা দু'জন ভদ্রলোক সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। "তারা যদি জানতে পারে কাজটা আপনারা করিয়েছেন তাহলে ভবিষ্যতে তাদের কেউ আপনাদের অনেক বড় ক্ষতি করতে পারে।"

"তারা কিভাবে জানবে?" মি: বারী জিজ্ঞেস করলো।

"অনেকভাবেই জানতে পারে।"

"আপনাকে এমনভাবে কাজটা করতে হবে যাতে মনে হয় এটা অন্য কারোর কাজ।"

"অন্য কারো মানে?"

আবুল হাশেম কিছু বলতে গেলেও মি: বারীর চোখের ইশারায় থেমে গেলো। "সরকারী গোয়েন্দাদের কাজ!"

আগন্তুক একটু অবাক হলো। "বাংলাদেশ কিন্তু ইসরায়েল না, এখানকার গোয়েন্দারা অন্য কোনো দেশে গিয়ে খুনখারাবির মতো অপারেশন করে না।"

"সেটা আপনি জানেন, আমরা জানি...কিন্তু ঐ গুণ্ডাটা জানে না। মনে রাখবেন সে একজন ফেরারি সন্ত্রাসী, তার কাছে এটা স্টাবলিস্ট করা কঠিন কিছু হবে না।"

"বিশেষ করে আপনি যদি সেভাবে কাজটা করেন," বললো আবুল হাশেম।

নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলো আগন্তুক। "খুব কঠিন কাজ।"

"কিন্তু অসম্ভব নয়," মি: বারী বললো।

"আমি সেটা বলি নি," আগন্তুক নাক চুলকে তাকালো মি: বারীর দিকে। "তার মানে আপনারা আমাকে দিয়ে একটা গণহত্যা করাতে চাচ্ছেন?"

কথাটা শুনে দু'জন ভদ্রলোক একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। আবুল হাশেম ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো কালো পোশাকের লোকটার দিকে।

"জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী বললাম আর কি..." কথাটা বলার পরই এই প্রথমবারের মতো লোকটার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি দেখা গেলে আড়ষ্ট হয়ে থাকা দু'জন ভদ্রলোক কিছুটা রিল্যাক্স অনুভব করলো। "এরজন্যে কী পরিমাণ টাকা লাগবে সে সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আছে?"

"আপনি কতোতে হলে কাজটা করবেন?" মি: বারী প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলো।

"টাকা যারা দেবে তাদের কাছ থেকেই অফারটা আসা উচিত।"

মি: বারী আবুল হাশেমের দিকে তাকালো। "এরকম কাজে কতো টাকা লাগতে পারে আমাদের দুজনের কোনো ধারণা নেই।" আবুল হাশেম মাথা দোলালো। আপনি যদি আমাদেরকে একটু আইডিয়া দিতে পারেন ভালো হয়।"

আগন্তুক একটু ভেবে নির্বিকারভাবে বললো, "কোটি টাকার মতো।"

অবাক করার ব্যাপার। ভদ্রলোক দু'জন টাকার অঙ্কটা শুনে ভড়কে গেলো না। কিন্তু আগন্তুক দারুণ বিস্মিত হলো। বুঝতে পারলো ভদ্রলোক দু'জন এ ব্যাপারে মরিয়া। হয়তো এরচেয়েও বেশি টাকা খরচ করতে পিছ পা হবে না।– "ঠিক আছে," আবুল হাশিম বললল। "মনে হচ্ছে টাকা নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনো সমস্যা হবে না।"

"ভালো," বললো আগন্তুক।

"আমার মনে হয় কিছু বিষয় আরো খোলাখুলি বলা উচিত," আবুল হাশেম বললো।

তার দিকে স্থিরচোখে তাকালো আগন্তুক। "বলুন।"

"আমরা জানি কাজটা সহজ নয়, এখানে আরো কিছু বিষয় আছে। সময়টা বিরাট ফ্যাক্টর।"

"কী রকম?"

"আমি চাই আপনি কোলকাতা, দিল্লি কিংবা নেপাল, যেখানেই ব্ল্যাক রঞ্জু থাকুক না কেন, তাকে হত্যা করবেন। আর এই কাজটা করতে হবে মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে।"

"দু'সপ্তাহ কেন?" আগন্তুক জানতে চাইলো।

"কয়েক দিন পর যে ইলেকশন হবে তাতে আমি এমপি পদে দাঁড়াচ্ছি। আমার নমিনেশন অনেকটা কনফার্ম। আপনি যদি কাজটা নিতে রাজি হন তাহলে আমি কালই স্টেটসে চলে যাবো সপরিবারে। ফিরে আসবো ঠিক দু'সপ্তাহ পর। নমিনেশন পেপার সাবমিট করা ছাড়াও ইলেকশন ক্যাম্পেইনের ব্যাপারটা তো আছেই।"

এবার বুঝতে পারলো কালো পোশাকের আগন্তুক।

"আমি চাই, এই দুই সপ্তাহের মধ্যেই আপনি কাজটা করে ফেলবেন। দেশে ফিরে আমি নিশ্চিন্তে ইলেকশন ক্যাম্পেইন করতে চাচ্ছি।"

"কাজটা এমনিতেই খুব টাফ, সময় বেঁধে দিলে আরো কঠিন হয়ে যাবে।"

"সেটা আমরাও জানি," আবুল হাশেম তার সঙ্গীর দিকে তাকালো। মি: বারী আবারো মাথা নেড়ে একমত পোষণ করলো তার সাথে। "নিছক কোনো খুনখারাবি হলে টাকার অঙ্কটা দশ লাখের বেশি হতো না। কিন্তু কাজটা সেরকম নয়, আপনিও সেরকম নন।"

আগন্তুক মনে মনে হাসলো। হাশেম সাহেব এমনভাবে কথা বলছে যেনো এই জীবনে অনেক লোককে ভাড়াটে খুনি দিয়ে খুন করিয়েছেন।

"আর সেজন্যে এই কাজটার জন্য আপনাকে এক কোটি টাকাই দেয়া হবে।"

আগন্তুকের কপালে ভাজ পড়ে গেলো। এক কোটি টাকা চাইতেই রাজি হয়ে গেলো! অদ্ভুত! সে ভেবেছিলো টাকার পরিমাণ কমানোর জন্য চাপাচাপি করা হবে। কিন্তু এই লোক দেখি কোনো রকম দ্বিধা ছাড়াই...।

"যে পরিমাণ টাকা রঞ্জুকে দিতে হবে তার অর্ধেক আমাকে দিয়ে দেবেন!" আগন্তুক গাল চুলকে বলতে লাগলো আবার, এতে করে এক কোটি টাকা যেমন বেচে যাবে সেইসাথে

দীর্ঘমেয়াদী লাভও হবে। বার বার চাঁদা দেবার হাত থেকে বেঁচে যাবেন। গুড বিজনেস।"

"দিস ইজ নট অ্যা বিজনেস ফর আস, আবুল হাশেম বললেন। "ইটস অ্যা ম্যাটার অব লাইফ অ্যান্ড ডেথ। ইন আদার ওয়ার্ডস, ইটস অ্যা ম্যাটার অব অনার অ্যান্ড ডিজঅনার।" একটু থেমে আবার বললেন ভদ্রলোক, "ঐ জানোয়ারটা বলেছে টাকা না দিলে আমার পরিবারের কাউকে খুন করবে... এমন কি আমাকেও!" টেবিল থেকে জুসের গ্লাসটা তুলে নিয়ে এক চুমুক দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিলেন মনে হলো।

আগন্তুক বুঝতে পারলো ব্ল্যাক রঞ্জু একজন ধনী লোকের নিরাপত্তাই শুধু বিঘ্নিত করে নি, তার ইগোতেও মারাত্মক আঘাত হেনেছে। এখন লোকটা মরিয়া হয়ে উঠেছে পাল্টা আঘাত হানার জন্য। টাকার পরিমাণ এখানে কোনো ব্যাপার নয়।

"একটু আগে আপনি ঠাট্টা করে গণহত্যার কথা বলেছিলেন," মি: বারী একদৃষ্টে চেয়ে বললো। "সত্যি বলতে কি, আপনাকে আসলেই ছোটোখাটো একটা গণহত্যা চালাতে হবে। আর সেটা করতে হবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে...অন্য একটি দেশে গিয়ে।"

"এটা নিছক কোনো খুনের কন্ট্রাক্ট নয়। কুখ্যাত সন্ত্রাসী ব্ল্যাক রঞ্জু এবং তার নেটওয়ার্ক ধ্বংস করার মিশন বলতে পারেন, আবুল হাশেম বললো।

"আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে এ কাজটাকে সমাজসেবা বলে মনে করছেন।" আগন্তুকের ঠোঁটে আবারো স্মিত হাসি।

"বলতে পারেন, এটা এক ধরণের সমাজসেবাই," মি: বারী বললো। "কতো লোককে এভাবে জিম্মি করে রেখেছে ওরা তার কোনো হিসেব নেই।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে একটু ভেবে নিলো আগন্তুক। "আমাকে কিছু টাকা অগ্রীম দিতে হবে।"

"দশ লাখ," শিল্পপতি হাশেম চট করে বললো। "আমরা জানি এ কাজ করতে গেলে ইনিশিয়ালি নগদ কিছু টাকা লাগবে।"

"লেনদেনটা কিভাবে হবে?"

"আমাদের কমন ট্রাস্টির মাধ্যমে," আবুল হাশেম বললো। "পুরো টাকাটা তার মাধ্যমেই লেনদেন হবে।" তাদের দু'পক্ষের মাঝখানে পর্দার আড়ালে আরো একজন আছে, যাকে তারা উভয়েই বিশ্বাস করে, আস্থা রাখে।

মি: বারী যোগ করলো, "কাজটা যদি নেন তাহলে আজ থেকে আপনার সাথে আমাদের কোনো যোগাযোগ হবে না। আমাদের ট্রাস্টির সাথে আপনি যোগাযোগ রাখবেন। সে-ই আপনাকে যথাসময়ে টাকা-পয়সা দিয়ে দেবে।"

"আশা করি ট্রাস্টির উপর আপনার অগাধ আস্থা আছে?" আবুল হাশেম কথাটা বলে চেয়ে রইলো আগন্তুকের দিকে।

"সময়টা কি বাড়ানো যায় না?"

আগন্তুকের প্রশ্নে মাথা নেড়ে সায় দিলো আবুল হাশেম। "বড়জোড় দু'তিন দিন, এর বেশি না।"

আগন্তুক চুপ মেরে রইলো।

আবুল হাশেম তার বন্ধুর দিকে তাকালে সে নীরবতা ভাঙলো। "আপনি কি আমাদের সাথে এরকম একটা কন্ট্রাক্ট করতে রাজি আছেন, মি...?" থেমে গেলো আজিজুল বারী। এমন নয় যে আগন্তুকের নামটা সে জানে না, বরং মুখ ফসকে বলে দিচ্ছিলো বলেই ভড়কে গেলো।

"রঞ্জুর লোক আপনাকে শেষ কবে ফোন করেছিলো?"

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো ভদ্রলোক দু'জন।

"তিন দিন আগে," ছোট্ট করে বললো আবুল হাশেম।

"আবার কবে ফোন করার কথা?"

"বলেছিলো রবিবারের মধ্যে টাকাটা দিতে হবে। আজ শুক্রবার...কাল পরশু ফোন

করতে পারে।”

একটু ভেবে আগন্তুক বললো, “আপনি তো বিদেশ চলে যাচ্ছেন, আপনার যে নাম্বারে রঞ্জু আর তার লোক ফোন করেছিলো সেটা আমাকে দিন।”

“অবশ্যই,” আবুল হাশেম পকেট থেকে দামি একটা ফোন সেট বের করে সেটার সিম খুলে আগুন্তুকের দিকে বাড়িয়ে দিলো। “ওরা দু’জন ফোন দিয়েছিলো। প্রথমে দেশীয় একটা নাম্বার থেকে রঞ্জুর এক লোক...তারপর কোলকাতার নাম্বার থেকে রঞ্জু নিজে।”

আগন্তুক সিমটা হাতে নিয়ে চেয়ে রইলো। “কোন্ দুটো নাম্বারে?”

“ওহ্ সরি...বলতে ভুলে গেছিলাম। ব্ল্যাক রঞ্জু১ এবং ব্ল্যাক রঞ্জু২ নামে সেভ করা আছে।”

“এটা তো আপনার প্রাইভেট নাম্বার...এটার কি কোনো দরকার নেই?”

“না, সমস্যা নেই। এটার সবগুলো কন্ট্যাক্ট সেভ করা আছে আমার ল্যাপটপে। এই নাম্বারটা আমি আর ইউজ করবো না।”

“গুড।” আগন্তুক সিমটা পকেটে রেখে দিলো। “আপনি তাহলে কালকেই চলে যাচ্ছেন?” মাথা নেড়ে সায় দিলো আবুল হাশেম। “আর আপনি?” মি: বারীর দিকে ফিলে বললো সে।

“আমি দেশেই আছি,” গম্ভীর মুখে বললো মি: বারী।

“ওর কোনো সমস্যা নেই,” হাশেম সাহেব বলতে লাগলো। “ও আমার ব্যবসায়ীক পার্টনার হলেও রঞ্জু ওর কাছ থেকে চাঁদা চায় নি।”

“আমার সাথে ওর লেনদেন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে,” মি: বারী উদাস হয়ে বললো।

“মানে?”

“আমার যা ছিলো তা সে নিয়ে নিয়েছে।”

আগন্তুক বুঝতে পারলো না।

“গত বছর ওর একমাত্র সন্তানকে রঞ্জু হত্যা করেছে,” হাশেম সাহেব আস্তে করে বললো। “চাঁদা দিতে অস্বীকার করেছিলো।”

পর দিন সকালে ঘুম থেকে একটু দেরিতে উঠলো বাস্টার্ড। বুঝতে পারলো খুব দ্রুত কাজে নেমে পড়তে হবে। সময় খুব একটা নেই। মাত্র দু'সপ্তাহ। এই কদিনে তাকে দেশের ভেতর ব্ল্যাক রঞ্জুর যেসব কন্ট্যাক্ট আছে সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে, তারপর পাড়ি দিতে হবে দেশের বাইরে।

সমস্যা হলো রঞ্জু এমন এক সন্ত্রাসী যার নাম শুনেছে অসংখ্য মানুষ কিন্তু তাকে স্বচক্ষে দেখেছে হাতে গোনা কয়েকজন। তাছাড়া ঢাকা শহরে রঞ্জুর নেটওয়ার্কটা অনেক বিশাল। প্রায় সবগুলো থানায় তার নিজস্ব বাহিনী রয়েছে। বাস্টার্ড যতোটুকু জানে, রঞ্জুর নেটওয়ার্কে রয়েছে তিনটি স্তর :

প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় কিছু অল্পবয়সী ছেলেপেলে রয়েছে তার। এরাই তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। নিজেদের এলাকায় কোন্ লোকের ব্যবসা-বাণিজ্যের কি অবস্থা, কতো টাকা দিতে পারবে, পারিবারিক তথ্য, ফোন নাম্বার এইসব জরুরি বিষয় সংগ্রহ করে এই দলটি।

এরপর আছে দ্বিতীয় স্তর। এরা ফোন করে জানায় রঞ্জু তাদের উপর কতো টাকার চাঁদা ধার্য করেছে। শিকারের সাথে টেলিফোনে এরাই যোগাযোগ রাখে। টাকা সংগ্রহ করা, নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেয়ার কাজও করে এই দলটি।

তৃতীয় স্তরে আছে তার সেনাবাহিনী। অল্পবয়সী ভয়ঙ্কর একদল সন্ত্রাসী। কেউ চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে এরা প্রথমে তার বাসা বাড়ি কিংবা অফিসে বোমা হামলা চালায়, গুলি করে কর্মচারী কিংবা বাড়ির অন্যকোনো লোকজনকে আহত করে। এক ধরণের আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে সেই লোক আর পরিবারকে। যারা শেষ পর্যন্ত চাঁদা দিতে অস্বীকার করে তাদেরকে এরাই প্রাণে মেরে ফেলে।

বাস্টার্ড জানে শেষ দলটি নিয়ে তার এখন মাথা ঘামানোর দরকার নেই। এদের পেছনে ছুটে লাভ হবে না। প্রথম দলটিও তার কোনো কাজে আসবে বলে মনে হচ্ছে না। এরা তথ্য সংগ্রহকারী। রঞ্জুর খবর এরা জানবে না।

দ্বিতীয় স্তরটি হলো তার প্রথম টার্গেট। এরাই ফোন করে চাঁদা দাবি করে। রঞ্জুর সাথে এরাই লিয়াঁজো রক্ষা করে সব সময়। তার দরকারি তথ্য যদি কেউ দিতে পারে তো এরাই পারবে।

রঞ্জু এবং তার দল সম্পর্কে খুব কমই জানে সে, সেজন্যে শুরু করার জন্য শিল্পপতি আবুল হাশেমের কাছ থেকে তার ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনের সিমটা নিয়ে নিয়েছে। এটাই তার বড়শী, এটা দিয়েই সে মাছ ধরবে।

তার আরেকটা সুবিধা হলো রঞ্জু যেখানে থাকে, সেই কোলকাতা শহরটা তার ভালো করেই চেনা। তার ঘনিষ্ঠ এক লোকের ওখানে ভালো সোর্স রয়েছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই তার ট্রাস্টির সাথে ফোনে যোগাযোগ করে সবকিছু সেটেলড করে নিলো, তারপর চলে গেলো পুরনো ঢাকায়, তার এক পরিচিত লোকের কাছে।

শুটার সামাদ নামে পরিচিত এই লোকই তার সব ধরণের অস্ত্র আর গুলি সরবরাহ করে থাকে। নিজের জন্যে একটা পিস্তল রেখে বাকি সব কিছু এই লোকের কাছ থেকে সে ভাড়ায় নেয়। অবশ্য বিদেশে যাবার আগে সেই পিস্তলটাও এর কাছেই রেখে গেছিলো।

এককালে একটি ছাত্র সংগঠনের ক্যাডার এই শুটার সামাদের কল্যাণেই ছাত্র নেতা এবং সন্ত্রাসের যুবরাজ হয়ে উঠেছিলো তবে সামাদ ভাই বরাবরই রয়ে যায় পর্দার আড়ালে। তার আরেকটা বড় পরিচয় হলো তিনি একজন ভালো শুটার। যে-ই সেই শুটার নন, একেবারে আন্তর্জাতিক পদক পাওয়া একজন। একটা সময় ভাড়াটে শুটার হিসেবে কাজও করেছেন। তবে সেই পেশায় বেশি দিন ছিলেন না। এখন রীতিমতো অস্ত্রব্যবসায়ী। আন্ডারওয়ার্ল্ডে এমন কেউ নেই তার নাম শোনে নি কিংবা তার কাছ থেকে অস্ত্র-গুলি কেনে না। শুটার সামাদের কাছ থেকে ব্ল্যাক রঞ্জু আর তার দল সম্পর্কেও অনেক কিছু জানা যাবে কারণ ব্ল্যাক রঞ্জুর উত্থান ঐ এলাকায়।

পুরনো ঢাকার নবাবপুর রোডের সারি সারি হার্ডওয়্যারের দোকানের এক ফাঁকে সংকীর্ণ

এক চোরাগলি দিয়ে উপরে উঠে গেলো সে। বাইরে থেকে দেখলে পুরনো দিনের একটি দোতলা ভবন, কিন্তু বাস্টার্ড জানে, ভেতরে এটা তিন তলা। এই বাড়ি যিনি তৈরি করেছিলেন তিনি কেন এরকম আজব কাজ করেছেন সেটা ভেবে পেলো না সে। কী ধরণের সুবিধা পাবার আশায় তিনি এ কাজ করেছেন সেটাও তার বোধগম্য হলো না, তবে বর্তমানে এর পুরো সুবিধা নিচ্ছে শুটার সামাদ। কম করে হলেও একশ' বছরের পুরনো এই বাড়িটি কোনো হিন্দু ব্যবসায়ীর বাড়ি ছিলো। এখন হাত ঘুরে চলে এসেছে শুটার সামাদের দখলে।

সংকীর্ণ আর খাড়া সিঁড়ি, তার উপর দিনের বেলায়ও বেশ অন্ধকার। দোতলায় উঠেই একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো সে। পর পর তিনটি টোকা মারলো কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া শব্দ নেই। কিছুক্ষণ পর দরজার উপরে একটা লো-পাওয়ারের বাতি জ্বলে উঠলে বুঝতে পারলো দরজার ওপাশ থেকে তাকে কেউ দেখছে। দরজাটা পুরনো দিনের হলেও একটা পিপহোল আছে। ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলো উনিশ-বিশ বছরের এক ছেলে। মুখে বেশ কয়েকটি ক্ষতচিহ্ন। তাকে দেখেই ক্ষতচিহ্নভরা মুখটা হাসিতে ভরে উঠলো।

কিছু না বলে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। ছেলেটা তাকে নিয়ে দুটো ঘর পেরিয়ে আরেকটা সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে গেলো তিন তলায়। এটাকে এখানকার সবাই বলে আড়াই তলা!

বেশ বড়সড় একটা ঘর, রীতিমতো বিশাল ডেস্ক আর চেয়ার নিয়ে অফিসের রূপ দেয়া হয়েছে। বাইরে থেকে দেখে বোঝাই যাবে না এখানে এরকম সাজানো গোছানো অফিস থাকতে পারে। ঘরে সামাদ ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। টেলিফোনে কার সাথে যেনো কথা বলছেন। বাস্টার্ডকে দেখে ইশারা করলেন সামনের একটা চেয়ারে বসার জন্য।

টেলিফোনে কথা শেষ করে বাস্টার্ডের দিকে ফিরলেন।

"আরে, তোমাকে তো চেনাই যাচ্ছে না!"

বাস্টার্ড কিছু বললো না।

"গায়ের রঙ তো একেবারে ময়লা হয়ে গেছে...কোথায় ছিলে এতোদিন?"

"দেশের বাইরে।"

সামাদ ভাই জানতে চাইলেন না কোন্ দেশে। বুঝতে পারলেন বাস্টার্ড এ নিয়ে আর বেশি কিছু বলতে চাচ্ছে না। "তো কী ব্যাপার..বলো?"

"এই তো, কিছু জিনিস লাগবে।"

দাঁত বের করে শুধু হাসলো শুটার সামাদ। "ফোনে যেটা বললে সেটা কি খুব সিরিয়াস?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাস্টার্ড।

"হঠাৎ ব্ল্যাক রঞ্জু সম্পর্কে..." কথাটা বলেই সামাদ ভাই ভুরু কুচকালেন। "তোমার পরিচিত কারো কাছ থেকে চাঁদা চেয়েছে নাকি?"

"না," আস্তে করে নির্বিকারভাবে বললো সে।

শুটার সামাদ একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে একটু ভেবে নিলেন। "আসলে ওর সম্পর্কে আমি যে খুব বেশি জানি তা বলবো না। নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় সরকার-সমর্থক কিছু সন্ত্রাসী ছাত্রনেতা আর স্থানীয় সন্ত্রাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর হামলা চালায়, তখন সেই দলে ব্ল্যাক রঞ্জুও ছিলো।" কথাটা বলেই সামাদ ভাই একটু হাসলো।

বাস্টার্ড জানে ঐ দলে সামাদ ভাই নিজেও ছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তারা সুবিধা করতে পারে নি। স্বৈরাচারের পতন হলে সবাই দীর্ঘদিন গা ঢাকা দিয়ে ছিলো।

"আমরা দুটি দলে ভাগ হয়ে কাজ করেছিলাম। অস্ত্র নিয়ে ঢাকা শহরে মুভমেন্ট করার সুবিধার্থে আমাদেরকে দুটো কোড দেয়া হয়। আমাদেরটা ছিলো রঙধনু, অন্যটার ছিলো সুগন্ধা। রঞ্জু ছিলো অন্য গ্রুপে। অনেকের মধ্যে দেখেছি কিন্তু এতোদিন পর চেহারা মনে থাকার কথা নয়।"

"পত্রিকায় যে ছবিটা দেয়া হয়?" জানতে চাইলো বাস্টার্ড।

মাথা দোলালো শুটার সামাদ। "মনে হয় না ওটা রঞ্জুর ছবি।" একটু থেমে আবার বললো

সামাদ, "যেদিন ডাঃ মিলন নিহত হয় সেদিন আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসতে বাধ্য হই। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করতো ওটা রঞ্জুর কাজ। তো ডাক্তার নিহত হবার পর আন্দোলনরত ছাত্রদের সাথে আমাদের তুমুল বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়ে হয়। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে তারা। এক পর্যায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয় ব্ল্যাক রঞ্জু। তার বাম হাতের তালুতে গুলি লাগে। থ্রী নট থ্রী রাইফেলের গুলি। হাতটা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।"

"তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, তার বাম হাতটা বিকৃত?...সেটাই একমাত্র চেনার উপায়?"

"একমাত্র উপায় কিনা জানি না, তবে আমি তাকে সেভাবেই চিনবো। চেহারাটা তো আর মনে নেই।"

বাস্টার্ড জানে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মধ্যে ব্ল্যাক রঞ্জু সম্পর্কে পুলিশের কাছেও খুব বেশি তথ্য নেই। আছে শুধু খুনখারাবি আর চাঁদাবাজির অভিযোগ। এই সন্ত্রাসী প্রায় ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে সব সময়। এমনকি মাঝেমধ্যে পত্রিকায় তার যে ছবিটা ছাপা হয় সেটা ছাড়া পুলিশের কাছে রঞ্জুর আর কোনো ছবি পর্যন্ত নেই। সেটা আদৌ রঞ্জুর ছবি কিনা তাতেও সন্দেহ আছে।

"ওর শুরুটা হয়েছিলো কোথায়?"

"রঞ্জু ভায়ের ক্যাডার হিসেবে..."

"রঞ্জু ভাই? অবাক হলো বাস্টার্ড।

মাথা নাড়তে লাগলেন শুটার সামাদ। ব্ল্যাক রঞ্জুকে যে লোক রাস্তা থেকে তুলে এনেছিলো। এই রঞ্জুর কথা এখন খুব কম লোকেই জানে। গেন্ডারিয়া মিলব্যারাক এলাকায় এক সময় তার খুব দাপট ছিলো। সেটা আশি থেকে শুরু করে নব্বই সাল পর্যন্ত।" একটু থেমে একটা সুইচ টিপে আবার বলতে শুরু করলেন। "দুই রঞ্জু একসাথে ছিলো বলেই তাদেরকে আলাদা করার জন্য এই রঞ্জুকে ব্ল্যাক রঞ্জু বলে ডাকতে শুরু করে লোকজন। তার গায়ের রঙ একেবারে নিগ্রোদের মতোই কালো, বুঝলা।" সামাদ ভাই কথা বন্ধ করে ফেললেন, কারণ ঘরে সেই ছেলেটা এসে হাজির হয়েছে।

"দুই কাপ চা," সামাদ ভাই কথাটা বলেই আবার বলতে শুরু করলেন। "রঞ্জু ভাই এক সময় আন্ডারওয়ার্ল্ডে হোমরাচোমরা হয়ে উঠেছিলেন। পলিটিশিয়ানদের সাথেও তার বেশ খাতির ছিলো। কিন্তু উঠতি এক পলিটিশিয়ানের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার পর তাকে রাগের মাথায় হত্যা করে ফেলেন তিনি। ব্যাপারটা ছিলো মারাত্মক ভুল। ক্ষমতাসীন পলিটিশিয়ানদের খুন করা খুব রিস্কি। তো, পুলিশের কিছু করার ছিলো না, যদিও রঞ্জু ভায়ের সাথে তাদের বেশ খাতির ছিলো। ধরা পড়ে জেলে চলে যান। আর ঠিক এই সুযোগেই ব্ল্যাক রঞ্জুর উত্থান। রঞ্জু ভাই চার বছর জেলে ছিলেন। এই চার বছরে ব্ল্যাক রঞ্জু রীতিমতো আন্ডারওয়ার্ল্ডে একটা জায়গা করে নেয়।"

"কিন্তু তার বস রঞ্জু ভায়ের কি হলো?" বাস্টার্ড জানতে চাইলো।

"চার বছর পর অন্য দল ক্ষমতায় এলে রঞ্জু ভাই জেল থেকে বের হয়ে আসেন। তখন থেকেই ব্ল্যাক রঞ্জুর সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন তিনি। এটাও তার জন্য মারাত্মক ভুল ছিলো। জেল থেকে বের হবার মাত্র দু'মাসের মাথায় তিনি খুন হন।"

ছেলেটা চা দিয়ে গেলো।

"এরপর ব্ল্যাক রঞ্জুকে আর কেউ আটকাতে পারে নি। বিশাল একটি বাহিনী গড়ে তোলে সে। এমন নেটওয়ার্ক এর আগে এ দেশে দেখা যায় নি। এখনও বহাল তবিয়তে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।"

"এখন সে কোথায় আছে?" বাস্টার্ড জানতে চাইলো চায়ে চুমুক দেবার পর।

"কোলকাতায়।" সামাদ ভাই চায়ের কাপ তুলে নিলেন। "আপনি নিশ্চিত, সে কোলকাতায় আছে?"

"হুমম," চায়ে চুমুক দিলো সামাদ ভাই।

বাস্টার্ড একটু চুপ থেকে বললো, "দেশে ব্ল্যাক রঞ্জুর সবচাইতে কাছের লোক কে?"

"এটা বলা খুব কঠিন। বিশাল নেটওয়ার্ক...কতো লোক কাজ করে কেউ জানে না। তাদের মধ্যে অনেকেই তার ঘনিষ্ঠ কিন্তু সবচাইতে ঘনিষ্ঠ কে সেটা জানা খুব কঠিন।"।

"ওর এখানকার কাজ মূলত কে করে?"

"অনেকেই...একেক এলাকায় একেক জন।"

"কিন্তু চাঁদাবাজির টাকাগুলো নিশ্চয় একজনের কাছেই যায়?" বললো বাস্টার্ড।

"হুম...তাই তো হবার কথা," চায়ে চুমুক দিয়ে সামাদ ভাই বললেন। "টাকাটা একজনের কাছেই যাবে। টাকা-পয়সা নিয়ে বিশ্বাস করা যায় এরকম লোকের সংখ্যা সব সময়ই হাতেগোনা থাকে।"

"ব্ল্যাক রঞ্জুর কোন্ লোক প্রথমে ফোন করে চাঁদা দেয়ার কথাটা জানায়? নিশ্চয় এ কাজটা অনেকে করে না?" বাস্টার্ড জানতে চাইলো।

"আমি যতোটুকু জানি সুলতান নামের একজন এ কাজ করে।"

"সে কোথায় থাকে?"

"ঠিক করে কেউ বলতে পারে না। কেউ বলে পুরনো ঢাকায়, কেউ বলে নদীর ওপারে, কেরাণীগঞ্জে, আবার কেউ বলে সাভারে। তবে আমার ধারণা সে পুরনো ঢাকায়ই থাকে।"

মাথা দোলালো বাস্টার্ড। "আমার একটা সাইলেন্সারসহ পিস্তল আর বাড়তি কিছু গুলি লাগবে," বললো বাস্টার্ড।

"সাইলেন্সারসহ?" সামাদ ভাই একটু অবাক হলেন। "একটাই আছে। আমার কাছে... এখানে তো এ জিনিস কেউ ব্যবহার করে না...আমি রেখেছিলাম অনেকটা শখের বশে।"

পকেট থেকে একটা টাকার বান্ডিল বের করে ডেস্কের উপর রাখলো। "এখানে পঞ্চাশ হাজার আছে।"

বান্ডিলটা হাতে নিয়ে ডেস্কের নীচে একটা ড্রয়ারে রেখে দিলেন সামাদ ভাই।

"ঠিক আছে তো জিনিসটা?"

"আরে কি বলো তুমি!" একটু যেনো কষ্ট পেলেন। "আমি একজন শুটার, ভুলে গেছো! আমার কাছে ওইসব জিনিস সব সময় সচল থাকে।"

মুচকি হাসলো বাস্টার্ড।

"একটু বসো," বলেই ডেস্ক থেকে উঠে গেলেন শুটার সামাদ। চলে গেলেন পাশের একটা ঘরে। পাঁচ মিনিট পর একটা জুতার বাক্স নিয়ে ফিরে এসে ডেস্কে নিজের চেয়ারে বসলেন। বাক্সটা খুলে একটা সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পিস্তল আর কালো রঙের মোটা চুরুটের মতো জিনিস বের করলেন।

"স্প্যানিশ মাল," পিস্তলের মুখে সাইলেন্সারটা লাগাতে লাগাতে বললেন, "গুয়ের্নিকা। ছোটো কিন্তু জিনিস কড়া।" সাইলেন্সারটা লাগিয়ে অস্ত্রটা বাস্টার্ডের দিকে ঠেলে দিলেন।

মনে মনে হাসলো বাস্টার্ড। পাবলো পিকাসো যুদ্ধের বিভীষিকা ফুটিয়ে তোলার জন্য গুয়ের্নিকা নামের একটি বিখ্যাত ছবি এঁকেছিলেন, আর তারই স্বদেশীয় অস্ত্রনির্মাতারা সেই নামে ক্ষুদে একটা মারণাস্ত্র বাজারে বিক্রি করছে।

"সাইলেন্সরটা জামার্নির। বেশ ভালো। থুতু ফেলার মতো শব্দ করে...তার বেশি না," বললেন সামাদ ভাই।

বাস্টার্ড জিনিসটা হাতে নিয়েই কোমরে গুঁজে রাখলো। কোনো রকম পরীক্ষা করে দেখলো না। এই ব্যাপারটা শুটার সামাদকে বেশ খুশি করলো।

সামাদ ভাই এবার ডেস্কের নীচ থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে ঠেলে দিলো বাস্টার্ডের দিকে। এখানে বিশটা আছে। আরো লাগবে?"

"না।" প্যাকেটটা পকেটে রেখে দিলো সে। "তাহলে আমি এখন যাই...পরে আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলবো।"

"ওকে," শুটার সামাদ চেয়ারে হেলান দিয়ে স্থির চোখে চেয়ে রইলেন। বাস্টার্ড দরজার

সামনে যেতেই পেছন থেকে বললেন, “ব্ল্যাক রঞ্জু খুবই ডেঞ্জারাস লোক।”
বাস্টার্ড ফিরে তাকালো তার দিকে।
“তাকে আন্ডারএস্টিমেট কোরো না।”
মাথা নেড়ে সায় দিয়ে দরজা খুলে বের হয়ে গেলো সে।
সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দেখা হলো সেই ছেলেটির সাথে। তার হাতে একশ’ টাকার একটা নোট গুঁজে দিলো বাস্টার্ড। এখানে যখনই আসে তাকে টিপস দেয়। ছেলেটা কিছু বললো না, চুপচাপ পকেটে টাকাটা রেখে দিয়ে বাস্টার্ডকে হাত ইশারা করে থামতে বললো। তারপর অন্য পকেট থেকে একটা চিরকুট বের করে ধরিয়ে দিলো তার হাতে। অবাক হলো বাস্টার্ড। তবে কিছু না বলে সোজা বেরিয়ে গেলো।
এই ছেলেটা বোবা। জন্ম থেকে নয়। বছর দুই আগে বোমা বানাতে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় বোবা হয়ে গেছে। তার গলায় তিন-চারটা প্রিন্টার ঢুকে গিয়েছিলো। ভোকাল কর্ড নষ্ট হয়ে গেছে সেই আঘাতে। অল্পের জন্য চোখ দুটো বেঁচে গেলেও মুখে এখনও দাগগুলো রয়ে গেছে।
রাস্তায় নেমে চিরকুটটা খুলে দেখে অবাক হলো সে। কাঁচা হাতে অল্প কিছু কথা লেখা :
বংশাল ছোটো মসজিদের পাশে সেন্টু মিয়ার দোকানে যান। আমার কথা বলবেন। রঞ্জুর খবর পাবেন।
মুচকি হাসলো সে। বোবা তাহলে সব শুনেছে আড়িপেতে। ছেলেটাকে খুব স্নেহ করে সে। ছেলেটাও তাকে খুব পছন্দ করে যদিও সেটা প্রকাশ করে না। প্রকাশ করার দরকার পড়ে না। সে জানে।
একটা রিক্সা নিয়ে সোজা চলে গেলো বংশাল।
জ্যামের মধ্যে বসে আছে এমন সময় ফোনটা বেজে উঠলো। এটা তার ফোন নয়। গতকাল হাশেম সাহেবের কাছ থেকে নেয়া সিমটা এই হ্যান্ডসেটে ব্যবহার করছে এখন। সতর্ক হয়ে উঠলো সে।

***

ব্ল্যাক রঞ্জু২! তার মানে রঞ্জুর লোক, সুলতান।
কয়েক বার রিং হবার পর কলটা রিসিভ করলো। রিসিভ করার আগে ইনকামিং কল রেকর্ড করে রাখার অপশনটা চালু করে দিলো সে। নিজ থেকে কিছু বললো না প্রথমে।
ওপাশে যে আছে সেও কিছু বললো না। বুঝতে পারলো কলার তার মতোই বাইরে আছে। যানবাহনের শব্দ আর নয়েজ শোনা যাচ্ছে। আশেপাশে কোনো মসজিদ থেকে আজানের শব্দটাও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে। এভাবে কয়েক সেকেন্ড চলে যাবার পর একটা অধৈর্য কণ্ঠ শোনা গেলো।
“কী ভাই, কথা কন না কেন?”
“কে বলছেন?” আস্তে করে বললো সে।
“তার আগে কন আপনি কে?” কর্কশভাবে জানতে চাইলো একটা অল্পবয়সী কণ্ঠ। বাস্টার্ডের ধারণা ছেলেটার বয়স বিশ-বাইশের বেশি হবে না।
“আপনি কার কাছে ফোন করেছেন, নিজের পরিচয় না দিয়ে জানতে চাইলো সে।
“এটা তো হাশেম সাহেবের ফোন, আপনি কে?”
“আমি উনার শ্যালক।” মিথ্যেটা খুব সুন্দর করে বললো।
“উনারে দেন...জরুরি দরকার আছে।”
“উনি অসুস্থ...খুবই অসুস্থ।”
“কি হইছে?”।
“গতকাল রাত থেকে প্রেসার হাই...এখন ঘুমাচ্ছেন। ডাক্তার ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে গেছেন। এখন তো কোনোভাবেই উনাকে ডাকা যাবে না।” একটু বিরতি দিয়ে আবার বললো, “আপনার কোনো দরকার থাকলে আমাকে বলতে পারেন।”

“ঠিক আছে, আমি পরে ফোন করুম। উনারে কইয়েন, সুলতান ফোন দিছিলো। রঞ্জু ভায়ের লোক। জরুরি দরকার আছে।”

“ঠিক” লাইনটা কেটে গেলে চিন্তিত হয়ে ফোনের দিকে চেয়ে রইলো সে। মিথ্যেটা সুন্দর করেই বলতে পেরেছে, আর ছেলেটাও বিশ্বাস করেছে তার কথা, কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে না। এটা কী করে সম্ভব হলো! মোবাইলের ডিসপ্লে'তে সময়টা দেখে নিলো আবার ৩: ১১।

এ সময় আজান? আজব!

সে নামাজের সঠিক সময়সূচী জানে না, কিন্তু এটা জানে, এ সময় কোনো আজান দেয়া হয় না। এটা কোনো নামাজের ওয়াক্তও নয়।

তাহলে? ভাবনাটা তার মাথায় খেলতেই রোমাঞ্চ বোধ করলো।

***

বংশাল ছোটো মসজিদের পাশে সেন্টু মিয়ার দোকানটা খুঁজে বের করতে তেমন একটা কষ্ট করতে হলো না। সেন্টু মিয়ার মুদি দোকানটা বেশ স্বল্প পরিসরের। জিনিসপত্রে ঠাসা। বোবা ছেলেটার পরিচয় দিতেই সেন্টু মিয়া তাকে ভেতরে এসে বসতে বললো। চারপেয়ে একটা টুলে বসলো বাস্টার্ড। বয়স পঞ্চাশের উপর হলেও লোকটা একেবারে হ্যাংলাপাতলা, দেখতে ছেলে ছোকরাদের মতো। মাথার পাকা চুলে মেহেদির লাল রঙ। মুখে পান। সেটা চিবিয়ে যাচ্ছে বিরামহীন।

দোকানে একজন কাস্টমার ছিলো, তাকে বিদায় করে দিলো সেন্টু মিয়া।

“কন, কি দরকার?”

“আপনি কি লেখাপড়া জানেন?” জানতে চাইলো সে।

পান চিবোতে চিবোতে সেন্টু মিয়া মাথা নেড়ে সায় দিলো। “অল্প একটু জানি।”।

বোবা ছেলেটা তাকে যে কাগজ দিয়েছিলো সেটা বাড়িয়ে দিলো লোকটার দিকে।

সেন্টু মিয়া কাগজটা পড়ে একবার আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে আবার কাগজের দিকে মনোযোগ দিলো। “হুম।”

“আমি ব্ল্যাক রঞ্জুর ব্যাপারে কিছু জানতে চাইছিলাম,” বললো সে।

সেন্টু মিয়া পান চিবানো বন্ধ করে ভালো করে বাস্টার্ডকে দেখে নিলো আরেকবার। তার মধ্যে একটু দ্বিধা থাকলেও সেটা ঝেড়ে ফেললো কেননা বোবা ছেলেটা যে তাকে পাঠিয়েছে সেটা বুঝতে পারছে।

“হে তো দ্যাশে নাই, হের খবর নিবেন কেমনে?”

“আমি এমন একজনের কথা জানতে চাই যার সাথে ব্ল্যাক রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।” কথাটা বলেই পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে সেন্টু মিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

নির্বিকারভাবে টাকাটা হাতে নিয়ে ক্যাশবাক্সে রেখে দিলো সেন্টু মিয়া। “কী জন্য জানতে চাইছেন সেটা কি কওয়া যাইবো?”

মাথা দোলালো বাস্টার্ড। “আচ্ছা।” পাশে রাখা একটা পাত্রে পিচকিরি ফেললো সে। মুখটা হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুছে আবার বলতে লাগলো, “সুলতান। হের সবচাইতে কাছের লোক হইলো সুলতান।”

“কোথায় থাকে?”

“এইসব পোলাপানের কি ঠিক ঠিকানা আছে,” আশেপাশে একটু সজাগ দৃষ্টি রেখে আবার বলতে লাগলো, “অনেক আস্তানা আছে। আশেপাশেও একটা আস্তানায় থাকে মাজেমইদ্যে।”

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো লোকটা ঠিকই বলছে। এর কথায় আস্থা রাখা যায়। কোথায় সেটা?”

“কুন বাড়িতে থাকে সেইটা কইবার পারুম না...বংশাল-নাজিরা বাজার আর আগামসিহ লেনের কোনো বাড়ি অইবো।”

বাস্টার্ড এটা আগেই ধারণা করেছিলো। সুলতান যখন তাকে ফোন করে তখন তার ব্যাকগ্রাউন্ডে আজান শোনা গেছে। এ শহরে এমন কোনো মসজিদ নেই যেখানে বেলা তিনটা দশ মিনিটে আজান দেয়া হয়। তবে সে জানে এটা মোটেও অবাক করা ব্যাপার নয়। বিশেষ করে বংশাল-নাজিরাবাজার আলুবাজার এইসব এলাকার অনেক মসজিদে এমন সময় আজান দেয়া হয়। কারণটা খুবই চমকপ্রদ। এইসব এলাকার লোকজন-ইসলামের অনেকগুলো মাজহাবের একটি- আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের। আহলে হাদিসদের নামাজের ওয়াক্ত অন্যান্য মাজহাবের চেয়ে প্রায় এক ঘণ্টা এগিয়ে থাকে। তাদের নামাজ পড়ার ধরণও একটু ভিন্ন। না বুঝে তাদের মসজিদে যারা ঢুকে পড়ে তারা এটা হাড়ে হাড়ে টের পায়।

"আমি এই সুলতানের সাথে দেখা করতে চাই, সেন্টু মিয়াকে বললো সে।

"এইসব পোলাপান থাকে আন্ডারগ্রাউন্ডে...ওগো লগে দ্যাখা করা সহজ কাম না।"

পকেট থেকে আরো কিছু টাকা বের করে সেন্টু মিয়ার হাতে দিলো বাস্টার্ড।

"দুনিয়াতে অবশ্য কোনো কামই সহজ না, একটু কষ্ট করলে সব কামই সহজ হইয়া যায়, ঠিক কইছি না?"

"একদম ঠিক বলেছেন।"

"সুলতানের পাত্তা লাগানো যাইবো... আপনি কাইল আসেন।" টাকাটা পকেটে রেখে বললো সেন্টু মিয়া।

একটু ভেবে বাস্টার্ড বললো, "ঠিক আছে। আরেকটা কথা, আপনি তো এখানেই থাকেন?" সায় দিলো সেন্টু মিয়া। "এখানকার কোন্ মসজিদের আজান কোন রকম সেটা কি শুনে বলতে পারবেন?"

একটু ভেবে সেন্টু মিয়া বললো, "আশেপাশের অইলে পারুম।"

পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে সুলতানের সাথে কথাবাতার রেকর্ড করা অংশটা শোনাতে যাবে অমনি দোকানে একজন কাস্টমারের আর্বিভাব ঘটলো। দশ বারো বছরের এক পিচ্চি।

"দুইটা ফাইভ ফাইভ।"

সেন্টু মিয়া বিরক্ত হয়ে বললো, "সিগারেট নাই।"

ছেলেটা ভুরু কুচকে দোকানের র‍্যাকের দিকে চেয়ে বললো, "ঐ তো ফাইভ ফাইভের প্যাকেট!"

"আরে নাটকির পো, কইলাম না সিগারেট নাই। দিকদারি করিস না। যা এহন।"

ছেলেটা গজগজ করতে করতে চলে গেলো।

সেন্টু মিয়া বাস্টার্ডের দিকে ফিরলে সে বললো, "এখানে সুলতানের সাথে আমার কথাবার্তা রেকর্ড করা আছে। ও যখন কথা বলছিলো তখন পেছনে একটা মসজিদ থেকে আজান হচ্ছিলো। আমি নিশ্চিত আহলে হাদিস মসজিদই হবে। আপনি শুনে দেখেন চিনতে পারেন কিনা।" মোবাইলটা সেন্টু মিয়ার হাতে তুলে দিলো সে।

বেশ মনোযোগ দিয়ে মোবাইলের সংলাপ শুনে গেলো সেন্টু মিয়া। তবে তার মুখের অভিব্যক্তি দেখে কিছুই বোঝা গেলো না। সেন্টু মিয়া মুখ খোলার আগেই আরো কিছু টাকা ধরিয়ে দিলো তার হাতে।

"আপনে দেহি মেশিনের মতো টাকা দিতাছেন..." কথাটা বলেই হেসে ফেললো সে। "মিছা কথা কমু না, আমি ধরবার পারছি। একেক মসজিদের একেক রকম আজান, মাগার যারা এইখানে থাকে তারা ঠিকই কইতে পারবো কোন মসজিদের আজান কি রকম।"

"এটা কোন্ মসজিদের আজান?" নির্বিকারভাবে জানতে চাইলো বাস্টার্ড।

"এইটা নাজিরা বাজার আহলে হাদিস মসজিদের আজান।"

"আপনি কি শিওর?"।

"এক্কেবারে সিউর!"

মুখে হাসি এঁটে বললো, "ঐ মসজিদের মুয়াজ্জিনের মতো ফাটা গলার আজান আর কুন

হালায় দিবো!"

বাস্টার্ড হেসে ফেললো।

"জীবনে বহুত আজান হুনছি মাগার এই রকম ফাঁটা বাঁশের আওয়াজ হুনি নাই।"

"সুলতান তাহলে মসজিদের খুব কাছেই থাকে?"

"তাই তো মনে হয়, সেন্টু মিয়া সায় দিয়ে বললো।

"সুলতান কোনো রাস্তা থেকে আমাকে ফোন করে নি। আমি নিশ্চিত, সে কোনো বাসাবাড়ি থেকেই ফোনটা করেছে কিন্তু চারপাশে অনেক নয়েজ ছিলো। হতে পারে কোনো বাড়ির ছাদে কিংবা বারান্দা থেকে ফোনটা করেছে।"

বাস্টার্ডের কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে গেলো সেন্টু মিয়া। "ঠিক কইছেন," সেন্টু মিয়া একটু ঝুঁকে এলো, "আরেকটা আওয়াজ আপনে হয়তো খেয়াল করেন নাই।"

"কোন্ আওয়াজ?" বাস্টার্ড কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাতে লাগলো সেন্টু মিয়া। "অবশ্য আপনার বোঝার কথা না। অনেক আওয়াজের মইদ্যে ওই আওয়াজটাও আছে।"

বাস্টার্ড আর কোনো কথা না বলে আরো কিছু টাকা বের করলো। "কোন্ আওয়াজের কথা বলছেন?"

"দোকানপাটের শাটার আছে না, ঐ শাটার বানানোর অনেক কারখানা আছে ঐ এলাকায়।" বাস্টার্ড টাকাগুলো সেন্টু মিয়ার হাতে তুলে দিলো। "নাজিরাবাজার আহলে হাদিস মসজিদের লগেও একটা শাটারের কারখানা আছে। টিনের উপর কাঠের হাতুড় দিয়া কাম করে কারিগররা...ঠাক ঠাক কইরা আওয়াজ হয়। সব সময় শুনি তো, তাই আওয়াজ শুইনা বুইঝা গেছি।"

"তার মানে সুলতান ঐ শাটার কারখানার খুব কাছে কোথাও...?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সেন্টু মিয়া। "আপনের কপাল ভালা। ঐ মসজিদের চাইরপাশে দোকানপাটই বেশি...বাসা-বাড়ি বলতে মাত্র তিনটা বাড়ি।"

"তাহলে সুলতান ঐ তিনটা বাড়ির যেকোনো একটাতে..."

"না, না...কোন্ বাড়ি থেইকা কথা বলছে আমি মনে হয় বুঝবার পারছি।"

সেন্টু মিয়ার কথা শুনে দারুণ অবাক হলো সে। এতোটা আশা করে নি। অন্তত এতো জলদি! "কোন্ বাড়ি?"

"আমার মনে হইতাছে আলিমুদ্দীনের বাড়িই অইবো।"

সেন্টু মিয়ার কথাই ঠিক, মসজিদের আশেপাশে খুব কমই বাসা বাড়ি আছে। বেশিরভাগই প্লেইন শিটের দোকান আর নানা ধরণের ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান। শাটারের কারখানাটার পাশেই আলিমুদ্দীনের তিন তলা বাড়িটা।

সেন্টু মিয়া কেন এই বাড়িটার উপর জোর দিয়েছে তার কারণ খুব সহজ : বাকি দুটো বাড়ির একটা একতলার। খুবই ছোটো। সামনে একটা মুদি দোকান। পেছনে দুটো ছোটো ছোটো রুম। সেন্টু মিয়ারই দূর সম্পর্কের এক বিধবা আত্মীয় নিজের ছেলের সাথে ওখানে থাকে।

আরেকটা বাড়ি দোতলা। নীচের তলায় প্লেইনশিটের একটা বড়সড় গোডাউন, আর উপরের তলার থাকে মালিক নিজে। তাকেও সেন্টু মিয়া চেনে। মালিকের তিন মেয়ে। কোনো ছেলে নেই। আর সুলতানের মতো সন্ত্রাসী ওখানে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। মনে মনে সেন্টু মিয়ার বিচারবুদ্ধির প্রশংসা করতেই হয়। লোকটা আসলেই কাজের।

আলিমুদ্দীনের তিন তলা বাড়িটা বেশ বড়। পাশে যতোটা চওড়া তার চেয়ে লম্বায় অনেক বেশি। অনেকটা বড়সড় জাহাজের মতো। এই বাড়িটার মালিক আলিমুদ্দীন নিজে এখানে থাকে না। পরিবার নিয়ে সে থাকে ধানমণ্ডিতে। পুরো বাড়িটাই ভাড়া দেয়া। পুরনো বাড়ির কাঠামোর উপর অপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছে তৃতীয় তলাটি। পেছনের খালি জায়গাটাও টিনশেডের কতোগুলো ঘর বানিয়ে নিম্ন আয়ের লোকদের কাছে ভাড়া দেয়া

হয়েছে। মূল বাড়ির তিনটি তলার মধ্যে উপরের তলায় কারা থাকে সে ব্যাপারে সেন্টু মিয়া কোনো তথ্য দিতে পারে নি। সে বলেছে তার ধারণা ঐ তলাতেই হয়তো সুলতান থাকতে পারে। এটা নিছক অনুমান।

একটা কৌশল ঠিক করে নিলো মনে মনে। আলিমুদ্দীনের বাড়ির সামনে যে একতলা বাড়িটা আছে সেটার গেটের পাশেই আছে একটা মুদি দোকান। এখানকার একমাত্র মুদি দোকান এটি। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের এক লোক বসে আছে। বাস্টার্ড এগিয়ে গেলো সেই দোকানের দিকে।

"কি লাগবো?"

মুদি দোকানি লোকটা জানতে চাইলেও সে কিছু বললো না। লোকটার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

"আমি ইন্ডিয়া থেকে এসেছি," কথাটা বলেই খেয়াল করলো দোকানির মধ্যে কোনো পরিবর্তন হলো কিনা। না। লোকটা বুঝতেই পারছে না সে কী বলেছে। "আমি রঞ্জু ভাইয়ের লোক।" হ্যাঁ, এবার কাজ হয়েছে। লোকটা চমকে উঠেছে। কিন্তু সেটা বুঝতে দিতে চাচ্ছে না। "সুলতানের সাথে দেখা করতে এসেছি, কিন্তু তার বাড়িটা খুঁজে পাচ্ছি না। ঠিকানাও হারিয়ে ফেলেছি।"

ফোন করেন, দোকানি সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বললো। "হের নম্বর আপনার কাছে নাই?"

"মোবাইল বন্ধ...কয়েক বার চেষ্টা করেছি।"

মনে হলো দোকানি কিছু ভাবছে। "এখন তো বাসায় নাই...সন্ধ্যার আগে ফিরবোও না।"

"সন্ধ্যার দিকে পাওয়া যাবে?"

"হুম...মনে হয় পাইবেন। সন্ধ্যার একটু পর আসেন।" দোকানি এখনও তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

"তাহলে আমি সন্ধ্যার দিকেই আসি, কি বলেন?"

"আসেন।"

বাস্টার্ড চলে যেতে উদ্যত হবে, কী মনে করে যেনো আবার দোকানির দিকে ফিরে তাকালো। কিন্তু তার বাড়িটা তো চিনি না। সুলতান বলেছিলো আপনার দোকানের পাশেই। কোন বাড়িটা, বলবেন কি?"।

লোকটার চোখেমুখে সন্দেহ আরো প্রকট হলো।

সে কিছু বলার আগেই বাস্টার্ড বললো, "তার ফোন যদি সন্ধ্যার সময়ও বন্ধ থাকে তাহলে তো সমস্যা।"

"সমস্যা হইবো ক্যান...জায়গামতোই তো আয়া পড়ছেন। এই যে, বাম দিকের তিন তলা বাড়িটা আছে না," হাত নেড়ে বাম দিকে ইশারা করলো সে। "এক্কেবারে উপরের তলায় চইলা যাইবেন।"

হাত বাড়িয়ে দিলো বাস্টার্ড। দোকানি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তার সাথে করমর্দন করলো। "আপনার কথা আমি রঞ্জু ভাইকে বলবো। অনেক ধন্যবাদ।

দোকানির মুখে হাসি দেখা গেলো এবার।

"তাহলে আমি সন্ধ্যার সময় আসি," হাতটা না ছেড়েই বললো বাস্টার্ড। দোকানি মাথা নেড়ে সায় দিলো। কিন্তু সন্ধ্যার সময় সুলতান আসে কি না আসে সেটা জানবো কেমন করে?"

"সন্ধ্যার পর হে আসবোই," জোর দিয়ে বললো দোকানি।

"আমি তো উঠেছি গুলশানে...এতো দূর থেকে এসে যদি দেখি সে আসে নি...আবার ধরেন ফোনটাও বন্ধ থাকলো, সমস্যা না?" হাতটা এখনও ধরে রেখেছে সে। ট্যাকটাইল কমিউনিকেশন। যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলেন, কাউকে কনভিন্স করার জন্যে নাকি স্পর্শের একটা গুরুত্ব আছে। মুখের কথার চেয়ে শারিরীক স্পর্শসহকারে বললে ভালো ফল পাওয়া

যায়। এখন সেটাই করছে সে।

"কথা তো ঠিকই কইছেন," দোকানি একমত পোষণ করলো।

"আপনার যদি মোবাইল থাকে তাহলে গুলশান থেকেই আপনাকে ফোন করে জেনে নিতাম সুলতান এসেছে কিনা...তাই না?" লোকটা এ কথার সাথেও সায় দিলো। "আমাকে এটুকু উপকার করলে সুলতানও আপনার উপরে খুব খুশি হবে।"

"সমস্যা নাই, আমার ফোন নম্বর লইয়া যান। সন্ধ্যার পর ফোন দিয়েন..." লোকটা তার ফোন নাম্বার বলতে লাগলো।

লোকটার হাত ছেড়ে দিয়ে তার ফোন নাম্বারটা নিজের ফোনে সেভ করে নিলো বাস্টার্ড। ধারণা করেছিলো সুলতানের খোঁজ পেতে কম করে হলেও দুতিন দিন লাগবে। সেরকম প্রস্তুতিও তার ছিলো, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অনেক আগেই কাজটা করা যাবে। বেশ ফুরফুরে মেজাজে তিন তলা বাড়িটার চারপাশ ঘুরে দেখতে লাগলো সে। তার হাতে অনেক সময় আছে। এ সময়টা কাজে লাগাতে হবে।

***

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার পরই আলিমুদ্দীনের বাড়ির পাশে মুদি দোকানে বাইশ তেইশ বছরের এক ছেলে ঢুকলে দোকানি নিজের জায়গা থেকে উঠে সম্ভ্রমের সাথে সালাম দিয়ে কী যেনো বলে গেলো। লোকটার কথা শুনে ছেলেটা খুব অবাক হয়ে ভুরু কুচকে রইলো কিছুক্ষণ। তারপরই ছেলেটা দোকান থেকে হনহন করে বের হয়ে আলিমুদ্দীনের বাড়িতে ঢুকে পড়লে দোকানির চোখেমুখে বোকা বোকা ভাব ফুটে উঠলো। এমনকি রাস্তার ওপারে, দোতলার উপর থেকেও সেই চেহারায় কিছুটা ভয় দেখতে পেলো বাস্টার্ড।

বিকেলের পর থেকে এই এলাকা ছেড়ে আর অন্য কোথাও যায় নি সে। এখানকারই এক হোটেলে খাবার খেয়েছে। আর সেটা করতে গিয়ে তার লাভই হয়েছে। এটা খুবই ঘনবসতি এলাকা। তার উপর হোটেল রেস্তোরাঁয় স্থানীয় অধিবাসীদের আড্ডা মারার স্বভাব বেশ পুরনো। একটু কান পাতলে তাদের চড়া গলার কথা স্পষ্ট শোনা যায়। আর এসব গালগল্পের ভীড়ে কখনও কখনও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যও পাওয়া যায় একেবারে বিনা খরচায়। তো বাস্টার্ডেরও কিছু বাড়তি তথ্য জানা হয়ে গেছে ভাত খেতে খেতে। তার পাশের টেবিলেই বসেছিলো দুই মাঝবয়সী লোক। খাওয়ার চেয়ে তারা কথাই বলেছে বেশি।

"কাইল্যা রঞ্জু বলে আমির হোসেনরে কাপড় দিছে?" মাথায় টুপি দেয়া পাঞ্জাবি-লুঙ্গি পরা লোকটি বলছিলো তার সঙ্গীকে।

প্লেটের ভাত আর মুরগির ঝাল-ফ্রাই মেশাতে মেশাতে প্যান্ট-শার্ট পরা সঙ্গী বলে, "দিছে মাইনে...আমির হোসেনের তো পাতলা পায়খানা শুরু অয়া গেছে।"

"কতো চাইছে এইবার?"

"হুনলাম তো দশ লাখ।"

"আমির হোসেন বলে ঘরে খিড়কি মাইরা বয়া আছে...বাড়ির বাইর অয় না।"

"পরশুগা তো ওর দোকানের এক কর্মচারীরে গুলি করছে...হুনো নাই?"

"হুনছি তো।"

"আমির হোসেন এহন কী করবো?"

"কী আর করবো...ট্যাকা তো দিতেই অইবো...হুনলাম, সুলতানরে ধরছে। একটু কমায়া টমায়া দিবার চাইতাছে।"

"কইথেকা যে এই খানকির পোলাটা আয়া আমাগো মহল্লায় হান্দাইছে...শান্তি হারাম কইরা দিছে হালারপুতে।"

"কইথেকা আবার ঢুকবো...বেঈমান তো আমাগো মইদ্যেই আছে। তোমাগো দলের নেতা... যারে মাথায় কইরা নাচো... ওই মাঙ্গের পোলায়ই তো সুলতানরে মহল্লায় ঢুকাইছে।"

"আর তোমাগো দলের নেতা মনে হয় মক্কা শরীফের ইমাম সাব?... ওই হাউয়ার পোলায় সুলতানরে শেল্টার দেয় নাই?"

“আরে রাখো ঐ হালারপুতেগো কথা... সব খানকির পোলা এক রকম।” টুপি পরা লোকটা গজগজ করতে করতে বলে।

“পাবলিকের পোঙা মাইর‍্যা খানকির পোলারা মজমা মারায়... মিলিটারিই ভালা, বুঝছো? ..মিলিটারি আইলে ঐ হালারপুতেরা হোগার কাপড় মাথায় উঠাইয়া ইন্দুরের গর্তে গিয়া হান্দায়...”

“হ, তুমি তো কইবা-ই... তোমার মাগিবাজ নেতা তো মিলিটারিই আছিলো।”

“ঐ মাগিবাজটার চায়া এরা কি ভালা নাকি... এরা অইলো ফকিন্নির পুত। খাবলাখাবলি কইরা দেশটারে শ্যাষ কইরা ফাইলাইতাছে।”

কথার মাঝখানে বিরতি দিয়ে দু'এক লোমা ভাত মুখে ঢুকিয়ে আবার কথা বলতে থাকে তারা।

“আমির হোসেনের ভাতিজা জিন্না আছে না ...” প্যান্ট-শার্ট বলে। “উই তো সুলতানের উপর মার বিলা... এক সময় তো জিন্নাও কম আছিলো না... পুরানা রংবাজ... জিন্না কইছে, সুলতানরে দেইহা লইবো।”

“বুঝছি, জিন্নার মরণ আইছে... হালার গুলি খায়া মরবার শখ অইছে।”

“আরে মিয়া হুনো... বাপের উপরেও বাপ আছে... কাইল্যা রঞ্জু আর সুলতান যতো বড়ই হউক না... একটা সীসা ঢুকায়া দিলে সব শ্যাষ... কই যাইবো মাস্তানি!”

আবার কয়েক লোকমা ভাত মুখে দিলে তাদের কথাবার্তায় ছেদ পড়ে কিন্তু একটু পরই সেটা শুরু হয় যথারীতি।

“সুলতাইন্যা আবার একটা মাইয়া লইয়া আইছে... জানো নি?” টুপিওয়ালা বলে।

“পুরা মহল্লা জানে!”

“মাইয়াটা নাকি হেপারের... জোর কইরা তুইলা আনছে।”

“কও কি!”

“ঘরে তালা মাইরা রাখে।”

“হালার দ্যাশে কি কুনো আইন-আদালত আছে... আলিমুদ্দীনের বাড়ির চাইরটা বাড়ি পরই পুলিশের ফাড়ি!”

“খাও, খাও... এই দ্যাশের কুননা ফিউচার নাই, বুঝলা... নাটকির পোলারাই এই দ্যাশ চালাইবো।”

টুপিওয়ালার এই আক্ষেপের পর তারা দুজনে খাওয়ার দিকে মনোযোগ দেয়। তবে বাস্টার্ড জানে একটু পরই তারা আবার কথায় মশগুল হয়েছিলো। সেটা অবশ্য সে শুনতে পায় নি, খাওয়া শেষ করে হোটেল থেকে বের হয়ে যায় সে।

এখন দাঁড়িয়ে আছে নাজিরা বাজার আহলে হাদিস মসজিদের দোতলার বিশাল একটি জানালার সামনে। তার মাথায় মসজিদে রাখা বেতের টুপি। ফুল প্যান্টের অনেকটা অংশ ভাঁজ করে গোড়ালীর উপর তুলে রেখেছে। আপাতত সে নামাজি। এখান থেকে নীচে আলিমুদ্দীনের বাড়ি আর মুদি দোকানটা বেশ ভালোভাবে দেখা যায়। দীর্ঘক্ষণ জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে দু'একজন নামাজি তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে, তবে কিছু বলছে না।

হোটেলে দু'জন লোকের কথাবার্তা থেকে কিছু তথ্য জানতে পেরেছে সে।

এখানকার লোকজন ব্ল্যাক রঞ্জুকে কাইল্যা রঞ্জু বলে ডাকে। একেবারে সঠিক অনুবাদ। সুলতান এই মহল্লায় বহিরাগত একজন। স্থানীয় ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দলের নেতার সমর্থন আছে তার। তবে মহল্লার লোকজন তার প্রতি বৈরী। এটা একটা সুবিধা। সুলতান এক মেয়েকে জোর করে নিজের ঘরে আঁটকে রেখেছে তালা মেরে। তার মানে ঘরে আর কেউ নেই, সেই মেয়েটি ছাড়া।

মসজিদ থেকে দ্রুত নেমে গেলো সে। নীচে নেমেই মসজিদের পাশে একটা গলিতে ঢুকে ফোন করলো মুদি দোকানিকে।

"হ্যালো?"

"গুলশান থেকে বলছিলাম...র ভায়ের লোক...চিনতে পারছেন?"

কোনো সাড়া শব্দ নেই। কয়েক সেকেন্ড পরই লাইনটা কেটে দেয়া হলো।

যা বোঝার বুঝে গেলো সে। এখন আর দেরি করা যাবে না। আলিমুদ্দীনের বাড়ির চারপাশটা তার মনে গেঁথে আছে। সিদ্ধান্ত নিলো সামনে দিয়ে নয়, পেছন দিয়ে ঢুকবে সেই বাড়িতে।

আলিমুদ্দীনের বাড়ির পেছন দিকটা মূল বাড়িটার চেয়ে অনেক বড়। আগে এটা খালি জায়গা ছিলো, বছর দশেক আগে এক সারি টিনশেডের ঘর তুলে ভাড়া দেয়া হয়েছে। দেখতে মেথরপট্টি কিংবা চতুর্থশ্রেণী সরকারী কর্মচারীদের কলোনির মতো। দু'পাশে টিনশেডের ঘরের সারি, মাঝখানে চার-পাঁচ ফুটের সংকীর্ণ একটি গলি। নোংরা। তাকে ঢুকতে দেখে লুঙ্গি পরা হ্যাংলা পাতলা এক লোক চেয়ে আছে। লোকটা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু একটা খাচ্ছিলো। তাকে দেখে জিনিসটা লুকিয়ে ফেলেছে। বুঝতে পারলো, ফেন্সিডিল।

সামনের দিকে এগিয়ে গেলো সে। বিকেলের দিকে এখানে আরেকবার এসেছিলো। এই কলোনির শেষ মাথায় দশ ইঞ্চির ইট দিয়ে একটা নীচু দেয়াল আলিমুদ্দীনের তিন তলা বাড়ির সাথে পার্টিশান তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে। তবে ছোট্ট একটা দরজা আছে মূল বাড়িতে আসা-যাওয়া করার জন্য। সে দেখেছে দরজাটা সব সময় খোলাই থাকে।

আরেকটা বাড়তি সুবিধা।

কাউকে কিছু না বলে সোজা চলে গেলো সেই সুবিধার সদ্ব্যবহার করার জন্য।

মূল বাড়িটাও লম্বা, তবে ডান দিকে ছয়-সাত ফুটের প্যাসেজ সোজা চলে গেছে বাড়ির সামনের দরজার দিকে। বাম দিকে পর পর কয়েকটা ঘর, তারপর সিঁড়ি। সিঁড়ির পর আবার দুটো ঘর। ভেতরটা ঘুঁট ঘুঁটে অন্ধকার। কোনো বাতি জ্বলছে না। নীচের বেশিরভাগ ঘরই তালা মারা। শুধু একটা ঘর থেকে আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। সেই ঘরটার পাশেই সিঁড়ি।

সিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে উঠে গেলো সে। তিন তলার ঘরগুলোর সব দরজাই বন্ধ। তবে তালা দেয়া নেই। নীচে যেটা প্যাসেজ ছিলো তিনতলায় সেটাই বারান্দা কাম-প্যাসেজ। সুলতান সম্ভবত এখান থেকেই তার সাথে ফোনে কথা বলেছিলো। কারণ এখান থেকেই বড় রাস্তাটা দেখা যায়। শাটারের কারখানাটাও এখান থেকে চোখে পড়ে।

কিন্তু কোন্ ঘরে আছে সুলতান?

সবগুলো ঘরে ঢু মেরে মেরে তো সেটা বের করা যাবে না।

বেলকনিতে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করলো। এটাতে হাশেম সাহেবের সিম আছে। তার দুটো মোবাইলই সাইলেন্স মুড়ে রাখা। ব্ল্যাক রঞ্জু২ নাম্বারে কল করলো সে। মনে মনে আশা করলো সুলতানের মোবাইলটা যেনো তার মতো সাইলেন্স মুডে না থাকে।

একটা মৃদু রিং বাজার শব্দ শোনা গেলো। আওয়াজটা আসছে ডান দিকের তিন নাম্বার ঘর থেকে। ঘরের দরজা বন্ধ। তবে জানালার একটা কপাট খোলা। পর্দার কারণে ভেতরটা দেখা না গেলেও শব্দটা যে ওখান থেকে আসছে সেটা বুঝতে পারলো। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে উঠলো সে।

***

ঘরে ঢুকেছে পাঁচ মিনিটও হয় নি, এরইমধ্যে ফোন! মাত্র জামা কাপড় পাল্টাতে যাচ্ছিলো। একটু আগে পুরো এক বোতল ফেন্সি খেয়ে এসেছে। একটা ঝিমুনি ভাব চলে এসেছে তার মধ্যে। মেজাজটা বিগড়ে গেলো সুলতানের।

তার মেজাজ খারাপের আরো কারণ আছে। বাড়িতে ঢোকার আগেই মুদি দোকানি শামসু বললো ইন্ডিয়া থেকে তার খোঁজে এক লোক এসেছিলো। আজব! তাকে কেন খুঁজবে? রঞ্জু ভায়ের কোনো লোক তাকে ফোন না করে সোজা চলে আসবে এখানে? অসম্ভব! তাকে

নাকি ফোন করে পায় নি। একদম মিথ্যে কথা। তার ফোন এক মিনিটের জন্যেও বন্ধ ছিলো না। ঘটনাটা কি? ডিবি? না। সব তো ম্যানেজ করা আছে।

এ কথা ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢুকেই দেখে লাইজু কাঁদছে। মেজাজ আর ঠিক থাকে কী করে। মেয়েমানুষ এতো কাঁদতে পারে! আজ দু'সপ্তাহ ধরে শুধু কেঁদেই যাচ্ছে। সে ভেবেছিলো দু'একদিন কান্নাকাটি করার পর পাখি পোষ মানবে। না, এই মেয়েটা মনে হয় আরো ভোগাবে।

"ঘরে ঢুইক্যা কান্নাকাটি দেখলে আমার মিজাজ খারাপ হয়া যায়...এইটা আর কতো কমু!" রিং বাজার আগে এ কথা বলেছিলো সে। তারপরও লাইজু খাটের এক কোণে গুটিশুটি মেরে কেঁদেই চলছে। আর কিছু না বলে ওয়ার্ডরোব থেকে লুঙ্গি আর গেঞ্জি বের করে যেই না পরতে যাবে অমনি এই বালের ফোনটা বেজে উঠলো!

ডিসপ্লে'র দিকে তাকাতেই অবাক হলো সে। হাশেম সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে লুঙ্গি আর গেঞ্জি বিছানার উপর রেখে দরজার দিকে পা বাড়ালো। এই মেয়ের সামনে এসব কথা বলা ঠিক হবে না। দরজাটা খুলে বাইরে পা বাড়ানোর আগেই ঘটলো ঘটনাটা।

ব্ল্যাক রঞ্জুর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী সুলতান তার নিজ ঘরের খাটের উপর এক হাতে নাক চেপে বসে আছে। তার থেকে একটু দূরে বসে আছে আলুথালু চুলের এক মেয়ে। ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে গেছে মেয়েটি। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে আগন্তুকের দিকে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বাস্টার্ড। একটু আগে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। তার ডান হাতে সাইলেন্সর লাগানো একটি পিস্তল। তাক করে রেখেছে বিপর্যস্ত হওয়া সুলতানের দিকে।

ফোন হাতে নিয়ে দরজা খুলতেই দরজার কপাটটা সজোরে সুলতানের মুখে আঘাত করলে কয়েক পা পেছনে ছিটকে পড়ে সে। খাটে বসা মেয়েটি আৎকে উঠেছিলো ঠিকই, তবে পিস্তল দেখে সঙ্গে সঙ্গে চুপ মেরে গেছে। বাস্টার্ড জানে আশেপাশের লোকজন কিছু শুনতে পেলেও তারা ধরে নেবে সুলতান হয়তো মেয়েটাকে নির্যাতন করছে।

দরজার কপাটের আঘাতে সুলতানের নাক ভেঙে গলগল করে রক্ত পড়তে থাকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখতে পায় রোদে পোড়া এক সুদর্শন যুবক

তার দিকে একটা সাইলেন্সর পিস্তল তাক করে ঘরে ঢুকছে।

বাম হাতের তর্জনী নিজের ঠোঁটের কাছে এনে ঘরের দু'জন মানুষকে চুপ থাকতে বললো সে।

সুলতান ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে।

বিছানার উপর একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি পড়ে আছে। সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বাস্টার্ড বললো, "গেঞ্জিটা নাকে চেপে ধরো।"

সুলতান গেঞ্জিটা দলা পাকিয়ে নাকে চেপে ধরলো। রক্তে তার থুতনী আর বুক ভিজে একাকার।

এবার মেয়েটার দিকে ফিরলো সে। "আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। আমি জানি ও তোমাকে জোর করে তুলে এনেছে। ওর হাত থেকে তুমি মুক্তি পাবে, যদি আমার কথামতো কাজ করো।"

মেয়েটা নিষ্পলক চেয়ে রইলো। তবে বাস্টার্ড জানে মেয়েটা তার কথা বিশ্বাস করেছে। তাকে নিয়ে আপাতত চিন্তার কিছু নেই।

"আপনি...কে?" হাফাতে হাফাতে নাক চেপেই বললো সুলতান।

"সব জানতে পারবে...আগে তোমার ব্লিডিং বন্ধ করো।"

পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেলো, কেউ কোনো কথা বললো না।

"আপনি কি চান?"

"খুব সামান্য একটা জিনিস," একদৃষ্টিতে সুলতানের দিকে চেয়ে বললো সে। "তবে তুমি যদি এই সামান্য জিনিসের জন্য নিজের বিপদ ডেকে আনো তাহলে আমার কিছু করার থাকবে না।"

"বুঝলাম না," রক্তভেজা গেঞ্জিটা দিয়ে নাক-মুখ মুছতে মুছতে বললো সুলতান। নাকের ব্লিডিংটা বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ মাথাটা ছাদের দিকে মুখ করে রেখে দিয়েছিলো। বাস্টার্ডও জানে এভাবে নাকের ব্লিডিং দ্রুত বন্ধ হয়।

"একটা কথা তোমাকে পরিস্কার বলতে চাই...এখানে আমি বেশিক্ষণ থাকবো না। এই অল্প সময়ের মধ্যে তোমাকে সঠিক কাজটা করতে হবে।"

"কাজটা কী?" অনেকটা অধৈর্য হয়ে জানতে চাইলোরর সহযোগী।

"রঞ্জুর সাথে আমাকে দেখা করতে হবে...আর সেটা কিভাবে সম্ভব তুমি বলে দেবে।"

"আপনি কি ডিবি'র লোক?"

"তারচেয়েও বড় কিছু।"

সুলতানের কপালে ভাজ পড়লো। মনে হলো সুলতান একটু ভয় পেয়ে গেছে। "রঞ্জু ভায়ের সাথে দেখা করবেন কেমনে?"

"আমরা তার সাথে কিভাবে দেখা করবো সেটা নিয়ে তোমার ভাবার দরকার নেই। ইচ্ছে করেই আমরা' শব্দটা ব্যবহার করলো সে।

"আমি জানি না উনি কোথায়-"

কথাটা শেষ করতে পারলো না সুলতান। তার ঠিক কপাল বরাবর সাইলেন্সারের নলটা ঠেকালো বাস্টার্ড। "আমি আগেই বলেছি, আমার হাতে বেশি সময় নেই। আর এটা তো তুমি চিনেছে, নাকি?" মাথা নেড়ে সায় দিলো সুলতান। "এটা দিয়ে গুলি করলে কোনো শব্দ হবে না।"

"আমি জানি ভায়ে কোলকাতায় আছে...কিন্তু কোন্‌খানে আছে, মানে ঠিক কোন জায়গায় আছে আমি জানি না।" সুলতান ভয়ে ভয়ে বললো।

"তুমি কখনও কোলকাতায় যাও নি?"

মাথা নাড়লো সে। "আমি তো এইখানে কাজ করি...ভাই দ্যাশে আইলে দেখা হয়। কোলকাতায় যাওয়ার দরকার হয় না।"

"তোমার ভাই দেশে আসে?" অবাক হলো বাস্টার্ড।

"দুই-তিন মাস পর পর আসে।"

"কিন্তু যেভাবে হোক তুমি জানো সে কোথায় থাকে, ঠিক না?"

"না...বিশ্বাস করেন, আমি জানি না।"

ঘরের ভেতরটা ভালো করে দেখে নিলো বাস্টার্ড। ওয়ার্ডরোবের পাশে একটা একুশ ইঞ্চির টিভি আছে। মেয়েটার দিকে চেয়ে বললো, "এই বানচোতটা কোন্ চ্যানেল বেশি দেখে?"

কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় বললো মেয়েটা, "...হিন্দি চ্যানেলগুলান।"

"ওইরকম একটা চ্যানেলে টিভিটা ছাড়ো।"

বিছানা থেকে নেমে মেয়েটা কথামতো একটা হিন্দি চ্যানেল ছাড়লো। "সাউন্ডটা বাড়িয়ে দাও।"

টিভির সাউন্ড বাড়িয়ে দিলো মেয়েটি। সখির দল সঙ্গে নিয়ে হিন্দি ছবির এক নায়িকা নাচছে।

বাস্টার্ড দেখতে পেলো বাম দিকে একটা ছোটো দরজা বন্ধ করে রাখা হয়েছে সেটা। "ওই দরজাটা কিসের?"

"বাথরুমের," জবাব দিলো মেয়েটি।

"তুমি কিছুক্ষণ ওখানে থাকো। আমি বললে বের হবে। ওর সাথে আমার কিছু কথা আছে।"

সুলতানের মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

মেয়েটি বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করলে সুলতানকে বললো সে, "এতোদিন ধরে ভায়ের সাথে থাকো অথচ সে কোথায় থাকে কিছুই জানো না ...এটা তো বিরাট অন্যায়।" বিছানা থেকে দলা পাকানো লুঙ্গিটা বাম হাতে তুলে নিলো সে, তারপরই আচমকা একটা ভোতা শব্দ হলো। অনেকটা জোরে থুতু ফেলার মতো।

গগনবিদারী চিৎকার দিতেই সুলতানের মুখের ভেতর সেই লুঙ্গি ঠেসে ধরলো। বিছানায় শুইয়ে ফেলে তার মুখটা বাম হাতে চেপে ডান হাতের পিস্তলটা ঠেকালো সুলতানের বাম কানে। তার বুকের উপর চড়ে বসলো সে।

"কোনো রকম শব্দ হলেই তুই মরে যাবি," ফিসফিস করে বললো বাস্টার্ড।

ঘোৎঘোৎ শব্দ করতে লাগলো সুলতান। তার নাক দিয়ে আবারো রক্তপাত শুরু হয়ে গেছে। দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে পানি। তার বাম হাটুর একটু উপরে গুলিটা করা হয়েছে।

"রঞ্জু এখন কোথায় আছে?" বেশ শীতল কণ্ঠে জানতে চাইলো সে। "আবার যদি বলিস

কিছু জানিস না...আরেকটা গুলি খরচ করবো।” মুখ থেকে লুঙ্গিটা সরালো।

“ভাই...ভাই...আমি আসলেই জানি না-” হাপাতে হাপাতে বললো সুলতান। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাটুর উপর পিস্তলের নলটা ঠেকালো বাস্টার্ড। “কিন্তু যে লোক জানে তার ঠিকানা আমি দিতে পারুম।”

একটু ভাবলো সে। “বল।”

“কোলকাতা থেইকা ভায়ের এক লোক আইছে... লেডি গিয়াস... হোটেল পিং সিটিতে উঠছে... উত্তরায়... সে জানে ভায়ে কোনখানে থাকে। ভায়ের খুব ঘনিষ্ঠ লোক।”

এক নিঃশ্বাসে বলে গেলো সুলতান।

লেডি গিয়াসের ফোন নাম্বার, হোটেল পিং সিটির ঠিকানা সব জেনে নিলো সুলতানের কাছ থেকে। লুঙ্গি দিয়ে হাটুটা বেধে নিতে বললো তাকে। গলগল করে রক্ত পড়ছে সেখান থেকে।

“লেডি গিয়াসের সাথে তোর কখন কথা হয়েছে?”

“সকালে।”

“ওকে আবার ফোন কর।”

“ফোন কইরা কী বলুম?” যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে জানতে চাইলো সুলতান।

“স্পিকার টোনে দিয়ে কথা বলবি...জানতে চাইবি তার কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা... এইসব। একটু চেক করে দেখতে চাচ্ছি তুই সব ঠিকমতো বলেছিস কিনা। কোনো রকম চালাকি করবি না।”

সুলতান তার ফোনটা হাতে নিয়ে লেডি গিয়াসকে ফোন করলো। স্পিকার টোনে থাকার কারণে তাদের কথাবার্তা শুনতে পেলো বাস্টার্ড।

সুলতানের দেয়া তথ্য ঠিকই আছে। লেডি গিয়াস উত্তরার পিং সিটি নামের একটি নতুন হোটেলে উঠেছে।

“ওই মেয়েটাকে কোত্থেকে এনেছিস?” প্রসঙ্গ পাল্টে জানতে চাইলো সে।

“কেরাণীগঞ্জ থেইকা।”

“এ জীবনে কটা খুন করেছিস?”

ঢোক গিললো সুলতান। “আমি কোনো খুনখারাবি করি নাই।”

“ভালো। আমি এখান থেকে চলে যাবার পর তুই তো ঐ মেয়েটাকে ছেড়ে দিবি না।”

“না, ভাই... ছাইড়া দিমু... আল্লাহর কসম... ছাইড়া দিমু?”

“এতোদিন ধরে আটকে রেখেছিস...এখন আমার এক কথায় ছেড়ে দিতে পারবি?”

“পারুম...বিশ্বাস করেন। আপনে যা কইবেন তাই করুম।”

“ভালো।”

ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিলো সে।

“চুপচাপ বসে থাক... নড়াচড়া করবি না। আমি মেয়েটাকে বাথরুম থেকে বের করছি... ঠিক আছে?”

“ঠিক আছে, ভাই,” ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো সুলতান।

বিছানা থেকে উঠে সুলতানের পেছনে চলে এলো সে। মাথা ঘুরিয়ে তাকে দেখার চেষ্টা করলো না ছেলেটা। বাম হাটুর ক্ষতস্থানে লুঙ্গিটা চেপে রেখেছে। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে ভয়ে আর যন্ত্রণায়।

জোরে থুতু ফেলার মতো শব্দ হলো আবার। সেইসাথে অস্ফুট এক গোঙানি। বিছানায় ঢলে পড়লো বহু খুনখারাবি করা কুখ্যাত সন্ত্রাসী সুলতান।

মাথার ঠিক পেছনে গুলিটা করা হয়েছে। ঘরের দরজা আর তার পাশের দেয়ালে রক্তের ছিটা লেগে একাকার।

বাস্টার্ড জানে সুলতান কোনো মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে নি।

তাকে সহযোগীতা করার পুরস্কার স্বরূপ এটা এক ধরণের প্রতিদান।

পুরনো ঢাকা থেকে উত্তরায় যাবার আগে বাস্টার্ড মাঝখানে নিজের বাড়িতে গিয়েছিলো পরবর্তী অভিযানের প্রস্তুতি নিতে। লাইজু নামের এক মেয়েকে মুক্ত করে সুলতানের ঘরে তালা মেরে চলে আসে। একটা ইয়েলো ক্যাবে করে হোটেল পিং সিটিতে যখন পৌঁছালো তখন রাত আটটা বেজে দশ মিনিট।

একেবারে নতুন একটি হোটেল। স্থাপত্য বেশ আধুনিক। ছয় তলার হোটেলটির পুরো গ্রাউন্ড ফ্লোর জুড়ে পার্কিংএরিয়া। হোটেল কর্তৃপক্ষ এটাকে তিন তারার বলে দাবি করলেও বাস্টার্ডের কাছে তা মনে হলো না। তবে বেশ ছিমছাম একটি হোটেল।

৩০৩ নাম্বার রুম।

তার মানে তিন তলায়। সে জানে হোটেলগুলো প্রতিটি তলার জন্য শতক সংখ্যা ব্যবহার করে। সেদিক থেকে ৩০৩ মানে তিন তলার তিন নাম্বার রুম। দোতলায় ফ্রন্ট ডেস্কের সামনে এসে দেখতে পেলো ডেস্কের একমাত্র লোকটি টিভি'তে হিন্দি ছবি দেখছে। লোকজন তেমন একটা নেই। সামনে কতগুলো চেয়ার থাকলেও সেগুলোতে হোটেলের কোনো গেস্টকে দেখা গেলো না।

সব ঘরেই টিভি আছে, সুতরাং সস্তা হোটেলের মতো গেস্টরা ফ্রন্ট ডেস্কের সামনে বসে টিভি দেখবে না সেটাই তো স্বাভাবিক।

বাস্টার্ডকে এগিয়ে আসতে দেখে লোকটা টিভি থেকে চোখ সরিয়ে নিলো।

"রুম আছে?"

"জি, স্যার।"

"তিন তলায়?"

"আছে...তবে সিঙ্গেল নাই।" লোকটা চকিতে টিভির দিকে তাকিয়ে বললো। "সিঙ্গেল হবে চার আর পাঁচ তলায়..."

"আমি একটু রুমগুলো দেখতে চাই।"

"সিঙ্গেল?"

মাথা নাড়লো সে।

অনেকটা অনিচ্ছায় চারপাশে তাকিয়ে ইদ্রিস নামের একজনকে ডাকলো লোকটা। হ্যাংলা পাতলা এক তরুণ এসে হাজির হলো ডেস্কের কাছে।

"যা...স্যার্‌রে চার তলার সিঙ্গেল রুম দেখাইয়া আন।"

লিফটের বোতাম টিপতে গেলে ইদ্রিসকে বাধা দিয়ে বললো সিঁড়ি ব্যবহার করবে সে। সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায় উঠতেই বাস্টার্ড থেমে ইদ্রিসের দিকে তাকালো। "তিন তলায় ডাবলবেডের রুমগুলো কেমন?"।

"আপনে সিঙ্গেল রুম দেখবেন না?" ছেলেটা সরলভাবে জানতে চাইলো।

"সিঙ্গেল রুমই দেখবো...কিন্তু আমার এক বন্ধু...কয়েক দিন আগে এখানে থেকে গেছে...সে বলেছে তিন তলার রুমগুলো নাকি ভালো।"

"এই হোটেলের সবগুলা রুমই ভালা," ইদ্রিস একেবারে যোগ্য কর্মচারির মতোই জবাব দিলো দাঁত বের করে হেসে।

"তা ঠিক," বাস্টার্ডও হেসে বললো। "কিন্তু ভালোর মধ্যেও ভালো আছে না?"

"তাতো আছেই।"

"তিন তলায় কি কোনো রুম খালি নেই?"

"আছে...তবে ডাবল।"

"রুমটা দেখা যাবে?"

"চলেন।"

ইদ্রিস ৩০৬ নাম্বার রুমের সামনে নিয়ে এলো তাকে। পকেট থেকে চাবি বের করে খোলার আগেই বাস্টার্ড ৩০৩ নাম্বার রুমটা দেখে নিলো।

প্যাসেজের একেবারে শেষ মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেললো ৩০৬ রুমটাই তার

জন্যে ঠিক হবে। তারপরও বাড়তি সুবিধার জন্য ৩০৩-এর ঠিক বিপরীতে ৩০৪ নাম্বার রুমটা দেখে পেছন থেকে ইদ্রিসের কাঁধে হাত রাখলো।

“কি?”

“৩০৪ খালি আছে?”

ইদ্রিস একটু ভেবে বললো, “ঐটা বুক হইয়া গেছে।”

“এখনও লোক ওঠে নি?”

“না।”

“কখন আসবে?”

“প্লেন নামলেই আইবো।” ইদ্রিস দরজা খুলে ৩০৬ নাম্বারে ঢুকে পড়লো। দরজার পাশে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিলো ছেলেটা। “দ্যাহেন।”

দেখার কিছু নেই তারপরও এমনভাবে দেখতে লাগলো যেনো হোটেলের রুম বাছাই করার ব্যাপারে সে ভীষণ খুঁতখুঁতে। তিন-চার মিনিট সময় নিয়ে। দেখে অবশেষে ইদ্রিসের দিকে ফিরে বললো, “এই রুমটাই ভালো।”

“আপনে কি ফ্যামিলি নিয়া থাকবেন?”

“না।”

“তাইলে খামোখা ডাবল লইয়া কী লাভ?” ইদ্রিস এবার গেস্টবান্ধব আচরণ করছে।

“সিঙ্গেল খাটে আমি ঘুমাতে পারি না...হোটেলগুলোর সিঙ্গেল খাট খুব ছোটো হয়। ডাবলই ভালো হবে।”

“হাত-পা ছড়াইয়া ঘুমান?”

নিঃশব্দে হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। যেনো এই বয়সে এভাবে ঘুমানোটা ছেলেমানুষি কাজ।

“আপনে যেখানে খুশি থাকেন...সমস্যা নাই,” ইদ্রিস বললো। “তাইলে আর উপরের সিঙ্গেল রুম দেখবেন না?”

“না। তার কোনো দরকার নেই।” আর কথা না বাড়িয়ে ইদ্রিসসহ বাস্টার্ড চলে এলো নীচের ফ্রন্ট ডেস্কে।

“সিঙ্গেল রুমে না থাকবেন কইলেন,” কথাটা বলেই রেজিস্ট্রি খাতাটা খুলে ফেললো লোকটা। “পনেরোশ’ টাকা, সাথে ভ্যাট।”

“এতো?” কৃত্রিম বিস্ময় নিয়ে বললো বাস্টার্ড।

“রুমটা তো দেখছেনই...ফিটিংসগুলা সব বিদেশী...তাছাড়া এখানকার কোনো হোটেলে এরকম সিকিউরিটি নাই।”

“তাই নাকি?” আবারো বিস্মিত হলো সে। “কী রকম সিকিউরিটি আছে এখানে?”

“ফায়ারএস্কেপ সিঁড়ি...ফায়ার অ্যালার্ম...তারপর ধরেন-”

“থাক, আর বলতে হবে না।” পেছনের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে পনেরোশ’ টাকা রাখলো ডেস্কের উপর।

সাড়ে আটটার আগেই সব ফর্মালিটিজ সেরে ৩০৬ নাম্বারে এসে পড়লো সে। এখন অপেক্ষা করবে, তারপর সুযোগ বুঝে কাজে নেমে পড়বে। বিছানায় শুয়ে টিভি ছেড়ে দিলো।

অ্যানিমেল চ্যানেল। কীটপতঙ্গের শিকার করার দৃশ্য। বিদঘুঁটে সব কীটপতঙ্গ। নিজেদের আহার জোগাচ্ছে। বন্ধ করে দিলো। তার পছন্দ বাঘ সিংহ-নেকড়ে-ঈগল। কীটপতঙ্গ তার ঘেন্না লাগে।

ঘরের বাতি নিভিয়ে চুপচাপ বিছানায় পড়ে রইলো। এই সময়টায় নিজের পরিকল্পনা আরো গুছিয়ে নিতে পারবে। চোখ বন্ধ করে ফেললো সে। তবে ঘুমালো না।

ন’টা বাজার পাঁচ মিনিট আগে উঠে বসলো। চেক করে নিলো সাইলেন্সার পিস্তলটা। তার কাছে এখন তিনটা মোবাইল। একটাতে আবুল হাশেমের সিম। অন্যটা সুলতানের। আর তার

নিজেরটা তো আছেই। দরজা খুলে আস্তে করে মাথাটা শুধু বের করলো। প্রথমে ডানে, তারপরও বায়ে। কেউ নেই। একেবারে নিরিবিলি পরিবেশ। সম্ভবত হোটেলে গেস্টের সংখ্যা কম। বাইরে এসে দরজাটা বন্ধ করে ৩০৩ নাম্বার রুমের কছে চলে এলো। দরজার নীচ দিয়ে তাকিয়ে দেখলো কোনো আলো জ্বলছে না।

তার মানে ঘরে কেউ নেই? নাকি লেডি গিয়াস ঘুমিয়ে আছে? তাকে নিশ্চিত হতে হবে।

দরজায় টোকা মারলো সে। পর পর বেশ কয়েকটি।

কোনো সাড়া শব্দ নেই। একটু অপেক্ষা করে আবারো টোকা মারলো। ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলে সে হয়ে যাবে মাতাল এক গেস্ট। তার ঘর কোনটা জানতে চাইবে। মাতলামির অভিনয় করবে। কোনো সমস্যা হবে না। বড়জোর কয়েকটা গালি হজম করতে হবে তাকে।

না। কেউ দরজা খুলে বের হলো না। ৩০৩-এ কেউ নেই। লেডি গিয়াস তাহলে উঠেছে কোথায়?

আরো দুটো সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে গেলো তার। হয়তো রুম ছেড়ে চলে গেছে। কিংবা এখনও রুমে ফিরে আসে নি।

তার হাতে অবশ্য আরেকটা তাস আছে। লেডি গিয়াসের ফোন নাম্বার। সুলতানের নাম্বার থেকে না করে তার নাম্বার থেকে একটা ফোন করলো সে। প্রথমবার এক দফা রিং হবার পরও কেউ ফোন ধরলো না। চিন্তায় পড়ে গেলো বাস্টার্ড। আবার ডায়াল করলো।

চারবারের বার কলটা রিসিভ করা হলো। বাজখাই গলায় একটা কণ্ঠ বললো, "কে?"

সে কিছু বললো না। লেডি গিয়াস কোথায় আছে বোঝার চেষ্টা করলো।

"কে?...কে, বলছেন?"

"দোস্ত, কেমন আছো?" বেশ আন্তরিকভাবে বললো বাস্টার্ড।

"কে?" মহাবিরক্ত লেডি গিয়াস।

"আরে দোস্ত আমি...কালাম।"

"ওই মিয়া কারে ফোন দিছেন?" ঝারি মেরে বললো লেডি গিয়াস।

"তুমি মজনু না?"

"ধুর শালা...রং নাম্বার।" লেডি গিয়াস লাইন কেটে দিলো।

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো লেডি গিয়াস বাইরে আছে। তাহলে কি হোটেল ছেড়ে চলে গেছে? নাকি হোটেলে ফিরে আসছে?

মেজাজ একটু খারাপ হয়ে গেলো। কোনো কিছু না জেনে অপেক্ষা করতে ভালো লাগে না তার। কিন্তু নিশ্চিত হবারও উপায় নেই।

অমনি একটা শব্দ শুনে কৌতূহলী হয়ে জানালার কাছে গেলো। দেখতে পেলো একশ গজ দূরেই রেললাইন দিয়ে একটা আন্তনগর ট্রেন ঢাকা ছেড়ে যাচ্ছে কোনো গন্তব্যে।

চট করে মাথায় একটা বুদ্ধি চলে এলো। ইন্টারকমে রুম সার্ভিসকে চাইলো সে।

"বলেন, স্যার," লাইনের ওপাশ থেকে একটা কণ্ঠ বললো।

"আমার রুমের পাশ দিয়ে তো ট্রেন যায়..." অভিযোগের সুরে বললো বাস্টার্ড।

"জি, স্যার।" ছেলেটা বুঝতে পারলো না সমস্যাটা কোথায়।

"আরে, ট্রেনের আওয়াজে কি ঘুম আসবে নাকি!"

"স্যার, এটাই শেষ ট্রেন...আর ট্রেন যাবে না। রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন।"

"তুমি বললেই হলো... মাঝরাতে ঢাকার বাইরে থেকে ট্রেন আসবে... তখন বলবে ওটাই শেষ ট্রেন..."

"না, স্যার, বললাম তো আর কোনো ট্রেন পাস করবো না," ছেলেটা আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো তাকে।

"ওপাশের একটা রুমে শিফট করা যায় না?" প্রস্তাব দিলো সে। "ওখান দিয়ে কোনো রেললাইন যায় নি।"

"না, স্যার। সেটা সম্ভব না।"

"কেন, রুম খালি নেই?"

"ওপাশের কোনো রুমই খালি নেই, স্যার।"

"কিন্তু আমার তো মনে হলো ৩০৩ নাম্বারটা খালি আছে?"

"না, স্যার। ওটাতে গেস্ট আছে।"

"তুমি শিওর?"

"জি, স্যার। শিওর।"

"ভালো করে চেক করে দ্যাখো... হয়তো কিছুক্ষণ আগে রুমটা ছেড়ে দিয়েছে... তুমি জানো না।" কথাটা বলেই অপেক্ষা করলো সে। মোক্ষম একটা চাল চেলেছে।

"জি না, স্যার। ওটার গেস্ট এখনও আছে। উনি সন্ধ্যার দিকে বের হয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো ফিরে আসবেন। ওটা খালি নেই।"

"ব্যাডলাক!" আক্ষেপে বললো সে।

"স্যার, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, আর কোনো ট্রেন পাস করবে না।"

"তোমার দেশের বাড়ি কোথায়?"

"জি, স্যার?!" ছেলেটা এমন অপ্রাসঙ্গীক প্রশ্নে অবাক হয়ে গেলো।

"বললাম, তোমার দেশের বাড়ি কোথায়?"

"সিলেট, স্যার।"

"তাহলে তোমার কথায় বিশ্বাস করা যায়। শাহজালালের দেশের লোক, নিশ্চয় মিথ্যে বলবে না। ঠিক আছে, তোমার কথাই বিশ্বাস করলাম।"

"থ্যাঙ্কু, স্যার। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যান। আর কোনো ট্রেন পাস করবে না।"

"ওকে।"

ইন্টারকমটা রেখে দিলো সে। এবার ভালো লাগছে। লেডি গিয়াস বাইরে আছে। হোটেলেই ফিরছে। তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এখন আর অপেক্ষা করতে খারাপ লাগবে না।

দরজাটা খোলা রেখে অন্ধকার ঘরে বসে রইলো চুপচাপ। ৩০৩ নাম্বার রুমে যে-ই ঢুকুক না কেন তাকে দেখতে পাবে। দশ মিনিট পর এক দম্পতি তার দরজার সামনে দিয়ে চলে গেলো। ৩০৪-এর কেউ? বিদেশ থেকে আসার কথা ছিলো যাদের? তা-ই হবে। বসে রইলো সে।

আরো দশ-পনেরো মিনিট পার হয়ে গেলেও লেডি গিয়াসের কোনো দেখা পেলো না। পুরো হোটেল জুড়ে নেমে এসেছে নিস্তব্ধতা। সন্দিহান হয়ে উঠলো সে। লেডি গিয়াস কি তবে সুলতানের মৃত্যুর খবর জেনে গেছে? সটকে পড়েছে কোথাও? কিন্তু কিভাবে জানবে? সুলতানকে ফোন করলে তো সে-ই রিসিভ করতে কলটা। না। কালকের সকালের আগে সেটা জানা সম্ভব না। হয়তো দু'তিন দিনের আগেও ব্যাপরাটা জানা যাবে না। অনেক আস্তানা আছে। সুলতানের। আলিমুদ্দীনের বাড়িটা হলো সেরকমই একটা। ওখানে এক মেয়েকে আঁটকে রেখেছিলো সে। তার দলের লোকজন নিশ্চয় ওখানে ঘনঘন যাতায়াত করে না।

ঠিক এমন সময় সিঁড়ির কাছে লোকজনের আওয়াজ শুনতে পেয়ে সতর্ক হয়ে উঠলো। একজন নয়, বেশ কয়েক জনের শব্দ। অন্ধকারে বসে খোলা দরজার দিকে চেয়ে রইলো। এক মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা তার দরজার সামনে দিয়ে চলে গেলো। এক-দু' সেকেন্ড পর এক হোটেল বয় ভারি একটা লাগেজ বয়ে নিয়ে চলে গেলো মহিলার পেছন পেছন। কপালে ভাঁজ পড়ে গেলো তার। এরা কারা?

একটু পরই পঞ্চাশোর্ধ এক লোক, হাতে একটা ছোট্ট লাগেজ নিয়ে হাফাতে হাফাতে তার দরজাটা অতিক্রম করলো।

চেয়ার থেকে উঠে দরজা দিয়ে মাথাটা বের করে দেখলো সে।

৩০৪-এ ঢুকছে লোকটা।

গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেলো তার। তাহলে একটু আগে যে দম্পতি এখান দিয়ে চলে গেছে তারা উঠেছে ৩০৩-এ? সে ভেবেছিলো ওরা ৩০৪-এর গেস্ট।

সুলতান তাকে মিথ্যে তথ্য দিয়েছে। বিভ্রান্ত করেছে! তার উচিত ছিলো তথ্যটা আরো ভালো করে যাচাই করে নেয়া। কিন্তু এখন আর সেটা ভেবে লাভ নেই। কী করবে কিছুই মাথায় আসছে না। এক অজানা আশংকা জেঁকে বসলো তার মধ্যে। এমন সময় মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলে বাস্টার্ড চমকে উঠলো। তিনটা ফোন আছে তার কাছে। কোনটা বাজছে?

মাইগড! লেডি গিয়াস?

কলটা রিসিভ করবে কিনা বুঝতে পারছে না। দ্রুত চেয়ার থেকে উঠে প্রথমেই দরজাটা বন্ধ করে দিলো। রিং বেজেই চলেছে।

তার মনের একটা অংশ বলছে ফোনটা ধরতে। অন্য একটা অংশ তীব্র বিরোধীতা করছে। বাস্টার্ড বুঝতে পারলো, যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে এতোদিন ধরে কাজ করে এসেছে তাতে বিরাট চিড় ধরে গেছে। আর এরজন্যে দায়ি ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ। লোকটা তার নাগাল পেয়ে গেছিলো। এই প্রথম তার ছবি চলে গেছে পুলিশের খাতায়। তার মুখটা এখন আর অচেনা নেই। অনেকেই চিনে ফেলেছে। আর তাদের বেশিরভাগই পুলিশের লোকজন।

রিংটা শেষ হতে না হতেই আবার বাজতে শুরু করলো।

অসহ্য!

লেডি গিয়াস হন্যে হয়ে সুলতানকে ফোনে পেতে চাইছে। কলটা রিসিভ করলো সে।

"সুলতান?"

"হুম," বললো সে।

"শোনো, তুমি কাল দুপুরের দিকে টাকাগুলো পাঠিয়ে দিও। জরুরি...বুঝলা?"

"হুম।"

"আমি আর দুদিন ঢাকায় থাকবো।"

"হুম..."

"আরে, হুম হুম করছো ক্যান! ঘুমাচ্ছো নাকি?"

বাস্টার্ড কিছু বললো না।

"হ্যালো?" তাড়া দিলো লেডি গিয়াস।

কিছু বললো না সে।

"আরে...তুমি দেখি—"

লাইনটা কেটে দিয়ে মোবাইলটা বন্ধ করে রাখলো। লেডি গিয়াস মনে মনে সুলতানের গুষ্টি উদ্ধার করুক। তার সাথে আর বেশি কথা চালিয়ে যাওয়া ঠিক হতো না।

বুঝতে পারলো, এক্ষুণি কাজে নেমে পড়তে হবে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। তবে একটা বাড়তি ঝামেলা যোগ হয়েছে। লেডি গিয়াসের সাথে এক মেয়ে আছে।

নিজের ঘর থেকে সন্তর্পনে বের হয়ে এসে ৩০৩ নাম্বার রুমের দরজায় কান পাতলো সে। ভেতরে এখন টিভি চলছে। কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে তুলে নিলো এবার। ডান হাতে সেটা রেখে বাম হাতে দরজায় টোকা মারলো পর পর দুটো।

"কে?" ভেতর থেকে বিরক্তির সাথে বললো একটা কণ্ঠ। লেডি গিয়াস।

আবারো টোকা মারলো। পর পর দুটো। এবার আরো বেশি জোরে। যথেষ্ট তাড়া দিয়ে।

"অ্যাই...কে?" মনে হলো তেড়ে আসছে কণ্ঠটা।

প্রস্তুত হয়ে গেলো বাস্টার্ড। দরজার নবটা আলতো করে ধরে রাখলো। টের পেলো নবটা একটু ঘুরে যাচ্ছে। দরজাটা ছয় ইঞ্চির মতো ফাঁক হতেই নবটা শক্ত করে ধরে জোরে একটা ধাক্কা মেরে ডান কাঁধটা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। লেডি

গিয়াস একটা চিৎকার দিয়েই চুপ মেরে গেলো। তার মুখের কাছে একটা সাইলেন্সার পিস্তল। যতো দ্রুত ভেতরে ঢুকলো ততো দ্রুতই দরজাটা বন্ধ করে দিলো সে।

ডান হাত দিয়ে কপাল ধরে রেখেছে গিয়াস। দরজার পাল্লার আঘাত লেগেছে। আঘাত তেমন গুরুতর নয়। রক্তপাত হচ্ছে না।

ঘরের এ কোণে, বিছানার পাশে আলুথালু চুলের এক মেয়ে বুকের কাছে দলা পাকানো শাড়িটা আকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পেটিকোট আর ব্লাউজ পরা। শাড়িটা সবেমাত্র খোলা হয়েছে। মেয়েটার সাথে যে জোড়াজুড়ি করা হয়েছে সেটা দেখেই বোঝা গেলো।

তবে এই মেয়েটাকে লেডি গিয়াস জোর করে তুলে আনে নি, যেমনটা করেছিলো সুলতান। এই মেয়েটা স্বেচ্ছায় এসেছে তার সাথে। বাস্টার্ড বুঝতে পারলো।

কলগার্ল।

লেডি গিয়াস নামে লেড়ি হলেও দেখতে বেশ ভীতিকর। মেয়েলীপনার ছিটেফোঁটাও নেই তার মধ্যে। পেশীবহুল আর চেহারার মধ্যে এক ধরণের হিংস্রতা আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য বাস্টার্ড ভাবলো, লেডি গিয়াস নামটার নিশ্চয় অন্য কোনো মানে আছে।

কপালে হাত রেখেই সে হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাস্টার্ডের দিকে। তার মধ্যে ভয়ের লেশমাত্র নেই। "তুমি কে আমি জানি না... কিন্তু এখান থেকে বের হতে পারবে না।"

ডান পায়ে লেডি গিয়াসের জননেন্দ্রিয় লক্ষ্য করে একটা লাথি মারলো। বাস্টার্ড, কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় লেডি গিয়াস বাম হাতটা ক্লকওয়াইজ ঘুরিয়ে লাথিটা ব্লক করতে সক্ষম হলো। একটু অবাকই হলো সে। তাকে খাটো করে দেখেছে। নামের আগে লেডি থাকাতে এই সমস্যা হয়েছে বলে মনে করলো।

"মারামারি করতে চাও তো পিস্তলটা রেখে খালি হাতে আসো," কথাটা বলেই ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমা এক করে স্টাইলিশ ভঙ্গিতে বাস্টার্ডকে আহ্বান জানালো সে। বাস্টার্ডের পৌরুষ সত্তা চ্যালেঞ্জটা নেবার জন্য প্রলুব্ধ হলেও তার যুক্তিবাদী মন তাতে সায় দিলো না।

"আমি এখানে তোমার সাথে মারামারি করতে আসি নি," নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো সে।

"তাহলে কেন এসেছো?" স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বললো গিয়াস।

পিস্তলটা নেড়ে বিছানার দিকে ইশারা করলো বাস্টার্ড, "বসো।"

বিছানার প্রান্তে বসলো গিয়াস। বাস্টার্ড দেখতে পেলো মেয়েটা তার সম্ভ্রম আগলে রাখার চেষ্টা করছে, ভয়ে নার্ভাস হয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে তার দিকে। কিছুই বুঝতে পারছে না। যেনো চুলা থেকে জ্বলন্ত কড়াইয়ে গিয়ে পড়েছে সে। মুখের সামনে থেকে খোলা চুলগুলো একটু সরতেই দেখতে পেলো মেয়েটার ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে।

"বাথরুমে গিয়ে শাড়িটা পরে নাও। উল্টাপাল্টা কিছু করবে না।"

মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে পাশের অ্যাটাচড বাথরুমে চলে গেলো।

"তাহলে তুমিই লেডি গিয়াস?"

একেবারে নির্বিকার রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ লোক গিয়াস। তার মধ্যে ভয়ের লেশমাত্র নেই। তার দিকে চেয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। "বুঝতে পারছি, সুলতান বেঈমানি করেছে.." আস্তে করে মুচকি হেসে বললো সে। "তাই তো বলি, আমার ফোন ধরে কথা বললো না, মাঝপথে লাইনটাও কেটে দিলো।"

কথাটা শুনে বাস্টার্ড চুপ মেরে গেলো। এই লোক মনে করছে সুলতান তাকে পাঠিয়েছে। দারুণ।

"যেখানে অনেক টাকা-পয়সা জড়িত সেখানে বেঈমানি হতেই পারে।"

"কিন্তু সুলতান আর তুই এই টাকা হজম করতে পারবি না," এবার তাকে তুই বলে সম্বোধন করলো গিয়াস। একই রকম নির্বিকার আছে সে।

"সুলতান হয়তো পারবে না...আমি পারবো," বাস্টার্ডও কথার পিঠে কথা চালিয়ে যেতে লাগলো। "পারবো বলেই তো এখানে এসেছি।"

"তুই কে?" তাচ্ছিল্যের সাথে জানতে চাইলো গিয়াস।

“বানচোত! ভুলে গেছিস পিস্তল আমার হাতে...তোর হাতে না।”

“টাকা চাস তো? ঠিক আছে, এই নে...” পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করে বাড়িয়ে ধরলো তার দিকে। বাস্টার্ড হাত বাড়িয়ে নিলো না। কিসের টাকা? কিসের চাবি? বোঝার চেষ্টা করলো ব্যাপারটা।

“চাবিগুলো তো দেখছি...কিন্তু সিন্দুকটা কোথায়?” হেসে বললো সে।

“নীচের পার্কিংলটে গাড়িটা আছে।”

“আমি তো গাড়ি চুরি করতে আসি নি...”

“তুই কিসের খোঁজে এসেছিস আমি জানি... টাকাগুলো গাড়ির বুটেই আছে। সব।”

সব!

“কতো?” বাস্টার্ড আরো একটু বাজিয়ে দেখার জন্য বললো।

“বাপের জনমেও তুই অতো টাকা চোখে দেখিস নি...”

“কিন্তু আমার জনমে দেখবো.. বুঝলি?” সেও পাল্টা বললো গিয়াসকে।

“দেখবি...কিন্তু ভোগ করার সুযোগ পাবি না।”

মাথা দোলালো বাস্টার্ড। “তোরা তো আমাকে চিনিস না...কিভাবে আমাকে খুঁজে বের করবি?”

“সুলতানই তোর কথা বলে দেবে...একেবারে তোতাপাখির মতো।”

মুচকি হাসলো সে। তার দিকে ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো লেডি গিয়াস, কিছু না বললেও চোখের পলক ফেললো না।

একটু চুপ থেকে দৃঢ়ভাবে বললো বাস্টার্ড। “ব্ল্যাক রঞ্জু এখন কোথায় আছে?”

“রঞ্জু!” লেডি গিয়াস যারপরনাই অবাক হলো। বাস্টার্ডকে আপাদমস্তক দেখে নিলো আরেকবার।

“আমার কথা মন দিয়ে শোন। রঞ্জু কোথায় থাকে, কিভাবে তার সাথে আমি দেখা করতে পারবো, সব তোকে বলতে হবে। ভালোয় ভালোয় বলবি নয়তো তোকে দিয়ে বলিয়ে নেবো।” পিস্তলটা গিয়াসের পায়ের দিকে তাক করে বললো শেষ কথাটা।

“রঞ্জু কোথায় থাকে সেটা সবাই জানে।”

“সবাই জানে না...সবাই শুধু আন্দাজ করে, কিন্তু তুই জানিস আসলে সে কোথায় থাকে।”

আবারো ইচ্ছে করে বহুবচন ব্যবহার করলো সে।

“রঞ্জু কোথায় থাকে জেনে কী করবি তোরা?”

“তুই কোনো প্রশ্ন করবি না...যা প্রশ্ন করার আমি করবো।”

“রঞ্জু কোথায় থাকে আমি সেটা জানি না...”

লেডি গিয়াসের কথাটা শুনে হেসে ফেললো বাস্টার্ড। “এ কথাটা আর বলবি না। বুঝলি?”

“আমি যদি কিছু না বলি, কী করবি?” লেডি গিয়াস আক্রমণাত্মক হয়ে বললো।

“তোর দুই হাটুতে গুলি করবো...মনে রাখিস, এটা দিয়ে গুলি করলে তেমন কোনো শব্দ হবে না।”

মাথা দোলালো লেডি গিয়াস। “তোর যা খুশি তাই কর...আমি কিছু বলবো না!”

বাস্টার্ড বেশ অবাক হলেও সেটা বুঝতে দিলো না। তার সামনের লোকটা যে খুনখারাবিতে ওস্তাদ সেটা বুঝতে পারলো। একে ভড়কে না দিলে কোনো কথাই মুখ দিয়ে বের করা যাবে না।

সুলতানের সাথে যা করেছিলো তা-ই করলো লেডি গিয়াসের সাথে। থুতু ফেলার মতো শব্দ হতেই লেডি গিয়াস তার বাম হাটুটা ধরে বিছানার উপর শুয়ে পড়লো।

গগনবিদারি চিৎকারটা বন্ধ করার জন্য লেডি গিয়াসের দিকে ঝুঁকে তার মুখটা বাম হাতে চেপে ধরতেই বাস্টার্ড টের পেলো তার ডান হাতটা খপ্ করে ধরে ফেলেছে প্রচণ্ড শক্তি

নিয়ে! একটুও নাড়াতে পারছে না হাতটা। আচমকা এই প্রতিরোধে ভড়কে গেলো সে। বাম হাতে একটা ঘুষি মারলো গিয়াসের মুখে। কিন্তু কাজ হলো না। শক্ত করে তার পিস্তল ধরা হাতটাই ধরেই রেখেছে গিয়াস। ধস্তাধস্তি হবার উপক্রম হলো। হাটুতে গুলিবিদ্ধ কারোর কাছ থেকে এরকম মরিয়া প্রতিরোধ সে আশা করে নি।

লেডি গিয়াস যেনো তার হাটুর আঘাতের কথা ভুলে গেছে। ডান হাতে হাটু চেপে রেখেছিলো, সেটা দিয়ে এখন বাস্টার্ডের বাম হাতটাও ধরে ফেললো। শারিরীক দিক থেকে তার চেয়ে একটু এগিয়ে আছে লেডি গিয়াস। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বাস্টার্ডের অস্ত্র ধরা হাতটা এমনভাবে ধরে রেখেছে যে মরে গেলেও এ হাত ছাড়বে না।

ডান হাটু দিয়ে লেডি গিয়াসের গুলিবিদ্ধ হাটুতে একটা আঘাত করলো। বাস্টার্ড জানে সুতীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু আহত লোকটা সেই যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করতে পারছে বেশ ভালোভাবেই। দাঁত বের করে উন্মাদের মতো হাসলো লেডি গিয়াস। সেই হাসি যেনো ভৌতিক সিনেমার পিশাচের মতো।

"কার সাথে কি করতে এসেছিস...বুঝবি এবার!"

ফ্যাসফ্যাসে গলায় নির্বিকারভাবে কথাটা বললো সে। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে ঝটকা মেরে বাস্টার্ডকে বিছানার উপর ফেলে দিলো। বাস্টার্ডও জানে হাতের অস্ত্রটা বেহাত হয়ে গেলে এই জানোয়ারটার সাথে সুবিধা করতে পারবে না। বিছানার উপরেই ধস্তাধস্তি চলতে লাগলো।

এবার লেডি গিয়াস সুযোগ বুঝে ডান হাতে বাস্টার্ডের চোয়ালে একটা ঘুষি মেরেই দু'হাত দিয়ে অস্ত্র ধরা হাতটা এমনভাবে পেচিয়ে ফেললো যে বাস্টার্ডের আর কোনো উপায় রইলো না।

অবাক হয়ে সে দেখতে পেলো লেডি গিয়াস দক্ষ কমব্যাট ফাইটারের মতো তার সশস্ত্র হাতটা কিভাবে নিরস্ত্র করে ফেলছে। একটা উন্মাদগ্রস্ত হাসি হেসে বাস্টার্ডের কব্জিটা এমনভাবে মোচড় দিলো যে সেটা ভেঙে যাবার উপক্রম হলো। বুঝতে পারলো এরকম অবস্থায় বড়জোর পাঁচ সেকেন্ড টিকতে পারবে সে। তারপরই অস্ত্রটা তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে যেতে বাধ্য।

অস্ত্রটা হাত থেকে পড়ে যাবার আগে শুধু ভাবতে পারলো লেডি গিয়াসকে খুব বেশি খাটো করে দেখেছিলো সে।

মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে!

বাথরুমে ঢুকেও শাড়িটা পরতে হিমশিম খেলো উমা। কী ঘটছে কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না।

লেডি গিয়াস নামের যে হারামিটার সাথে এখানে এসেছিলো তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ছটফট করছিলো সে। নিজেকে বিকিয়ে দেবার কঠিন সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলো গতকালই। তারপর আজ রাতে প্রথমবার নিজেকে বিকিয়ে দেবার জন্যে লেডি গিয়াস নামের এক হোমরাচোমরার সাথে এখানে আসে। কিন্তু যখনই বুঝতে পারে তার এই দেহটা অচেনা এক পুরুষ ভোগ করবে, তখনই ভয়ে আর ঘেন্নায় কুকড়ে যায় সে। কাজটা কতো কঠিন সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিলো না। লেডি গিয়াস ঘরে ঢুকেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে প্রতিরোধ শুরু করে দেয় সে। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বদমাশটা। প্রথমে বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করানোর চেষ্টা করে, তারপর রেগেমেগে চপেটাঘাত, কিলঘুষি মারতে আরম্ভ করে জানোয়ারটা।

এক পর্যায়ে সে মনে করতে শুরু করে ধর্ষিতা হতে যাচ্ছে। জানোয়ারটা তাকে বলাৎকার না করে ছাড়বে না। অনেক অনুনয় বিনয় করেছে, পা ধরে রেহাই পেতে চেয়েছে, কিছুতেই কাজ হয় নি। তাকে চড়থাপ্পর মেরে জোর করে শাড়িটা খুলে ফেলে নারীলোলুপ গিয়াস।

ভেবেছিলো জানোয়ারটার হাত থেকে বুঝি আজ তার নিস্তার নেই। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলো পশুটার হাত থেকে যেনো এ যাত্রায় তাকে বাঁচিয়ে দেন।

ঠিক তখনই দরজায় টোকা পড়ে। রেগেমেগে লেড়ি গিয়াস দরজা খুলতেই যার আর্বিভাব হলো প্রথমে তাকে দেবতা জ্ঞান করেছিলো উমা; ভেবেছিলো ভগবান তার প্রার্থনা শুনেছেন, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে সে এক জানোয়ার থেকে আরেক জানোয়ারের কবলে পড়ে গেছে। এই জানোয়ারটার হাতে আবার অস্ত্র আছে। লেডি গিয়াস তার কৌমার্য হরণ করতে ব্যগ্র ছিলো, প্রাণে মেরে ফেলতো না, কিন্তু এই অস্ত্রধারী জানোয়ারের চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে খুনখারাবির উদ্দেশেই এখানে এসেছে। বাথরুমের দরজায় খিল দিয়ে রেখেছে সে। মরে গেলেও এ দরজা খুলবে না।

কী কুলক্ষণে যে এ কাজে রাজি হয়েছিলো, এখন নিজেকেই গালি দিচ্ছে বার বার। সে তো এ লাইনের মেয়ে না। এরকম জীবন বেছে নিতে হবে দুঃস্বপ্নেও ভাবে নি কখনও। কিন্তু নিয়তি তাকে বাধ্য করেছে। কতো মেয়েকেই তো দেখেছে এ লাইনে কাজ করে বেচেবর্তে আছে। সেও বাঁচতে চেয়েছিলো। না, বাঁচাতে চেয়েছিলো…

ধস্তাধস্তির শব্দটা কানে যেতেই তার রক্ত হিম হয়ে গেলো। দুই জানোয়ার একে অন্যকে ঘায়েল করার জন্য মারামারি করছে! জান্তব গোঙানি শোনা গিয়েছিলো কিছুক্ষণ আগে, তার একটু পরই গা শিউরে ওঠা হাসি। হাসিটা কার ছিলো? উমা ধরতে পারে নি।

এখন শুধু ধস্তাধস্তির শব্দটাই শুনতে পাচ্ছে। ঘরে টিভি চলছে লো ভলিউমে। সেটার আওয়াজ ছাপিয়ে জান্তব শব্দটা রাজত্ব করছে। উমা টের পেলো তার হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। অজানা আশংকায় হৃদপিণ্ডটা লাফাচ্ছে।

পরনের শাড়িটা কয়েক বার পরার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। তার দু'হাত কাজ করছে না। ভয়াবহভাবে কাঁপছে। কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিও যেনো হারিয়ে ফেলছে আস্তে আস্তে।

ধস্তাধস্তির শব্দটাও এবার ছাপিয়ে গেলো জিনিসপত্রের ভাঙচুরের আওয়াজে। কাঁচ ভাঙার শব্দ! যেনো কেউ ভারি কিছু দিয়ে ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র ভাঙছে তীব্র আক্রোশে।

উমা খেয়াল করলো জোরে জোরে থুতু ফেলার মতো শব্দ হলো কয়েকটা!

তার হাত-পায়ের কাঁপাকাপি আরো বেড়ে গেলো। ভয়াবহ কিছুর আশংকা করছে সে। দুই জানোয়ারের অস্ফুট গোঙানিটাও কানে আসছে এখন। দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তার। বাথরুমের দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো এতোক্ষণ। পা দুটো টলে গেলে মেঝেতে বসে পড়লো। এখনও বুকের কাছে দলা পাকানো শাড়িটা দুহাতে আকড়ে আছে। সুতীব্র ভয়ে একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে গেলো সে। কতোক্ষণ সময় পার হয়েছে বলতে

পারবে না। দরজার ওপাশ থেকে যে আওয়াজগুলো আসছিলো এখন আর সেগুলো তার কানে পৌঁছাচ্ছে না। দু'কানে শুধু ভো ভো শব্দ হচ্ছে।

তার এই ঘোরলাগা অনুভূতিটা ভাঙলো বাথরুমের দরজায় জোরে জোরে আঘাতের শব্দে। দরজায় ঠেস দিয়ে বসে থাকার কারণে মনে হলো তার পিঠেই যেনো আঘাতটা করা হচ্ছে। গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেলো তার। মারামারি থেমে গেছে। দুই জানোয়ারের মধ্যে নির্ঘাত একটা মারা গেছে। তাহলে। কোনটা মরেছে? বুঝতে পারলো না। কী করবে এখন? দরজা খুলে দেবে? না। মরে গেলেও দরজা খুলবে না। তাকে যদি মারতেই হয় দরজা ভেঙে মারুক।

দরজায় এবার জোরে জোরে লাথি মারা হলো। অধৈর্য হয়ে উঠেছে জানোয়ারটা! "সুবর্ণা!...দরজা খোলো। জলদি!"

কথাটা কানে যেতেই বুঝতে পারলো লেডি গিয়াস বেঁচে আছে। সুবর্ণা নামটা তার নিজের। সদ্য এই লাইনে পা রাখা মেয়ে সে। তাকে একটা নতুন নাম দেয়া হয়েছে। মিনা আপা আয়েশ করে হুইস্কি খেতে খেতে নামটা দিয়েছে তাকে। এ লাইনে সব মেয়েরই নাকি এরকম ভুয়া নাম থাকে। আজকের জন্যে সে স্রেফ সুবর্ণা!

"দরজা খোলো...আমাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে!" লেডি গিয়াস অধৈর্য কণ্ঠে বললো আবার।

মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলো উমা। একটু আগে এই রাবনটার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রার্থনা করেছিলো, এখন কিনা তাকেই মনে হচ্ছে রাম!

সে ভেবেছিলো অস্ত্র হাতে যে লোকটা হুরমুর করে রুমে ঢুকেছিলো তার সাথে লেডি গিয়াস পেরে উঠবে না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, জানোয়ারটা শুধু নারী লোলুপই নয়, বেশ সাহসীও বটে। সশস্ত্র এক যুবককে ঘায়েল করে ফেলেছে খালি হাতে!

"সুবর্ণা!?...আমি গিয়াস...খোলো!...কোনো ভয় নেই।"

নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে কোনো রকমে মুখ দিয়ে বললো সে, "খুলছি।" গলায় আরেকটু জোর এনে বললো আবার, "শাড়িটা পরে নেই..."

"জলদি পরো...আমাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। ভয় পেও না...ঐ হারামজাদা মরে গেছে।"

এখনও তার হাত কাঁপছে তবে শাড়িটা কোনোমতে গায়ে জড়িয়ে নিতে পারলো।

দরজা খুলতেই দেখতে পেলো রক্তাক্ত গিয়াস তার সামনে কুজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার বাম পায়ে হাটুর উপরে একটা কাপড়ের পট্টি বাধা। কোনো রুমালই হবে সেটা। সেখান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। ডান ভুরুটা কেটেও রক্তপাত হচ্ছে। ঠোঁটটাও অক্ষত নেই। নাকের একটা ছিদ্র দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে, দম ফুরিয়ে হাফাচ্ছে সে।

"ভয়ের কিছু নেই...ঐ শুয়োরের বাচ্চা মরে গেছে!"

লেডি গিয়াসের ডান হাতে আগন্তুকের বড় নলওয়ালা পিস্তলটা।

এ কথা শুনে উমা আশ্বস্ত হবার কথা, ভয়-ডরও কমে আসা উচিত, কিন্তু লেডি গিয়াস একটু উপুড় হয়ে বাম হাটুর ব্যান্ডেজটা চেপে ধরতেই যে দৃশ্যটা দেখতে পেলো সেটা একবারেই ভৌতিক। বরফের মতো জমে গেলো সে।

হায় ভগবান!

বাথরুমের খোলা দরজার সামনে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে উমা। এইমাত্র তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে লেডি গিয়াস।

বাথরুমের দরজা খুলেই বিধ্বস্ত লেডি গিয়াসকে দেখতে পেয়েছিলো সে, সেইসাথে তার ঠিক পেছনেই দেখতে পেয়েছিলো ঐ জানোয়ারটাকে, সন্তপনে গিয়াসের পেছন থেকে উদয় হয় সে। অথচ লেডি গিয়াস তাকে খুন করার কথা বলছিলো তখন। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি তার হাতে খুন হওয়া মৃতব্যক্তিটি জেগে উঠেছে পেছন থেকে।

ব্যাপারটা যেনো ভৌতিক সিনেমার কোনো দৃশ্য। প্রচণ্ড ভয় থেকে সাময়িক মুক্তি পেতে না পেতেই এই দৃশ্যটা দেখে উমার হাত-পা মুহূর্তে অবশ হয়ে যায়। মুখ দিয়ে শুধু একটা শব্দই বের হয়ে আসে : হায় ভগবান!

উমার চোখেমুখে ভীতিকর অভিব্যক্তি দেখে আর তার মুখ থেকে অস্ফুটভাবে হায় ভগবান কথাটা বের হতেই লেডি গিয়াস পেছনে ফিরে দেখার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু সে সময় সে পায় নি। প্রচণ্ড জোরে তার ঘাড়ে একটা চাকু বসিয়ে দেয় বাস্টার্ড।

পেশীবহুল লেডি গিয়াস চোখেমুখে অবিশ্বাস নিয়ে ধপাস করে বসে পড়ে মেঝেতে, তারপরই ঘোৎ করে কয়েকটা শব্দ করেই খিচতে খিচতে লুটিয়ে পড়ে উমার পায়ের কাছে।

উমার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হয় নি। বোবা মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখনও।

কয়েক সেকেন্ড লেডি গিয়াস একটু নড়াচড়া করেই অসাড় হয়ে পড়ে রইলো। উমা জানে লেডি গিয়াসের প্রাণবায়ু বের হয়ে গেছে। এবার তার পালা।

জানোয়ারটা এক হাতে বুকের ডান পাশটা ধরে রেখে লেডি গিয়াসের দিকে চেয়ে আছে। নিশ্চিত হতে চাইছে লোকটা মরেছে কিনা।

উমা বুঝতে পারছে এই খুনি জানোয়ারটাও আহত, কিন্তু এটা বুঝতে পারছে না, গুলি খাওয়ার পরও কিভাবে বেঁচে আছে সে। তার বুকের ডান পাশটা রক্তাক্ত। বাম হাত দিয়ে সেই জায়গাটা ধরে রেখেছে। তবে পা দুটো এখনও টলছে। দেখে মনে হচ্ছে বদ্ধ মাতাল। তবে সে জানে, এই মাতাল একটু আগে বলশালী একজনকে নিজের হাতে খুন করেছে। তা না হলে তাকে এক ধাক্কা মেরে উমা এই ঘর থেকে দৌড়ে পালাতো।

জানোয়ারটা উপুড় হয়ে লেডি গিয়াসের হাত থেকে নিজের পিস্তলটা তুলে নিতেই উমার বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো। তাকে কিছু একটা করতে হবে। কী করবে!

বাস্টার্ড পিস্তলটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো মেয়েটা দু'পা পিছিয়ে গেলো। প্রথমে বুঝতে পারলো না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো মেয়েটার দিকে।

বাথরুমে ঢুকেই ঝট করে দরজা লাগিয়ে দিলো মেয়েটি। বাস্টার্ড কিছুই করতে পারলো না। তার অবস্থাও ভালো নয়। গুলিটা লেগেছে বুকের ডান দিকে, ঠিক ফুসফুস বরাবর। বুলেটটা এফোড় ওফোড় হয়ে বেরিয়ে যাবার কথা, কিন্তু তা হয় নি। গেঁথে আছে তার বুকে। তবে যে শক্তি নিয়ে বুকে আঘাত করেছে তাতেই কাবু হয়ে গেছে সে। মনে হয়েছিলো তোতা ক্রু ড্রাইভার দিয়ে তার বুকে আঘাত করা হয়েছে। এখনও বুকটা ব্যাথা করছে। তার ধারণা পাঁজরের একটা হাঁড় বুঝি ভেঙে গেছে।

লেডি গিয়াসের সাথে তার পেরে ওঠার কথা না। লোকটা বেশ পেশীবহুল। নিয়মিত জিমে যায়। মি: ইউনিভার্স না হলেও মি: বাংলাদেশ হবার যোগ্যতা রাখে। শুধু যে শারিরীক যোগ্যতাই আছে তা নয়, লোকটা কমব্যাট ফাইটিংয়েও বেশ দক্ষ। নিতান্তই সৌভাগ্যের কারণে সে এখন বেঁচে আছে। ধস্তাধস্তি করার সময় তার পিস্তল থেকে প্রায় সবগুলো গুলিই ফায়ার হয়ে যায় শুধুমাত্র একটা বাদে। ঘরের বিভিন্ন জায়গায় সেগুলো বিদ্ধ হয়েছে। ড্রেসিং টেবিলের কাঁচ, জানালার পর্দা, বিছানার বালিশ, আর অবশেষে লো ভলিউমে চলতে থাকা টিভি পর্দায়। আর সেই একমাত্র গুলিটাই তার বুকের এমন এক জায়গায় ঠেসে দিয়েছে লেডি গিয়াস যেখানে লেডি গিয়াসেরই রক্ত লেগেছিলো। তার সাথে ধস্তাধস্তির সময় ওটা লাগে। ঐ গুলিটা করার পরই পিস্তলটা নিয়ে তার কপালের মাঝখানে ধরেছিলো সে। বুকে গুলি বিদ্ধ হবার পরও বাস্টার্ড ভড়কে যায় নি কিন্তু পিস্তলটা কপালে ঠেকাতেই তার হাত-পা

বরফের মতো জমে গিয়েছিলো। বিকারগ্রস্তের মতো হেসে ট্রিগার টিপে দেয় লেডি গিয়াস।

সব শেষ!

চোখ দুটো বন্ধ করে শুধু এ কথাটাই ভাবতে পেরেছিলো বাস্টার্ড। কিন্তু পিস্তল থেকে থুতু ফেলার মতো কোনো শব্দ বের না হয়ে শুধু ক্লিক করে একটা আওয়াজ হয়। তারপর আরেকটা ক্লিক!

ক্লিক ক্লিক!

বাস্টার্ড বুঝে যায় পিস্তলে আর গুলি নেই। লেডি গিয়াস উদভ্রান্তের মতো ট্রিগার চেপে যাচ্ছে। চোখ বন্ধ করে অসাড় হয়ে পড়ে থাকার ভান করে সে। যেনো লেডি গিয়াস মনে করে এক গুলিই যথেষ্ট। লোকটা তাই ভেবেছে। রেগেমেগে তার পড়ে থাকা দেহে সজোরে একটা লাথি মেরে চলে যায় বাথরুমের দরজার কাছে।

দ্বিতীয় বারের মতো বুলেটপ্রুফ ভেস্টটা তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। পুরনো ঢাকা থেকে এখানে আসার আগে যে প্রস্তুতি নিয়েছিলো তারমধ্যে এই ভেস্টটাও ছিলো। খুবই মূল্যবান এই ভেস্ট। সুইডেনের বিয়র্ক অ্যামো কোম্পানির অত্যাধুনিক একটি বুলেটপ্রুফ ভেস্ট এটি। শুটার সামাদ নিতান্তই শখের বশে জিনিসটা সংগ্রহ করেছিলো এক বছর আগে। তার কাছ থেকে উপযুক্ত দাম দিয়ে কিনে নিয়েছে সে।

এই বুলেটপ্রুফ ভেস্টটা ছাড়াও আরেকটা জিনিসের কাছে সে কৃতজ্ঞ।

একটা হান্টার নাইফ।

জিনিসটা সঙ্গে নিয়ে আসার কোনো ইচ্ছেই তার ছিলো না। কিন্তু পায়ের লেদার বুটটা পরার সময় যখন দেখতে পেলো ডান পায়ের বুটের খাপে ওটা ভরা আছে তখন আর রেখে আসে নি।

লেডি গিয়াসের মতো পাণ্ডার সাথে খালি হাতে পেরে ওঠা অসম্ভব, সুতরাং লোকটা যখন বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে মেয়েটাকে ডাকতে লাগলো, সুযোগ বুঝে বাস্টার্ড আস্তে করে পায়ের বুট থেকে চাকুটা হাতে নিয়ে নেয়। সন্তপনে লেডি গিয়াসের পেছনে চলে গেলেও টের পায় নি, তবে মেয়েটা দরজা খুলেই বুঝতে পারে লেডি গিয়াসের পেছনে সে দাঁড়িয়ে আছে চাকু হাতে। ভাগ্য ভালো ভয়ার্ত মেয়েটি চিৎকার দেয় নি। ক্ষণিকের জন্যে সে বোবা হয়ে গেছিলো। সেই সুযোগে পেছন থেকে পাণ্ডাটাকে এক আঘাতেই শেষ করে দিতে পেরেছে।

দশ মিনিট পর কিছুটা ধাতস্থ হলো সে। লেডি গিয়াসের নিথর দেহের দিকে তাকিয়ে একটা আক্ষেপে মনটা ভরে উঠলো। ব্ল্যাক রঞ্জু সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্যই তার কাছ থেকে জানতে পারে নি। ওদিকে লেডি গিয়াস যে কর্লগার্লটাকে নিয়ে এসেছে সে এখন বাথরুমের দরজা লাগিয়ে বসে আছে। সমস্যা নেই।

লেডি গিয়াসের মোবাইল, মানিব্যাগসহ যাবতীয় জিনিসগুলো একসাথে জড়ো করলো সে। এগুলো তার দরকার হবে। মোবাইলটা চেক করে দেখলো। শেষ কলটা করা হয়েছে পনেরো-বিশ মিনিট আগে। তার মানে সে এ ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণ আগে। ফোনটা করা হয়েছে মিনা আপা' নামের একজনকে। ফোনবুকে খুঁজে দেখলো ব্ল্যাক রঞ্জু নামের কোনো কন্ট্যাক্ট সেভ করা আছে কিনা। এ নামে কেউ নেই। ফোনবুকে মাত্র ছয়টি কন্ট্যাক্ট। তার মধ্যে একটা সুলতানের, আরেকটা মিনা আপার। বাকি চারটা কন্ট্যাক্ট সেভ করা আছে আদ্যক্ষর দিয়ে : জি.পি। এ.ডি। এইচ.এম। পি.কে।

আজব। এতো কম! আর এগুলোর মানে কী!

পরক্ষণেই বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। লেডি গিয়াস ব্ল্যাক রঞ্জুর সাথে কোলকাতায় থাকে। খুব কমই দেশে আসে। এই সিমটা হয়তো দেশে ঢোকার পর কিনেছে। আরো কোনো সিম আছে কিনা খুঁজে দেখলো। না। মানিব্যাগে ছয় হাজার টাকা ছাড়া তেমন কিছু নেই। বিছানার উপর চাবির গোছাটা পড়ে আছে। সেটা তুলে নিলো। গাড়িতে নাকি অনেক টাকা আছে। কিন্তু কোন্ গাড়িতে?

এই হোটেলে ঢোকার সময় পার্কিংএরিয়ায় অনেকগুলো গাড়ি দেখেছে। কিন্তু লেডি গিয়াসের গাড়ি কোনটা সেটা জানবে কেমন করে? এক্ষুণি তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। আর নীচের পার্কিংয়ে গিয়ে সবগুলো গাড়ি খুঁজে দেখাও সম্ভব নয়। ওখানে সিকিউরিটি গার্ড আছে। লেডি গিয়াস বেঁচে থাকলে খুব সহজেই জানা যেতো।

খুট করে একটা শব্দ হতেই বুঝতে পারলো বাথরুমের ভেতর থেকে সেটা এসেছে।

বাথরুম! মেয়েটা তো ওখানেই আছে!

ব্যাপারটা চট করেই তার মাথায় এলো।

লেডি গিয়াস এই কর্লগার্লটাকে সাথে করেই নিয়ে এসেছে। তাহলে গাড়িটার কথা মেয়েটা জানে। সে জানে কোন গাড়িটা লেডি গিয়াসের!

উমার হাত-পা আবারো অবশ হয়ে গেছে। এক খুনির হাত থেকে বাঁচার আশায় এই বাথরুমে ঢুকে আছে প্রায় পনেরো-বিশ মিনিট হলো। অদ্ভুত ব্যাপার হলো খুনি তাকে বের হবার জন্য একবারের জন্যেও তাড়া দেয় নি। কোনো সাড়া শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। ঘরে কোনো মানুষ আছে বলেও মনে হচ্ছে না। উমার মনের একটা অংশ বলছে খুনি তাকে কিছু করবে না। তাকে মেরে তার কী লাভ। সে তো কারো কেননা ক্ষতি করে নি। আবার অন্য একটা অংশ বলছে এই খুনি তাকেও খুন করবে, কোনো প্রমাণ না রাখার জন্যে। তার ভাগ্যে কী আছে বুঝতে পারছে না। মাথাটা একদমই কাজ করছে না এখন।

সজোরে দরজা বন্ধ করার শব্দ কানে আসতেই নড়েচড়ে উঠলো সে। বাথরুমের দরজায় কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো। ভেতরে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

খুনিটা চলে গেছে?

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো উমা। কোনো শব্দ শুনতে পেলো না। গাঢ় নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। ঘরের মধ্যে যে দেয়াল ঘড়িটা আছে সেটার টিকটিক

শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কোনো মানুষের উপস্থিতি টের পচ্ছে না।

খুনি এসেছিলো লেডি গিয়াসকে মারতে, তার কাজ হয়ে গেছে। সুতরাং তার মতো একটা তুচ্ছ মেয়ের পেছনে সময় নষ্ট করার কোনো মনে হয় না। উমা এবার নিশ্চিত, খুনি ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। এতোক্ষণে সম্ভবত গাড়িটা নিয়ে হোটেল ছেড়ে চলেও গেছে সে।

জোরে জোরে বার কয়েক নিঃশ্বাস নিলো, বুকে সাহস সঞ্চয় করে দরজাটা আস্তে করে ফাঁক করলো একটুখানি।

ঘরে কেউ নেই।

লেডি গিয়াসের নিথর দেহটা পড়ে আছে বিছানার পাশে।

উমার বুকের ভেতর থেকে জমে থাকা একদলা নিঃশ্বাস বের হয়ে গেলো। দরজাটা পুরোপুরি খুলে পা রাখলো ঘরের ভেতর। খপ করে তার মুখটা চেপে ধরলো শক্ত একটা হাত। অন্য একটা হাত পেছন থেকে জাপটে ধরলো তাকে।

উমা বুঝতে পারলো পেছন থেকে তাকে সেই খুনি ধরে ফেলেছে। তাকে কৌশলে বাথরুম থেকে বের করে এনেছে লোকটা। এখন আর কিছু করার নেই। কোনো রকম প্রতিরোধ করতে পারলো না সে। হাল ছেড়ে দিলো। জানে, মৃত্যু এখন অবধারিত।

দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তার। খুব কান্না এলো, কিন্তু খুনি তার মুখটা চেপে ধরে রেখেছে বলে কোনো শব্দ করতে পারলো না।

অসুস্থ মা-বাবার চেহারা ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে।

"একদম চিৎকার করবে না," উমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো বাস্টার্ড। "আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না... যদি আমার কথামতো কাজ করো। বুঝতে পেরেছো?"

কোনো রকম মাথা নেড়ে বলতে পারলো উমা। শক্ত করে এক হাতে তার মুখ চেপে রাখা হয়েছে। অন্য হাতে তার গলায় ধরে রেখেছে ধারালো চাকুটা! এই চাকুটা দিয়েই লেডি গিয়াসকে হত্যা করা হয়েছে।

"আমি পুলিশের লোক... তোমার কোনো ভয় নেই।" মিথ্যেটা বললো এই আশায় মেয়েটা যেনো উল্টাপাল্টা কিছু করে না বসে। বাস্টার্ড জানে, চোখের সামনে খুন হতে দেখেছে, হয়তো প্রাণভয়ে মরিয়া হয়ে মেয়েটা কিছু করে বসতে পারে। পুলিশের লোক জানলে আশ্বস্ত হবে।

"আমরা সন্ত্রাসী ব্ল্যাক রঞ্জুর দলকে খুঁজছি...তুমি আমাদেরকে সাহায্য করলে আমরা তোমাকে জেলে ঢোকাবো না।" একটু থেমে বাস্টার্ড গলা থেকে চাকুটা সরিয়ে নিলো। "তুমি কোন লাইনের মেয়ে সেটা আমরা জানি...তোমাকে পুলিশ কিছু করবে না যদি আমার কথামতো কাজ করো...ঠিক আছে?"

মেয়েটা আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো। বোঝা যাচ্ছে পুলিশের লোক শুনে অনেকটাই

আশ্বস্ত হয়েছে সে।

এবার আস্তে করে মেয়েটার মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে নিলো বাস্টার্ড। মেয়েটা বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করলো।

"তোমার নাম কি?"

ফ্যালফ্যাল করে বাস্টার্ডের দিকে চেয়ে রইলো উমা। "আমার নাম?... আ-আমি... উমা।" একটু তোতলালো।

"আসল নামটা বলল।" এবার মেয়েটার মুখোমুখি সে। দায়িত্বশীল পুলিশ কর্মকর্তার মতো আচরণ করছে।

"এটাই আমার আসল নাম।"

"তাহলে সুবর্ণা কি তোমার ভুয়া নাম?"

মেয়েটা অবাক হলো। বুঝতে পারলো না এ নামটা কিভাবে জানতে পারলো পুলিশের এই লোকটি। দ্রুত এতোসব ঘটনা ঘটে গেছে যে বেমালুম ভুলে গেছে লেডি গিয়াস বাথরুমের দরজা খোলার তাগাদা দেবার সময় তার এই নামটা ধরে ডেকেছিলো।

"ওটা আমার আসল নাম না," মাথা নীচু করে বললো উমা।

"কতোদিন ধরে এই লাইনে আছো?"

চুপ মেরে রইলো সে। তারপর আস্তে করে বললো, "আজকেই প্রথম।"

বাস্টার্ড জানে কর্লগার্ল-বেশ্যারা খদ্দেরদের কাছে এরকমই কথা বলে। বেশি দিন হয় নি; এই তো কিছুদিন আগে এই লাইনে এসেছি। সেই সাথে বয়সটাও অনেক কমিয়ে বলে তারা। এতে করে খদ্দেররা মনে করে মেয়েটা অনেকটাই ফ্রেশ! নিজেদেরকে খদ্দেরদের কাছে আরো লোভনীয় করে তোলার জন্য এই কৌশল ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বাস্টার্ড তো কোনো খদ্দের নয়, তার কাছে এমন মিথ্যে বলার দরকার কী।

"আজকেই এই লাইনে এসেছো? ... ভালো।" মুচকি হেসে আবার বললো সে, "বাড়ি কোথায়?"

'মানিকগঞ্জ।"

"সেটা না...ঢাকায় কোথায় থাকো?"

"রামপুরায়।"

"লেডি গিয়াসের সাথে পরিচয় হলো কিভাবে?"

দু'চোখ মুছে ঢোক গিলে বললো উমা, "মিনা আপার মাধ্যমে।"

মিনা আপা? বাস্টার্ডের মনে পড়ে গেলো, লেডি গিয়াসের মোবাইল ফোনের ফোনবুকে এই নামটা দেখেছে। এখানে ঢুকে লেডি গিয়াস তাকে একটা ফোনও করেছে।

"এই মিনা আপাটা কে?"

মুখ তুলে তাকালো মেয়েটি। "উনার কাছে অনেকগুলো মেয়ে আছে...একটা বিউটি পার্লার চালায় মহিলা... আমি উনার পার্লারেই কাজ করতাম।"

"মিনা আপা কোথায় থাকে?"

"শান্তি নগর।"

বাস্টার্ড একটু ভেবে মাথা দোলালো। "আমরা এখন এখান থেকে চলে যাবো...তুমি কি বাসায় যাবে?" মাথা নেড়ে সায় দিলো মেয়েটি। "তাহলে তোমাকে আমি রামপুরায় নামিয়ে দেবো। ঠিক আছে?"

আবারো নিঃশব্দে সায় দিলো উমা।

ঘর থেকে বের হতেই দেখতে পেলো ৩০৪-এর দরজা ফাঁক করে মাঝবয়সী এক লোক ঔৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। চোখোচোখি হতেই লোকটা দরজা বন্ধ করে দিলো।

নিজের রুমে ফিরে এসে হ্যান্ড লাগেজটা নিয়ে মেয়েটিকেসহ লিফটের কাছে চলে গেলো বাস্টার্ড। লিফটের জন্যে যখন অপেক্ষা করছে তখন আবারো ৩০৪ নাম্বার রুমের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো দরজাটা আলতো করে খুলে মাঝবসয়ী লোকটা কৌতূহলভরা

চোখে তাকে দেখছে।

বাস্টার্ড স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলো। ৩০৪-এর নোকটার বাড়তি আগ্রহ তার কাছে ভালো লাগছে না। যাইহোক এখান থেকে জলদি সটকে পড়তে হবে। লিফটের দরজা খুলে গেলে ঢুকে পড়লো মেয়েটাকে নিয়ে।

উমা নামের মেয়েটি তার সব কথা বিশ্বাস করেছে। পুলিশের লোক মনে করে বাধ্য আচরণ করছে সে। লিফটটা সোজা গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামলো।

"লেডি গিয়াস যে গাড়িতে করে তোমাকে নিয়ে এসেছে সেই গাড়িটা কোথায় পার্ক করেছে?" জানতে চাইলো বাস্টার্ড।

"লিফটের কাছেই...লাল রঙের একটা গাড়ি," উমা সরলভাবেই জবাব দিলো।

লিফট থেকে বের হয়ে আশেপাশে তাকাতেই দেখতে পেলো কয়েক গজ দূরে ডান দিকে একটা লাল গাড়ি পার্ক করা আছে। গাড়িটার দিকে ইশারা করে মেয়েটাকে বললো সে, "এটা?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো উমা।

চাবি দিয়ে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে মেয়েটাকে ভেতরে ঢুকতে বললে। মেয়েটা গড়িতে উঠতেই বাস্টার্ড পেছনের বুটটা খুলে দেখতে পেলো বড়সড় একটা গলফব্যাগ। চেইনটা টেনে খুলতেই পাঁচশ'-হাজার টাকার বান্ডিলগুলো দেখতে পেলো। বুটটা বন্ধ করে ড্রাইভিং সিটে এসে বসলো সে।

"তুমি সিটে শুইয়ে পড়ো...তোমাকে যেনো গার্ড দেখতে না পায়, বুঝেছো?"

কথাটা শুনে উমা একটু ভয় পেয়ে গেলেও কথামতো কাজ করলো।

গেটের দারোয়ান আর গার্ডদের এখান থেকে দেখা যায় না, কিন্তু বাস্টার্ড জানে রো থেকে গাড়িটা বের করে গেটের দিকে এগোলেই তাদের দেখা যাবে; তারাও তাকে দেখতে পাবে।

তাই হলো। কিছুটা দূরে থাকতেই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ান অবাক হয়ে তার গাড়িটার দিকে চেয়ে রইলো। হাত উঁচিয়ে গাড়িটা থামানোর ইশারা করে লোকটা গাড়ির কাছে এগিয়ে এলো হনহন করে।

জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলো বাস্টার্ড।

"কই যাইতাছেন?...কতো নাম্বারের গেস্ট?"

"৩০৬-এর। এই তো, একটু আগে ফ্যামিলি নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে এসেছি...চিনতে পারেন নি?"

দারোয়ান ভুরু কুচকে তার দিকে চেয়ে রইলো। "চেকআউট করতাছেন?"

বাস্টার্ড জানে চেকআউটের কথা বললে হোটেলের রিসিপ্ট দেখতে চাইবে।

"এয়ারপোর্টে...একটা লাগেজ ফেলে এসেছি...আমার বউটা একেবারে বেখেয়ালি...এর আগেও কয়েক বার এয়ারপোর্টে লাগেজ হারিয়েছে। এখন না গেলে আর পাবো না।"

দারোয়ান তার কথায় বিশ্বাস করলো। "ইশ...একটা ঝামেলার মইদ্যে পইড়া গেছেন তাইলে।"

"আর বলবেন না, মেয়ে মানুষকে কোনো দায়িত্ব দিলে এমনই হয়...এরা রান্নাঘরেই ভালো।"

"ঠিক কইছেন," মুচকি হেসে দারোয়ান চলে গেলো গেটের কাছে।

গেট খুলে দিতেই বেরিয়ে গেলো লাল রঙের গাড়িটা।

বাস্টার্ড রিয়ারভিউ মিররে দেখতে পেলো পেছনের সিটে উঠে বসেছে উমা। তার চোখেমুখে জিজ্ঞাসু।

"আপনি না পুলিশের লোক...দারোয়ানকে তাহলে মিথ্যে বললেন কেন?"

রাস্তার উপর চোখ রেখেই বললো সে, "আমি সাদা পোশাকে আছি। ওরা যদি জানে পুলিশ ওদের হোটেলে আছে তাহলে সমস্যা হবে।"

মনে হলো আবারো মেয়েটা তার কথায় বিশ্বাস করেছে।

কিছু দূর গিয়ে একটা নির্জন জায়গায় গাড়িটা থামানোর পরিকল্পনা করছে। বাস্টার্ড। তারপর মেয়েটাকে...

মোবাইল ফোনের রিং বাজতে শুরু করলো গাড়ির ভেতর। তার কাছে এখন চার-চারটা ফোন। কোনটা বাজছে কে জানে। গভীর রাত হওয়াতে রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্য হাতে পকেট হাতড়ে রিং হওয়া ফোনটা বের করে ডিসপ্লে'র দিকে তাকালো।

মিনা আপা!

রিয়ারভিউ মিররে চোখ রাখতেই মেয়েটার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেলো তার। "কোনো কথা বোলো না...ফোনটা রিসিভ করছি।"

গাড়িটা রাস্তার বাম দিকে নিয়ে গিয়ে হ্যান্ড ব্রেক ব্যবহার করে থামিয়ে ফেললো।

"ছেরিটা কি এখনও গাইগুই করতাছে?" কর্কশ কণ্ঠে এক মহিলা বললো- মিনা আপা।

"না।" ছোট্ট ক'র বললো বাস্টার্ড। মহিলা সম্ভবত প্রচুর ড্রিঙ্ক করেছে। কথাবার্তায় সেটার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

"ভালা।" একটু থেমে আসল প্রসঙ্গে চলে এলো মিনা আপা। "শোনো গিয়াস... রঞ্জু আমারে ফোন দিছিলো একটু আগে... তুমি ঢাকায় আইসা মাইয়া মানুষ নিয়া মওজ করতাছো কিনা জিগাইছে আমারে... কয়, গিয়াস তো আবার মাইয়া মানুষ ছাড়া থাকবার পারে না... আমি কইছি, না, তুমি কাজকামে ব্যস্ত আছো... বুঝলা?"

"হুম।"

"তুমি যে আমার কাছ থেইকা ঐ মাইয়াটারে নিয়া গেছো এইটা যেন রঞ্জু জানবার না পারে... বুঝছো তো?"

"হুম।"

"ছেরিটারে কিন্তু সকাল সকাল ছাইড়া দিও... এই লাইনে আইজকাই প্রথম নামছে... একটু ভালা ব্যবহার কইরো।"

"হুম।"

"আরে, খালি দেখি হু হু মারাইতাছো... মাল টানছো নি?"

এক মাতাল আরেকজনের মাতলামির খবর জানতে চাচ্ছে।

"হুম...একটু।"

"ঠিক আছে, রাখি... ঐ ছেরিটারে আবার এইসব জিনিস খাওয়াইতে যাইও না ... বমিটমি কইরা দিবো।"

"আচ্ছা।"

ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ চুপ মেরে রইলো বাস্টার্ড। লেডি গিয়াসের কাছ থেকে যে কোনো তথ্য বের করার সুযোগ পায় নি তা নিয়ে এতোক্ষণ ধরে একটা আক্ষেপ ছিলো তার মধ্যে। রঞ্জুর সবচাইতে কাছের লোককে পেয়েও কিছু জানতে না পারাটা মোটেই ঠিক হয় নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ব্ল্যাক রঞ্জুর আরো কাছের একজনের হদিশ পেয়ে গেছে সে।

মিনা আপা!

মহিলা সাধারণ কোনো বেশ্যার দালাল নয়। খুব সম্ভব, রঞ্জুর সাথে এই মিনা আপার ঘনিষ্ঠ কোনো যোগাযোগ আছে।

পেছনে ফিরে উমার দিকে তাকালো সে। "মিনা আপার বাসাটা তো তুমি চেনো, তাই না?"

"হুম।"

হাত ঘড়িটা দেখলো। রাত দশটা। লেডি গিয়াসের খুন হবার খবরটা জানাজানি হবার আগেই মিনা আপার ওখানে যাওয়া দরকার।

আধ ঘণ্টা পর লাল রঙের গাড়িটা শান্তি নগরের একটি বহুতল ভবনের সামনে এসে থামলো। এই ভবনের চার তলায় থাকে মিনা আপা।

পিস্তলে গুলি ভরে নিলো বাস্টার্ড তারপর লেডি গিয়াসের মোবাইল ফোনটা উমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। মিনা আপার নাম্বারটা ডায়ালে দিয়ে রেখেছে। কি বলতে হবে পথে আসতে আসতেই শিখিয়ে দিয়েছে বাস্টার্ড। ফোনটা কানের কাছে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো উমা।

অনেকবার রিং হবার পর কলটা রিসিভ করা হলো।

"আবার কী হইছে?" মিনা আপা ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বললো।

"আপা...আমি উমা।"

"তুমি?... হইছে কি?" মহিলা খুব অবাক হয়েছে।

"একটা সমস্যা হয়েছে, আপা। আমি এখন আপনার বিল্ডিংয়ের নীচে আছি। একটু উপরে আসতে হবে।"

"নীচে আছো? কি হইছে?... বুঝলাম না।"

"আপা, গিয়াস ভাই আমাকে আপনার বাড়ির নীচে নামিয়ে দিতে এসেছে। উনার নাকি জরুরি একটা ফোন এসেছে..."।

"কয় কি? ..কাম শেষ?" একটু চুপ থেকে আবার বললো, "নাকি প্রথম দিনেই একটা ভেজাল কইরা ফালাইছো?... খাড়াও, আমি দারোয়ানরে কইতাছি।"

লাইনটা কেটে গেলো। বাস্টার্ড জানে মিনা আপা এখন চার তলার উপর থেকে হয়তো নীচে পার্কিং করা গাড়িটা দেখবে, তাই গাড়ি থেকে বের হলো না। এই গাড়িটা মহিলা চেনে। এটাই যথেষ্ট।

পাঁচ মিনিট পর রোগাপটকা এক দারোয়ান অ্যাপার্টমেন্টের মেইন গেটটা খুলে দিলো। বাস্টার্ড উমাকে আগে নেমে দেখতে বললো মিনা আপা বেলকনি থেকে তাদের দিকে চেয়ে আছে কিনা।

উমা গাড়ি থেকে বের হয়ে উপরে তাকিয়ে দেখলো মিনা আপাকে দেখা যাচ্ছে না। বাস্টার্ডকে সে জানালো কথাটা। আস্তে করে গাড়ি থেকে নেমে উমাকে নিয়ে সে ঢুকে পড়লো ভবনের ভেতর। গাড়িটা বাইরেই রেখে গেলো।

চার-পাঁচ মিনিট পর মিনা আপার ফ্ল্যাটে কলিংবেলটা বেজে উঠলে মহিলা বিরক্তি নিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই বাস্টার্ড ঢুকে পড়লো ভেতরে। মহিলা কিছু বলার আগেই তার দিকে পিস্তল তাক করে ধরলো সে।

"কোনো কথা বলবেন না!"

উমাকে ভেতরে আসতে বলে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

"ভেতরে আর কে কে আছে?"

মিনা আপা কিছুই বুঝতে পারছে না। অবাক হয়ে চেয়ে রইলো শুধু। 'অ্যাই," উমার উদ্দেশে বললো। "এই লোকটা কে?"

"খালা, পুলিশের লোক," উমা কাচুমাচু হয়ে বললো।

"কি??"

"একদম চুপ। কোনো রকম হাউকাউ করবেন না।" বাস্টার্ড মহিলাকে তাড়া দিলো ভেতরের ঘরে যাবার জন্য।

তারা সবাই বসলো ড্রইংরুমের সোফায়।

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না...আপনি কি পুলিশের লোক?" মিনা আপা নামের মহিলা আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললো।

"তারচেয়েও বড় কিছু, মুচকি হেসে বললো বাস্টার্ড।

"এসবি? এনএসআই?...ডিজিএফআই?"

"বাহ, আপনি তো দেখছি সব এজেন্সির নামই জানেন। ভালো।"

“অ্যাই উমা, ঘটনা কী, কিছুই তো বুঝতাছি না?” মহিলা উমাকে বললো।

“আপা, হোটেল থেকে পুলিশ গিয়াস ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে...তারপর আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে,” বাস্টার্ডের শেখানো মিথ্যে কথাগুলো বেশ গুছিয়ে বলে গেলো উমা।

লেডি গিয়াস পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে শুনে মহিলা ভড়কে গেলো। “আমার কাছে কি চান, আপনারা?”

“আপনি যে ব্ল্যাক রঞ্জুর অনেক ঘনিষ্ঠ একজন সেটা আমরা জানি,” একটু থেমে মহিলার প্রতিক্রিয়া দেখে নিলো সে। “আপনাদের পুরো নেটওয়ার্কটাই আমরা ধরে ফেলেছি। পুরনো ঢাকা থেকে সুলতান...উত্তরার পিং সিটি থেকে লেডি গিয়াস...আর এখানে আপনাকে... এখন শুধু বাকি আছে রঞ্জু।”

মাথায় হাত দিয়ে মিনা আপা মেঝের দিকে চেয়ে রইলো। “হায় আল্লাহ!”

“আপনি যদি পুলিশকে সব তথ্য না দেন তাহলে পুলিশ আপনাকে এনকাউন্টারে দিয়ে দেবে,” খুবই সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললো বাস্টার্ড।

মুখ তুলে তাকালো মহিলা। চোখেমুখে তার ভয়।

“রঞ্জু এখন কোথায় আছে?” পিস্তলটা মহিলার দিকে তাক করে বললো সে। “আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। কোনো রকম চালাকি করবেন না।”

“কোলকাতায়,” ছোট্ট করে বললো মিনা আপা।

“কোলকাতার কোথায়?”

মহিলা নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। কিন্তু যখন দেখলো বাস্টার্ড তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তখন বললো, “সল্টলেকে।”

“বাড়ির নাম্বারটা বলেন,” তাড়া দিলো সে।

আবারো মাথায় দু’হাত রেখে চূড়ান্ত পরাজয়ের ভঙ্গি করলো মহিলা।

“নাম্বারটা বলেন?” ধমকের সুরে বললো সে।

“এফ ব্লক, চার নাম্বার রোড, বারো নাম্বার বাড়ি।”

“রঞ্জুর সাথে আর কে কে আছে ওখানে?”

“গিয়াস থাকে... সে তো এখন ঢাকায়... ইসহাক, শাহজাহান আর দিপুও থাকে।”

তথ্যগুলো কতোটুকু সত্য সেটা যাচাই করা যায় কিভাবে ভাবতে লাগলো বাস্টার্ড। একটু ভেবে বললো, “আপনার কথা সত্যি কিনা বুঝবো কিভাবে?”

মহিলা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো তার দিকে। “আপনি তো ভুল তথ্যও দিতে পারেন...তাই না?”

একটু ভেবে মহিলা বললো, “আমার কাছে ঠিকানাটা লেখা আছে...চাইলে আপনে দেখতে পারেন।”

ভালো প্রস্তাব, মনে মনে বললো বাস্টার্ড। কিছুক্ষণ আগেও এই মহিলা জানতো না অস্ত্রের মুখে তাকে বাধ্য করবে ব্ল্যাক রঞ্জুর ঠিকানা জানার জন্য। সুতরাং রঞ্জুর ঠিকানা হিসেবে যা বললো সেটা যদি আগে থেকে কোথাও লেখা থাকে তাহলে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্যই হবে।

“কোথায় লেখা আছে?”

“আমার কাছে একটা ডায়রি আছে...ওইটাতে লেখা আছে।” কথাটা বলেই মহিলা ড্রইংরুমের এক কোণে একটা ওয়ার্ডরোবের দিকে ইঙ্গিত করলো।

“ডায়রিটা নিয়ে আসুন,” আদেশ করলো সে।

“আমি যা বলছি সত্য বলছি, বিশ্বাস করেন...”

বাস্টার্ড পিস্তলটা নেড়ে মহিলাকে ডায়রি নিয়ে আসতে বললো।

ভীতসন্ত্রস্ত পায়ে উঠে গিয়ে ড্রয়ার খুলে ডায়রিটা খুঁজতে লাগলো মিনা আপা। “এইখানেই তো ছিলো...গেলো কই!” বিড়বিড় করে বলতে লাগলো মহিলা।

বাস্টার্ড তার পাশে বসা উমার দিকে তাকালো। মেয়েটা চুপচাপ বসে আছে সোফায়। এই

মেয়েটাকে নিয়ে ঝামেলায় পড়ে গেছে সে। বুঝতে পারছে নিরীহ একটা মেয়ে কিন্তু তার নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবলে এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে...।

হঠাৎ চোখের কোণে কিছু একটা দেখতে পেয়ে বাস্টার্ড ফিরে তাকাতেই গুলির শব্দে কান ফেটে যাবার জোগাড় হলো।

মিনা আপা ড্রয়ার থেকে একটা পিস্তল বের করেই গুলি করেছে। বাস্টার্ড সোফার উপর হুমরি খেয়ে পড়লো। মহিলা আরেকটা গুলি করার আগেই ক্ষিপ্রগতিতে গুলি চালালো সে। তার গুলির কোনো শব্দ হলো না। শুধু ফুট' করে ভোতা একটি শব্দ। মিনা আপা দু'পা পিছিয়ে গেলেও বুঝতে পারলো না। দ্বিতীয় গুলিটা ঠিকই চালিয়ে বসলো, তবে সেটা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে বিঁধলো সোফার নরম গদিতে।

বাস্টার্ড কিছুই বুঝতে পারলো না প্রথমে। স্বতঃস্ফুর্ত প্রতিক্রিয়ায় আরেকটা গুলি চালালো মহিলাকে লক্ষ্য করে।

টলতে টলতে মিনা আপা পড়ে গেলো মেঝেতে। বাস্টার্ডের দুটো গুলিই লেগেছে তার দেহে। প্রথমটা তলপেটে লাগলেও টের পায় নি, তবে দ্বিতীয়টার আঘাত বুঝতে পেরেছে মহিলা, সেই গুলিটা লেগেছে তার বুকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মহিলার রক্তে মেঝেটা ভিজে গেলো।

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো তার শরীরেও একটা গুলি লেগেছে।

বুলেট প্রুফ ভেস্ট ভেদ করে ফেলেছে!

অসম্ভব!

বাম কাঁধে চিনচিন করে ব্যাথা করছে। পাশ ফিরে দেখলো উমা আতঙ্ক ভরা চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। তার গলার দিকে।

ডান হাতে কাঁধটা ধরেই বুঝতে পারলো রক্তে ভিজে গেছে শার্ট। বুলেটপ্রুফ ভেস্ট ভেদ করে কিভাবে গুলি লাগলো বুঝতে পারছে না। একটু পরই বুঝতে পারলো। তার ভেস্টটা স্লিভলেস, গলা ভি আকৃতির। গলার কাছে ঐটুকু ফাঁক দিয়েই গুলিটা ঢুকে পড়েছে তার কাঁধে।

ভাগ্য ভালো গুলিটা তার গলায় কিংবা মাথায় লাগে নি। অন্য দিকে কপাল খারাপ, কারণ গুলিটা ঐটুকু ফাঁক গলেই ঢুকে পড়েছে!

বরফের মতো জমে আছে উমা। চোখের সামনে গোলাগুলি আর বীভৎস হত্যাকাণ্ড!

বাস্টার্ড বুঝতে পারছে না আঘাত কতোটা মারাত্মক। ডান হাতে ক্ষতস্থানটা চেপে রাখলো। রক্তপাত হচ্ছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে চেপে ধরলো সেখানটা। কিছুক্ষণের জন্য মাথাটা কাজ করলো না।

এদিকে গোলাগুলির শব্দে আশেপাশের ফ্ল্যাট থেকে লোকজন বেরিয়ে আসছে। তাদের শব্দ শুনতে পেলো। পাশের ঘর থেকে চাপা ফিসফিসানিও শোনা যাচ্ছে। উমা বলেছে এখানে ছয়-সাতজন মেয়ে থাকে। ঐ মেয়েগুলোই আছে ওখানে। এতোক্ষণে নিশ্চয় অ্যাপার্টমেন্টের বাইরেও লোকজন জড়ো হয়ে গেছে। এক্ষুণি তাকে এখান থেকে বের হতে হবে।

ওয়ার্ডরোবের কাছে ছুটে গেলো সে। একটা সূতির শাড়ি বের করে সেটা ছিঁড়ে ফেললো। সে একা একা ব্যান্ডেজ করতে পারবে না। ডান হাতে পিস্তলটা উঁচিয়ে মেয়েটাকে কাছে ডাকলো।

"শক্ত করে বেঁধে দাও!" শার্টের বোতাম খুলে ক্ষতস্থানটা দেখিয়ে বললো বাস্টার্ড।

মেয়েটা কাঁপা কাঁপা হাতে ব্যান্ডেজ করে দিলো। খুব একটা ভালো হলো না, তবে আপাতত কাজ হবে। নিজের শার্টটা খুলে দলা পাকিয়ে ফেললো। ওয়ার্ডরোব থেকে খুঁজে দেখলো কোনো শার্ট আছে কিনা। আছে। বেশ কয়েকটাই আছে। বেছে নেয়ার সময় নেই। একটা শার্ট পরে নিলো দ্রুত। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা যাবে না।

রক্তাক্ত শার্টটা দলা পাকিয়ে মেয়েটার ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে দিলো, তারপর দ্রুত ফ্ল্যাট

থেকে বেরিয়ে গেলো তারা। আশেপাশের ফ্ল্যাট থেকে দুয়েক জন বের হয়ে এলেও বাস্টার্ডের হতে পিস্তল দেখে নিজেদের ঘরে আবার ঢুকে পড়লো তড়িঘড়ি করে।

গেটের দারোয়ানও গুলির শব্দ শুনেছে, গেটটা আগলে রেখে দাঁড়িয়ে আছে সে। বাস্টার্ডকে পিস্তল হাতে আসতে দেখে বুঝতে পারলো না কী করবে। লোকটার দিকে তাকিয়ে পিস্তল নেড়ে ইশারা করলো সরে যাবার জন্যে। মূল গেটটা বন্ধ থাকলেও ছোটো গেটটা খোলাই ছিলো, সেটা দিয়ে বের হয়ে দ্রুত লাল রঙের গাড়িতে উঠে বসলো তারা। রাস্তায় কিছু লোক জমে গেছে। তারা ফ্ল্যাটের দিকে চেয়ে আছে। দু'জন নারী-পুরুষকে বের হতে দেখে উৎসুক চোখে চেয়ে রইলো কেবল।

গাড়িটা যখন চলতে শুরু করলো তখনই নীরবতা ভাঙলো উমা। "আপনার ডাক্তার দেখানো দরকার, তার কণ্ঠস্বর ভয়ার্ত।

রাস্তার দিকে চোখ রেখেই সে বললো, "চিন্তার কিছু নেই...মনে হয় না সিরিয়াস।"

কিন্তু সে টের পাচ্ছে বাম হাতটা অবশ হয়ে আসছে। রক্তপাত বন্ধ হয় নি। শার্টের ভেতর চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে এখনও। কিছু একটা করা দরকার।

গাড়িটা এখন শাহবাগের দিকে যাচ্ছে। ওখানে অনেক ওষুধের দোকান আছে! কিন্তু এতো রাতে কি খোলা থাকবে?

থাকবে। পিজি হাসপাতালের কারণে ওষুধের দোকানগুলোর মধ্যে কয়েকটি দোকান সারারাত খোলা থাকে। ওখানকার ওষুধের দোকানগুলো নিজেরাই পালাক্রমে রাতের সময় খোলা রাখে ইমার্জেন্সি রোগী দের জন্য।

খুব বেশি ভাবলো না। ভাবার মতো সময় তার হাতে নেই। দ্রুত গাড়িটা নিয়ে ছুটে গেলো শাহবাগের মোড়ে।

ওষুধের দোকানগুলো রাস্তার ওপর পারে। অনেকটা পথ এগিয়ে ইউ-টার্ন করে আসতে হবে। দরকার নেই। দোকানগুলোর ঠিক বিপরীতে, রাস্তার এপারেই গাড়িটা থামালো সে। উমাকে কিছু টাকা দিয়ে বললো কটন আর ব্যান্ডেজ কিনে নিয়ে আসার জন্য।

"কোনো রকম চালাকি করবে না!" মেয়েটাকে সাবধান করে দিলো। "ভেবো না আমি আহত হয়ে গেছি বলে কিছু করতে পারবো না। উল্টাপাল্টা কিছু করলেই গুলি করে মেরে ফেলবো। বুঝেছো?" ধমকের সুরে বললো শেষ কথাটা।

দ্রুত মাথা নেড়ে সায় দিলো উমা। গাড়ি থেকে নেমে ভীরু ভীরু পায়ে রাস্তাটা পার হয়ে ওষুধের দোকানগুলোর দিকে এগোলো মেয়েটা। গাড়ি থেকে বাস্টার্ড তাকে চোখে চোখে রাখছে। একটা দোকানে ঢুকলো উমা। সে টের পেলো তার কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে। এখনও যথেষ্ট শীত আছে ঘাম হবার কথা নয়, গড়িটাতেও এসি আছে, তাহলে?

একটু পরই নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে গেলো তার। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। অস্থির হয়ে উঠলো সে। মেয়েটা আসছে না কেন?

নিঃশ্বাস আরো দ্রুত হয়ে গেছে। মেয়েটা সুযোগ বুঝে কেটে পড়েছে? কিন্তু তাকে তো দোকান থেকে বের হতে দেখে নি। পরক্ষণেই একটা ভাবনা আসতে নড়েচড়ে উঠলো।

মেয়েটা ওষুধের দোকানে ঢুকে ফোন করছে না তো!

কতোক্ষণ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে বুঝতে পারছে না। আন্দাজ করলো পাঁচ মিনিটের বেশিই হবে। এতোক্ষণ তো লাগার কথা নয়। কাঁধের যে অবস্থা তাতে করে গাড়ি থেকে নেমে দোকানে ঢু মারবে সে উপায়ও নেই। মেয়েটা হয়তো বুঝতে পেরেছে এটা। এই সুযোগে কেটে পড়তে চাইছে। কিন্তু দোকান থেকে মেয়েটাকে বের হতে দেখে নি। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো সে।

বাম হাতটা ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে যাচ্ছে, টের পেলো বাস্টার্ড। দৃষ্টিও মাঝেমাঝে ঝাপসা হয়ে আসছে ক্রমশ। মেয়েটা তার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়েছে।

রাস্তাটা পার হতে বেগ পেলো সে। পা দুটোও এখন টলতে শুরু করেছে। অনেক বড় ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে। মেয়েটা যদি লোকজনকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে!

যে দোকানে মেয়েটা ঢুকেছে সেটা অনেক বড়, তবে সামনে থেকে নয়। লম্বায়। দোকানের সামনে যে প্যাসেজওয়েটা চলে গেছে সেটার বড়বড় পিলারগুলোর কারণে দোকানের ভেতরটা রাস্তার ওপার থেকে দেখা যায় নি। এখন দোকানের সামনে আসতেই দেখতে পেলো মেয়েটা ভেতরের শেষপ্রান্তে কাউন্টারের সামনে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে। তার একটা হাত কানের কাছে!

দৃশ্যটা দেখেই রাগে তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো। যা ভেবেছিলো তাই। মেয়েটা ফোন করছে!

লন্ডন থেকে দুদিন আগে এসেছে, এখনও অফিশিয়ালি জয়েন করে নি কিন্তু ক্রাইমসিনে চলে আসতে হয়েছে জেফরি বেগকে।

উত্তরার হোটেল পিং সিটিতে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে কিছুক্ষণ আগে। ঠিক করে বলতে গেলে রাত দশটার দিকে। খুনি হোটেল থেকে কৌশলে বেরিয়ে যেতেই পাশের রুমের গেস্টের সন্দেহ হয়। লোকটা সেনাবাহিনীর সাবেক এক কর্মকর্তা, ইঞ্জিনিয়ার কোরের লেফটেন্যান্ট কর্নেল ছিলো। অকালে অবসর নিয়ে বিদেশে চলে যায়। আজই দেশে এসেছে সপরিবারে, ঢাকায় একদিন থেকে চলে যাবে গ্রামের বাড়িতে।

এই সাবেক মিলিটারি অফিসারই প্রথম টের পায় পাশের রুমে ভয়ানক কিছু হচ্ছে। খুনিকে দেখেছে সে। এক মেয়ে নিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে ৩০৬ নাম্বারে চলে যায়, তারপর সোজা লিফটের কাছে। কর্নেল সাহেব আর দেরি করে নি, সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারকে জানিয়ে দেয় ৩০৩-এ কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু ম্যানেজার নীচের পার্কিং এরিয়ায় খবরটা দেয়ার আগেই খুনি সটকে পড়ে।

কর্নেল সাহেব পুলিশকে জানিয়েছে ম্যানেজার লোকটা নাকি পুলিশ ডাকতে চায় নি। খুনের ঘটনা গোপন করতে চেয়েছিলো। তার নিজের হোটেলের একজন গেস্ট খুন হলো অথচ লোকটা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছিলো।

খুবই সন্দেহজনক।

কর্নেলের চাপাচাপিতেই বাধ্য হয়ে পুলিশ ডেকেছে ম্যানেজার। পুলিশ কর্নেল সাহেবের কথায় বিশ্বাস করে হোটেল ম্যানেজারকে তাৎক্ষণিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিশ্চিত হয়েছে লোকটার আচরণ আসলেই সন্দেহজনক। হোটেলের রেজিস্ট্রি'তে ৩০৩ নাম্বার রুমে কোনো গেস্ট আছে বলে উল্লেখ নেই। আজব। নিহতের সম্পর্কে কোনো কিছুই পুলিশ জানতে পারে নি সেজন্যে। এই একটা অপরাধেই ম্যানেজারকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়। নিজেকে বাঁচানোর জন্য ম্যানেজার যা বলেছে তার সবই গেছে তার বিরুদ্ধে।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে উঠেছে, নামটাম লেখার সময় পায় নি! একটু পরেই সব ফর্মালিটিজ সেরে ফেলতো।

আচ্ছা! পুলিশকে এতো বোকা ভাবে লোকটা!

নিহতের সাথে এক মেয়ে ছিলো, সে কে?

না। কোনো মেয়ে ছিলো না।

বেচারা পুলিশের সামনে একেবারে নাকাল হয়ে যায় যখন তার কর্মচারিরা জানায় নিহতের সাথে সত্যি এক মেয়ে ছিলো।

এতো উল্টাপাল্টা কথা বলার পর তাকে সন্দেহের বাইরে রাখার কি কোনো উপায় থাকে? উত্তরার থানার পুলিশ লোকটাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।

সব কিছু বিবেচনা করে পুলিশ মনে করেছে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টকে ডেকে পাঠানো দরকার। তারা সন্দেহ করছে এটার পেছনে আন্তর্জাতিক স্মাগলিং চক্রের হাত থাকতে পারে; এয়ারপোর্টের কাছে একটি হোটেলে খুন, ক্রাইম সিনেও অনেক আলামত আছে, সুতরাং তারা আর দেরি করে নি।

এখানে এসেছে দশ-পনেরো মিনিটের বেশি হবে না, এখন রুম নাম্বার ৩০৩-এ দাঁড়িয়ে আছে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ। তার সামনেই, বিছানার পাশে বাথরুমের দরজার কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের এক যুবক।

লোকটার বাম পায়ে একটা গুলি করা হয়েছে, আর পেছন থেকে ধারালো কিছু দিয়ে বীভৎসভাবে স্টেইব করার আলামত স্পষ্ট চোখে পড়ছে। সম্ভবত মৃত্যু হয়েছে সেই আঘাতেই। তবে অবাক করার ব্যাপার হলো, হোটেলের সবাই বলছে তারা কোনো গুলির শব্দ শোনে নি। ম্যানেজার কিংবা কর্মচারিরা না হয় মিথ্যে বলতে পারে কিন্তু আশেপাশের রুমগুলোর গেস্টরাও এ কথা বলেছে পুলিশকে, বিশেষ করে অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল সাহেব, যে কিনা পুরো ঘটনা ভালোভাবে ফলো করেছে। লোকটা সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ছিলো,

গোলাগুলির ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা আছে। জোর দিয়ে বলেছে কোনো রকম গুলির শব্দ হয় নি, শুধু ধস্তাধস্তি আর ভাঙচুরের শব্দ ছাড়া। জেফরি এখানে আসার আগে উত্তরা থানার পুলিশ এই তথ্যগুলো জানতে পেরেছে।

জেফরির কাছে একটু খটকা লাগলো।

খুনির কাছে অত্যাধুনিক পিস্তল ছিলো, সেটা নিশ্চিত- সম্ভবত সাইলেন্সর লাগানো- তাহলে চাকু দিয়ে বীভৎসভাবে হত্যা করার দরকার পড়লো কেন? ঘরের ভেতর কমপক্ষে সাতটি গুলির স্পট পাওয়া গেছে এখন পর্যন্ত। বোঝাই যাচ্ছে নিহত ব্যক্তির সাথে খুনির ধস্তাধস্তি হয়েছে। নিহতের পায়ে একটিসহ মোট আটটি গুলি হলো অথচ কেউ তার আওয়াজ শুনতে পেলো না?

পিস্তলের গুলি ফুরিয়ে গেছিলো? হতে পারে।

মোট ৮টি গুলির সবগুলোর খোসাই ঘরের ভেতর পাওয়া গেছে। এভিডেন্স হিসেবে জব্দ করা হয়েছে সেগুলো। জেফরির জন্যে একটা সুযোগ এসে গেছে বলা যায়। এই গুলির খোসা থেকেই সে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে সম্ভাব্য ঘাতককে।

ব্যাপারটা কদিন আগেও অসম্ভব মনে হতো, তবে এখন শুধু সম্ভবই নয়, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মতো বিশ্বনন্দিত সংস্থাও স্বীকৃতি দিয়েছে। দ্রুত এই পদ্ধতিটা সারা বিশ্বের পুলিশ এবং তদন্তকারী সংস্থার মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, সেই সাথে তার নাম!

হ্যাঁ। তার নাম-জেফরি। অবশ্য কাজটার কৃতিত্ব তার একার নয়। আরেকজন অংশীদার আছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর সুলিভান অ্যাবারডিন বেক।

গত বছর নেট-চ্যাটিংয়ে জেফরি বেগ একটা ধারণা শেয়ার করেছিলো স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এই ইন্সপেক্টরের সাথে। ব্যাপারটা একেবারেই টেকনিক্যাল। বিভিন্ন ধরণের খুন খারাবির ঘটনায় পুলিশ গুলির খোসা উদ্ধার করে থাকে। এইসব গুলির খোসা আদালতে প্রমাণ হিসেবে জব্দ করা হয়ে আসছে দীর্ঘকাল থেকে। কিন্তু এ থেকে যে অসাধারণ একটি জিনিস পাওয়া যেতে পারে সেটা জেফরির আগে কেউ বুঝতে পারে নি।

গুলির খোসাগুলো থেকে আরো বাড়তি কিছু তথ্য বের করার একটি পদ্ধতি বের করেছে হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ।

জনপ্রিয় লেখক জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে গিয়ে সে বাস্টার্ড নামের এক ভয়ঙ্কর আর স্মার্ট খুনির খোঁজ পায়। নিখুঁতভাবে, কোনো প্রমাণ না রেখে কাজ করে সেই খুনি। জেফরি তার কর্মজীবনে এরকম ঠাণ্ডা মাথার খুনি এর আগে আর দেখে নি। তো জায়েদ রেহমানের কেসটা তার নিজের জন্যে একটা ব্যর্থতা ছিলো, কারণ শেষ পর্যন্ত সে প্রমাণ করতে পারে নি খুনটা বাস্টার্ড করেছে, আর এই খুনের জন্যে খুনিকে নিযুক্ত করেছিলো বিশিষ্ট শিল্পপতি সি ই এ সিদ্দিকী।

জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে গিয়ে তার সফলতা বলতে সে উদঘাটন করতে পেরেছিলো খুনটা কে করিয়েছে, কাকে দিয়ে করিয়েছে এবং কেন করিয়েছে। আর ব্যর্থতা বলতে দোষী কাউকেই সে সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধী হিসেবে প্রমাণ করতে পারে নি। বাস্টার্ড নামের খুনি তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেলে ব্যাপারটা তার ব্যক্তিগত অনুশোচনায় পরিণত হয়। তবে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয় সে।

কিছু দিন পর হুট করেই একটা বিষয় তার মাথায় আসে : তার নিজের ঘরে খুনির সাথে যখন তার ধস্তাধস্তি হয় তখন খুনির পিস্তল থেকে একটা গুলি বের হয়েছিলো। সেই গুলির খোসা এভিডেন্স হিসেবে সংরক্ষিত আছে তার ডিপার্টমেন্টে। সেই গুলির খোসা, মানে বুলেটের খোসাটায় কি খুনির আঙুলের ছাপ আছে না? আছে তো!

সাধারণত অস্ত্রধারী ব্যক্তি নিজের হাতেই পিস্তল-রিভলবারে গুলি ভরে থাকে-শতকরা হিসেবে প্রায় নিরানব্বই শতাংশ। গুলি হবার পর গুলির খোসা অস্ত্র থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে। সেই বুলেটের খোসায় অস্ত্রধারী লোকের আঙুলের ছাপ থেকে যায়।

যেহেতু গুলি ভরার ক্ষেত্রে তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের ব্যবহার হয়ে থাকে সে কারণে

গুলির খোসার গায়ে আঙুলের ছাপ থাকবেই।

ব্যস, কাজে নেমে পড়ে জেফরি বেগ। ফিঙ্গারপ্রিন্ট টিমের সাহায্যে এরকম একটি গুলির খোসা থেকে আঙুলের ছাপ বের করার চেষ্টা করতে থাকে সে। কিন্তু কাজটা খুব সহজ নয়, তারপরও চেষ্টা করতে থাকে। এমন সময় ইন্টারনেটে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর বেকের সাথে এ নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করার পর সেও আগ্রহী হয়ে ওঠে। শুরু হয় বিশ্বের দু'প্রান্তে দু'জন মানুষের প্রচেষ্টা। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ইন্সপেক্টর বেক এমন একটি কেমিক্যাল বানাতে সক্ষম হয় যার সাহায্যে বুলেটের খোসা থেকে আঙুলের ছাপ বের করা সম্ভব হয়। বেক এটাকে আরো একধাপ উন্নত করে, ফলে দশ বছরের পুরনো বুলেটের খোসা থেকেও আঙুলের ছাপ পুণরুদ্ধার করা সম্ভব হয়।

এরফলে এখন অনেক পুরনো আর অমীমাংসিত হত্যাকাণ্ডের তদন্ত নতুন করে করা সম্ভব। ব্যাপারটা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড অবহিত হলে তারা আর দেরি করে নি। জেফরি বেগ এবং ইন্সপেক্টর সুলিভান বেককে বিশেষ সম্মাননা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। গুলির খোসা থেকে ক্রিমিনালের আঙুলের ছাপ বের করার এই পদ্ধতির নামকরণ করেছে তারা জেফরি-বেক' টেকনিক। সেই আমন্ত্রণেই জেফরি চলে যায় লন্ডনে। লেখক জায়েদ রেহমানের কেসে নিজের যে ব্যর্থতা সেটা যেনো অনেকটাই ভুলিয়ে দিয়েছে নতুন এই সাফল্য।

খুব সামান্য একটা ব্যাপার: গুলির খোসা। কিন্তু সেটাতে কতো দরকারি তথ্যই না লুকিয়ে থাকে!

তার কাছে এখন মনে হচ্ছে জেফরি-বেক টেকনিকটা প্রয়োগ করার উপযুক্ত কেস এটি। গুলির খোসাগুলো থেকে প্রিন্ট নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো: পিং সিটি হোটেল থেকে পাওয়া বুলেটের কয়েকটি খোসা পাঠিয়ে দেবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সুলিভান বেকের কাছে।

এখন পর্যন্ত জেফরি যেতোটুকু জানতে পেরেছে, ৩০৬ নাম্বার রুমের যে গেস্টকে তারা, সম্ভাব্য খুনি হিসেবে মনে করছে সে অনেক ধূর্ত। ভুয়া নামে হোটেলে উঠেছিলো। তার জাতীয়-পরিচয়পত্রের যে নম্বার রেজিস্ট্রি করা হয়েছে সেটা ডাটাব্যাঙ্কের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে-ভুয়া।

লোকটা সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া গেছে সেটাও কোনো কাজে লাগবে বলে মনে হচ্ছে না। তবে কর্নেল সাহেব যদি সময় দেয় তাহলে প্রফেশনাল আর্টিস্ট দিয়ে খুনির একটা স্কেচ তৈরি করা যেতে পারে।

কেসটা আসলেই প্রহেলিকাময়। শিকার এবং শিকারী, উভয়ের পরিচয়ই অজ্ঞাত। এখন দুজনের পরিচয়ই বের করতে হবে। কাজটা দ্বিগুণ কঠিন হয়ে যাবে তাদের জন্য। তবে ম্যানেজারকে রিমান্ডে নিলে নিহতের পরিচয় জানা যেতে পারে।

আরেকটা ব্যাপার, সম্ভাব্য খুনি নাকি গাড়িতে করে হোটেল থেকে বের হয়ে গেছে, আর সেই গাড়িটা নিহতের-লাল রঙের একটি টয়োটা প্রিন্টার। নাম্বারপ্লেটে ঢাকা-ঘ লেখা ছিলো। এর বেশি বর্ণনা দিতে পারে নি পার্কিং এরিয়ার দারোয়ান। সংখ্যাগুলো মনে থাকার কথাও নয়।

যাইহোক, এখন থেকে এ শহরের প্রত্যেকটি লাল রঙের টয়োটা গাড়িই সন্দেহের তালিকায় চলে এসেছে। ট্রাফিক আর টহল পুলিশকে এরই মধ্যে বলে দেয়া হয়েছে। খুব বেশি সময় এখনও পার হয় নি, খুনি হয়তো পথেই কোথাও আছে। কথাটা জানার পর পরই জেফরি তার সহকারী জামানকে দিয়ে পুলিশ কন্ট্রোলরুমে এটা জানিয়ে দিয়েছে। তাদেরকে বলে দেয়া হয়, ত্রিশ বছরের কোনো যুবক আর বিশ-বাইশ বছরের কোনো যুবতী গাড়িতে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে যেনো গ্রেফতার করা হয়।

এখানে আর তার কোনো কাজ নেই। মোবাইল এভিডেন্স ভ্যানটা চলে এসেছে, নীচের পার্কিং এরিয়ায় রয়েছে সেটা। জেফরি বেগ সেখানে চলে গেলো।

সাবের কামাল বুলেটের খোসাগুলো নিয়ে এরইমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

জেফরিকে ভ্যানে ঢুকতে দেখে চওড়া একটা হাসি দিলো।

"কি অবস্থা?" জানতে চাইলো জেফরি।

"নিহতের আঙুলের ছাপ থেকে প্রিন্ট নিয়েছি, কম্পিউটার আর যন্ত্রপাতিতে ঠাসা একটি ডেস্কে বসে আছে সে।

জেফরি মাথা নেড়ে সায় দিলো।

সাবের কামালের চোখ কম্পিউটার মনিটরে। ইতিমধ্যে প্রিন্টটা স্ক্যান করে ফেলেছে সে। সাবের কামালের পাশে একটা ছোট্ট টুলে বসলো জেফরি।

"এখন কি ম্যাচিং করবে?"

"হুম।"

"স্যার?" জামান ভ্যানের খোলা দরজার কাছে এসে বললে জেফরি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে।

"আমরা কি এখন অফিসে ফিরে যাবো?"

"হ্যাঁ।"

জামান চুপচাপ ভ্যানে উঠে এক কোণের একটি কম্পিউটারের সামনে বসে গেলে তাদের ভ্যানটা চলতে শুরু করলো।

সাবের কামাল পেছন ফিরে জামানের উদ্দেশ্যে বললো, "জামান, আপনি ভিকটিমের আঙুলের প্রিন্টটা ডাটা ব্যাঙ্কে খুঁজে দেখেন, আপনার ড্রাইভে দিয়ে দিয়েছি ওটা।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জামান কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

তাদের ডাটা ব্যাঙ্কের সার্চ ইঞ্জিনটা আগের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগতিতে কাজ করে এখন। আগে যেখানে কোটি কোটি ফাইল থেকে ম্যাচিং বের করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগতো এখন সেখানে অনেক কম সময় লাগে। তার কারণ তাদের সার্চ-মেথড আপগ্রেড করা হয়েছে। ইংরেজি ছাব্বিশটি বর্ণমালায় বিভক্ত হয়ে একই সাথে ছাব্বিশটি ট্র্যাকে সার্চ প্রসেস কাজ করে। এই হিসেবে তাদের সময় ছাব্বিশ গুন কমে গেছে।

জেফরি বুলেটের খোসা থেকে কী পাওয়া যাবে সেটা নিয়ে উদগ্রীব হয়ে আছে। কারণ বিদেশের মাটিতে তার উদ্ভাবিত পদ্ধতিটা স্বীকৃতি পেলেও দেশে এখনও কোনো রকম মূল্যায়ণ পায় নি। বরং ডিপার্টমেন্টের হিংসুটে কলিগেরা বাঁকা চোখে দেখছে ব্যাপারটা। ওদের কাছে তার পদ্ধতিটার কার্যকারিতার প্রমাণ করার দরকার আছে।

"ন্যারো ডাউনের অপশনগুলো কি হবে, স্যার?" জানতে চাইলে জামান।

"খুব বেশি অপশন নেই...শুধুমাত্র পুরুষ, আর বয়স চব্বিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে।"

ম্যাচিং হতে সময় লাগবে তাই চেয়ার ঘুরিয়ে জেফরির দিকে ফিরে বললো সাবের কামাল, "কফি খাবেন, স্যার?"

মুচকি হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। তাদের এভিডেন্স ভ্যানে একটি পর্কোলেটর আছে-কফি মেশিন। জামান কফি খাবে না সুতরাং দু'কাপ কফি ঢালা হলো। তাদের ভ্যানটা চলছে। এখন শুধু অপেক্ষা।

"কেসটা কি আন্দাজ করতে পারছেন, স্যার?" সাবের কামালের প্রশ্নের জবাবে জেফরি মাথা দুলিয়ে জানালো এ ব্যাপারে তার কোনো ধারণা নেই।

"আমার মনে হয় নারকোটিক্স কেস, কফিতে চুমুক দিয়ে সাবের কামাল বললো।

"হতে পারে।"

"এয়ারপোর্টের পাশে...এরকম হোটেলগুলোতেই বিভিন্ন ধরণের স্মাগলাররা উঠে থাকে।"

"গোল্ড স্মাগলারও তো হতে পারে?" বললো জেফরি বেগ।

একটু ভেবে সাবের কামাল বললো, "তা হতে পারে।"

"সঙ্গে একটা মেয়ে ছিলো...ঘটনাটা নারীসংক্রান্ত হবার সম্ভাবনাও রয়েছে।"

"মেয়েটা নাকি ভিকটিমের সাথে ছিলো?" সাবের কামাল বললো।

"হুম।"

"কর্লগার্ল হবে। আমি নিশ্চিত।"

সাবের কামাল যে এরকম ভাববে সেটা জেফরি জানে। নারী সংক্রান্ত ব্যাপারে তার আগ্রহ অপরিসীম। কফিটা বিস্বাদ লাগছে সেজন্যে আর চুমুক দিচ্ছে না জেফরি। হোটেল ম্যানেজারকে ভালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, মনে মনে ভাবলো সে। লোকটাকে আসলেই সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। খুব বেশি রাত হওয়াতে আজ করে নি, আগামী কাল সকালেই সেটা করবে বলে ঠিক করলো। ততোক্ষণ পর্যন্ত বদমাশটা থানার গারদে মশার কামড় খেতে থাক।

"স্যার।"

পাশ থেকে জামানের কণ্ঠটা শোনা গেলো। সেদিকে তাকাতেই দেখতে পেলো তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

জেফরি বেগ তার দিকে ফিরলো। "কিছু পেয়েছো?"

কম্পিউটার মনিটরের দিকে ইঙ্গিত করলো জামান। মনিটরে এক লোকের ছবি দেখা যাচ্ছে। জেফরি দেখতে পেলো নিহত লোকটার ভোটার আইডি কার্ডের সমস্ত ডাটা মনিটরে ভেসে উঠেছে। তার নাম তাহলে মোঃ গিয়াস উদ্দিন," মাথা দোলাতে দোলাতে বললো সে, "যাক, তাহলে তার পরিচয় বের করা গেছে। উত্তরা থানায় জানিয়ে দিও।"

জামান একটু হতাশ হলো। "স্যার?"

"হুম," জেফরি বললো।

"একটা জিনিস খেয়াল করেন নি মনে হয়।"

জামানের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো এক চিলতে হাসি দেখা যাচ্ছে। অধীনস্থরা যখন পদস্থ কর্মকর্তাদের সামনে নিজের বাহাদুরি দেখায় তখন এক রকম আনন্দ পায়।

"স্যার, এই ফাইলটা রেড-ক্যাটাগরির!"

"কি!"

পেছন থেকে একটা হাত তার কাঁধে পড়তেই উমা চমকে উঠলো। ঘুরেই দেখতে পেলো অজ্ঞাত খুনি ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। যেনো এক্ষুণি খুন করে ফেলবে তাকে।

"কাকে ফোন করছো?" ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইলো খুনি।

"আ-আমার...পি-পি-"

তোতলাতে তোতলাতে বলতে গিয়েছিলো মেয়েটা আর বলতে পারলো না। হাত থেকে ফোনটা ছোঁ মেরে নিয়ে কাউন্টারের উপর রেখে দিলো খুনি। রাগে রীতিমতো কাঁপছে সে।

হাত ধরে টানতে টানতে দোকান থেকে বের করে আনলো মেয়েটাকে। পেছন থেকে দোকানি চেঁচিয়ে উঠলো, "আরে, টাকা না দিয়া কই যান, আপা?"

বাস্টার্ড একটু থেমে মেয়েটাকে টাকা দিয়ে দেবার জন্য ইশারা করলো। কাঁপা কাঁপা হাতে টাকা পরিশোধ করে কটন আর ব্যান্ডেজের প্যাকেটটা কোনোমতে হাতে নিয়ে নিলো মেয়েটি।

ওষুধের দোকানে তিনচারজন কর্মচারী আর দুয়েকজন কাস্টমার অবাক হয়ে দেখলো ক্ষুব্ধ এক যুবক রেগেমেগে এক মেয়েকে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। কেউ মেয়েটার সাহায্যে এগিয়ে এলো না। তার কারণ সম্ভবত, মেয়েটা কোনো রকম সাহায্য চায় নি, কিংবা লোকটার চোখেমুখে যে হিংস্রতা ছিলো সেজন্যে।

মেয়েটা কিছু বলতে চাচ্ছিলো কিন্তু খুনে দৃষ্টি হেনে মেয়েটাকে চুপ থাকতে বললো সে। ঝটপট গাড়িতে উঠেই আর দেরি করলো না। রাত অনেক হয়েছে, ফাঁকা হতে শুরু করেছে পথঘাট। হাইস্পিডে গাড়ি ছোটালো বাস্টার্ড।

মেয়েটা এমন ভড়কে গেছে যে বোবা হয়ে আছে। বাস্টার্ড চকিতে দেখে নিয়েছে, ভয়ে কাঁপছে সে। কী দুঃসাহস! চোখের সামনে দু'দুটো খুন হতে দেখেছে তারপরও তার সাথে এরকম কাজ করার সাহস পেলো!

একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে। হাত ধুয়ে ফেলবে। জ্বলজ্যান্ত একটি সমস্যা নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না। তার শরীরের যে অবস্থা, কিছুক্ষণ পর এই মেয়ে যদি তার সাথে আবারও উল্টাপাল্টা কিছু করে সে কিছুই করতে পারবে না।

লাল রঙের গাড়িটা দশ মিনিট পরই পৌঁছে গেলো নিরিবিলি একটা রাস্তায়। উমা গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বুঝতে পারলো না জায়গাটা কোথায়। অজ্ঞাত খুনিকে যে জিজ্ঞেস করবে সে সাহসও হলো না। কেমন যেনো লাগছে তার। গা ছমছম করছে। এক অজানা ভয় জেঁকে বসেছে তার মধ্যে।

আস্তে করে গাড়ির গতি কমে এলো। রাস্তা থেকে একটু সরে গাড়িটা থামলো একটা লেকের পাশে। ঘুটঘুঁটে অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বাস্টার্ড আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো সুনসান। সে জানে রাতের এ সময়ে এই জায়গাটা এমনই থাকার কথা।

"গাড়ি থেকে নামো," মেয়েটাকে বললো সে।

অবাক হয়ে চেয়ে রইলো উমা। এখানে?"

"হ্যাঁ।" কথাটা বলেই সে নেমে পড়লো গাড়ি থেকে।

একটু ইতস্তত করে মেয়েটাও গাড়ি থেকে নামলো। তার চোখেমুখে অজ্ঞাত ভীতি। চোখ দুটো ছলছল করছে। তবে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না। বলার সাহস পাচ্ছে না হয়তো। সে খেয়াল করেছে লোকটা তার পিস্তল হাতে নিয়ে বের হয়েছে।

শার্টের ভেতরে যে ব্যান্ডেজটা আছে সেটা চুঁইয়ে চুঁইয়ে তার ক্ষতস্থান দিয়ে এখনও রক্ত পড়ছে। শরীরটা দূর্বল হয়ে গেছে। মাথা ভনভন করছে এখন। আর বেশি দেরি করা যাবে না।

কয়েক গজ দূরে লেকের পাড়ে একটা গাছের নীচে নিয়ে গেলো মেয়েটাকে। একটু দূরে ল্যাম্পপোস্টের সোডিয়াম বাতির রহস্যময় হলুদাভ আলোয় মেয়েটার চোখের জল দেখতে পেলো সে।

"আমাকে মারবেন না, ভগবানের দোহাই লাগে!" কাঁদো কাঁদো গলায় বললো উমা।

কোমর থেকে সাইলেন্সর পিস্তলুটা বের করে তাক করলো মেয়েটার কপাল বরাবর।

দুহাত জোর করে মেয়েটা কাঁদছে। আমার অসুস্থ বাবা-মা...তাদেরকে দেখার কেউ নেই। আমাকে প্রাণে মারবেন না...আমি এই লাইনের মেয়ে না। আমি নিরুপায় হয়ে এ পথে এসেছি...বিশ্বাস করুন!"

বাস্টার্ড এসব কথা শুনতে চাচ্ছে না। আঙুল রাখলো ট্রিগারে।

মেয়েটা হাটু গেড়ে বসে পড়লো। এই প্রথম সে বুঝতে পারলো মেয়েটার চোখ দুটো বেশ মায়াবি। সেই চোখের দিকে চেয়ে রইলো বাস্টার্ড। তার মনের একটা অংশ বলছে ট্রিগার টিপে দিতে। নিতান্তই একটা বেশ্যা! খুন করো!

কিন্তু মনের অন্য একটা অংশ বলছে, মেয়েটা নিরীহ! অসহায় এক তরুণী! বিপদে পড়ে এ লাইনে এসেছে। তাকে মেরে তোমার কী লাভ?

এখনও দু'হাত জোর করে রেখেছে। দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে তার। রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেলে সেটার হেডলাইটের আলোয় মেয়েটার চোখের জল যেনো চিকচিক করে উঠলো। ক্ষণিকের জন্যে তার মুখটা এমনভাবে উদ্ভাসিত হলো যে কেঁপে উঠলো বাস্টার্ডের বুক।

তার চোখের দিকে তাকিও না!

ভেতর থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠলো। বাম হাত দিয়ে চেপে ধরলো কপালটা। চিনচিন করে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। তার মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তার মাও কি এই তরুণীর মতো অসহায় ছিলো?

এক সুতীব্র আবেগ তাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেললো মুহূর্তে।

"আমি জানি না আপনি কে...আমাকে আপনি দয়া করেন...আমাকে এভাবে মারবেন না..." মেয়েটা কান্না জড়ানো কণ্ঠে বলে যাচ্ছে।

চুপ করো! এসব কথা বলবে না!

"আমি খুবই অসহায় একটি মেয়ে...!" দু'চোখ বেয়ে যেনো জলপ্রপাত বইছে মেয়েটির। বেঁচে থাকার তীব্র আকুতি জানাচ্ছে বার বার।

অসহায়!

না। ও একটা বেশ্যা।

সেই ছোটোবেলা থেকে বেশ্যাদের ব্যাপারে তার মনে যে কোনো ঘৃণা নেই সে খবর হয়তো কেউ রাখে নি। বরং মনের গভীরে তাদের জন্য এক ধরণের মায়ামমতা কাজ করে।

আমার মাও কি বেশ্যা ছিলো না?

"না!" মুখটা আকাশের দিকে তুলে চিৎকার করে বললো বাস্টার্ড। থরথর করে কাঁপছে সে। মুহূর্তের মধ্যে এক সুতীব্র আবেগ গ্রাস করে ফেললো তাকে।

দু'হাত জোর করে হাটু গেড়ে বসে থাকা উমা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো তার দিকে। খুনি লোকটা কাঁদছে!

মা!

তার মায়ের মুখটা সে কখনও দেখে নি। কল্পনায় একটা মুখ সব সময় ভেবে থাকে। সেই মুখটা খুবই মায়াবি আর অসহায়, ঠিক এই মেয়েটার মতো!

"মা!" এবার উচ্চারণ করলেও কথাটা বলার সময় তার গলা ধরে এলো। তার গায়ের সমস্ত রোমকূপ শিহরিত হয়ে গেলো তীব্র এক আবেগে। টের পেলো পা দুটো টলে যাচ্ছে।

"মা!"

কিন্তু উমার কাছে প্রথমে মনে হলো সে বুঝি না বলেছে।

"মা!" কাঁপা কাঁপা গলায় আবারও বললো সে।

বিস্ময়ে চেয়ে রইলো উমা।

বাস্টার্ডের মনে হলো চারপাশটা দুলছে। এরকম অসাড় অনুভূতি এই জীবনে কখনও হয় নি। পিস্তলটা হাত থেকে পড়ে গেলো আলগোছে। ঘাসের জমিনটা সজোরে এসে তার

মুখের উপর আঘাত হানলো।

তারপরই সব কিছু অন্ধকার।

এভিডেন্স ভ্যানটা এখনও পথে আছে। ভেতরে জেফরির সাথে আছে জামান আর সাবের কামাল। কিছুক্ষণ আগে নিহতের আঙুলের ছাপ ডাটাব্যাঙ্কে ম্যাচিং করতে দিলে যে ফলাফল পাওয়া গেছে সেটা তাদের সবাইকে বিস্মিত করেছে। এই কেসটা যে আরো বেশি মনোযোগের দাবি রাখে সে ব্যাপারে কারো মনে সন্দেহ নেই।

"গিয়াস শীর্ষ সন্ত্রাসী ব্ল্যাক রঞ্জুর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী!...লেডি গিয়াস নামেই বেশি পরিচিত সে।"

"লেডি গিয়াস," জামানের কথাটা শুনে আপন মনে বললো জেফরি। ব্ল্যাক রঞ্জুর সন্ত্রাসী কাজকর্মের ব্যাপারে অন্যান্য আইনশৃঙখলা-বাহিনীর মতো হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টও অবগত আছে। অসংখ্য হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই প্রথম ব্ল্যাক রঞ্জুর দল সম্পর্কিত কোনো হত্যাকাণ্ডের তদন্তের দায়িত্ব তারা পেলো। আর অবাক করার মতো ব্যাপার হলো সেটা ব্ল্যাক রঞ্জুর অন্যতম ঘনিষ্ঠ লোকের হত্যাকাণ্ড, তাদের হাতে কারো খুনের নয়।

"স্যার, আমাদের কাছে যে আপডেট আছে তাতে দেখা যাচ্ছে গত দেড় বছর ধরে ব্ল্যাক রঞ্জুর সাথে কোলকাতায় বসবাস করে আসছে লেডি গিয়াস, কম্পিউটারের ক্রিমিনাল ডাটা ব্যাঙ্ক থেকে লেডি গিয়াসের ফাইল বের করে বললো জামান।

"তার মানে দেশে এসেছে বেশি দিন হয় নি?" জেফরি বললো।

"জি, স্যার। এই লেডি গিয়াস এক সময় নাটকা গেসু নামে পরিচিত ছিলো। এটা প্রথম দিককার কথা। খুবই দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী। অতিরিক্ত নারী লোলুপতার কারণে লেডি গিয়াস নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এটা তার দলের লোকেরাই দিয়েছে। ব্ল্যাক রঞ্জুর সাথে কোলকাতায় থাকে সে। ঢাকায় খুব একটা আসেতো না।"

"এর সম্পর্কে তো দেখি ভালোই তথ্য আছে আমাদের কাছে," বললো জেফরি।

জামানের ফোনটা বেজে উঠলো এমন সময়।

"হ্যালো...ইনভেস্টিগেটর জামান বলছি... হুম... কোথায়?... আচ্ছা... ঠিক আছে... একটু হোল্ড করেন।"

জেফরি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার সহকারী জামানের দিকে।

"স্যার, ধানমণ্ডির লেকের কাছে পার্কিং করা অবস্থায় লাল রঙের একটি টয়োটা গাড়িকে টহল পুলিশ লোকেট করতে পেরেছে! এইমাত্র কন্ট্রোলরুমে টহলদল জানিয়েছে সেটা।"

"এখন কি অবস্থা?"

"তারা ব্যাকআপ টিমের অপেক্ষায় আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো গ্রেফতার করা যাবে।"

জেফরি বেগের সমস্ত শরীর শিহরিত হয়ে গেলো। এখানে এসে লাল রঙের গাড়ির বর্ণনা দিয়ে সবখানে অ্যালার্ট করে দেয়ার সময়ও তার মনে হয়েছিলো এতে করে কাজ হতে পারে। "গুড!" তার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো।

চোখ খুলে দেখতে পেলো এক নারীর কোলে মাথা রেখে শুইয়ে আছে সে। পরম মমতায় সেই নারী তার মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। মায়াবী মুখের সেই নারী এক দৃষ্টে চেয়ে আছে তার দিকে। তবে কিছু বলছে না।

স্বপ্ন!

মাকে স্বপ্নে দেখছে। এরকম একটা স্বপ্ন ছোটোবেলায় প্রায়ই দেখতো। যে ঘরে তারা থাকতো তার ঠিক পাশের ঘরটাতেই এক অল্পবয়সী মা নিজের সন্তানকে কোলে করে এভাবে আদর করতো। এই দৃশ্যটা দেখার পর থেকেই স্বপ্নটা দেখতে শুরু করে সে। তার আগে মা সম্পর্কিত যাবতীয় আবেগ সুপ্ত অবস্থায় ছিলো।

"মা" অস্ফুট স্বরে বললো বাস্টার্ড।

মাথায় পরম মমতায় হাত বুলিয়ে গেলো তার তরুণী মা।

"এখন কেমন লাগছে?" তার মায়ের গলা কতোই না মিষ্টি।

"ভালো।"

আবারো কপালে হাতের পরশ পেলো। হাতটা ভীষণ ঠাণ্ডা। তার কপাল স্পর্শ করতেই ভালো লাগার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে।

"আপনার এখন কেমন লাগছে?" মিষ্টি কণ্ঠটা জানতে চাইলো।

বাস্টার্ড চোখ খুলে দেখলো আবার। একটা মায়াবি মুখ। কিন্তু এটা তার মায়ের মুখ নয়। তবে এখনও তার কপালে হাতের পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে মেয়েটি। আবার চোখ বুজে ফেললো। চোখ খোলা থাকলে স্বপ্নটা যদি চলে যায়! কী শান্তি সে পাচ্ছে বোঝাতে পারবে না কাউকে। মনে হচ্ছে স্বর্গের বিছানায় ঘুমাচ্ছে। শান্তি মানে ঘুম। ঘুম মানে শান্তি!

সে ঘুমাতে চায়। তার মায়ের কোলে মাথা রেখে এভাবে ঘুমাতে চায় একশ' বছর!

ঠিক কততক্ষণ এভাবে শুয়েছিলো বলতে পারবে না। প্রচণ্ড জোরে একটা শব্দ শুনে ঘুম ভাঙলো তার। জেগে উঠেই দেখতে পেলো এক জোড়া ভয়ার্ত চোখ তার দিকে চেয়ে আছে। তাকে দুহাতে ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

এটা কি স্বপ্ন?

মুখটা চেনা চেনা লাগছে। চোখ দুটো ফোলা ফোলা। সেই চোখে ক্লান্তি আর আতঙ্ক। রাস্তা থেকে একটা গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ আর লোকজনের কথাবাতা কানে যাচ্ছে তার।

বাস্টার্ড চেয়ে দেখলো কতোগুলো অল্পবয়সী ছেলে।

উমা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো তাকে ঘিরে থাকা কয়েকজন যুবকের দিকে। প্রত্যেকেই হালফ্যাশনের জামাকাপড় পরা। কারো কারো কানে রিং আছে। একজনের হাতে টাটু আঁকা। আরেকজন এই রাতের বেলায়ও সানগ্লাস পরে আছে। মোট চারজন।

"ওয়াও!" কানে দুল বললো।

"হেই ইউ, ফাঁকার! এখানে কী করছিস?" তুড়ি বাজিয়ে টাটু আঁকা ছেলেটা তাদের দু'জনকে বললো।

উমা ভয়ে কিছু বলতে পারলো না।

"আপ আপ! কোলে মাথা রেখে দুদু খাচ্ছিস!" দলের মধ্যে সবচাইতে বেটে যে সে বললো পেছন থেকে ঠেলেঠুলে সামনে এসে।

দ্রুত ধাতস্থ হয়ে গেলো বাস্টার্ড। পিস্তলটা? আমার পিস্তলটা কোথায়? উমা আর সে উঠে দাঁড়ালে লম্বা মতন এক পাঙ্ক বাস্টার্ডের কলার টেনে ধরলো। তার মুখ থেকে অ্যালকোহলের গন্ধ আসছে।

"ওই! ঘটনা কি?"

কিছু বললো না সে।

লাল রঙের গাড়িটার দিকে তাকালো লম্বু। "তোর গাড়িটা তো হেব্বি!"

ফোঁস করে একটা শব্দ হলে উমা আর বাস্টার্ড চমকে উঠলো একসঙ্গে।

বেটে মতো ছেলেটা অ্যারোসলের একটা ক্যান হাতে নিয়ে লাল গাড়িটার গায়ে স্প্রে

করে কী যেনো লিখে দিলো।

এম.এস ১৩!

উফ! বাস্টার্ড বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। কুখ্যাত এমএস ১৩-এর কবলে পড়েছে। এরা অভিজাত এলাকার ধনীর দুলাল। হাইব্রিড মাল! নিজেদেরকে এমএস ১৩ নামে অভিহিত করে। তাদের মতো আরো কিছু কুলাঙ্গার আছে। একটু লক্ষ্য করলেই ধানমণ্ডি-লালমাটিয়ার বিভিন্ন বাড়ি-ঘরের দেয়ালে এম.এস ১৩, বি বয়েজ, ৯ এম.এম, ইত্যাদি লেখা দেখা যাবে। এইসব দল স্প্রে করে এটা লিখে রাখে। নিজেদের জানান দেয় আর কি। কিছু দিন আগে পত্রিকায় তাদের নিয়ে লেখালেখি হয়েছিলো। কেউ কেউ এদেরকে গ্যাংস্টার হিসেবে চিহ্নিত করলেও অনেকেই মনে করে এরা আসলে বড়লোকের বখে যাওয়া ছেলেপেলে। নিতান্তই অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে এরকমভাবে নিজেদেরকে জাহির করে।

তবে বাস্টার্ড জানে এ দুটোর কোনোটাই পুরোপুরি সত্য নয়।

এদের মধ্যে কোনো কোনো দল কিংবা কিছু কিছু সদস্য ভয়ঙ্কর কাজকারবারের সাথেও জড়িত। দামি দামি গাড়ি চুরি করা এদের অন্যতম শখ। এগুলো পাশ্চাত্যের, বিশেষ করে আমেরিকান শহরগুলোর স্ট্রিট গ্যাং এর কেরিকেচার ছাড়া আর কিছু না। তবে ধীরে ধীরে এরা বিভিন্ন ধরণের অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। এদের প্রায় সবাই মাদকাসক্ত। এমন কি ইয়াবাসহ অনেক মাদক ব্যবসাও এরা করে থাকে। ঘনঘন ডি.জে পার্টির অ্যারেঞ্জ করা এদের অন্যতম কাজ।

বানচোতের দল! মনে মনে বললো বাস্টার্ড। কাঁধে গুলি লাগার কথা বেমালুম ভুলে গেলো। ভালো করে চেয়ে দেখলো মোট চারজন। একজন একেবারে বেটে, শারিরীকভাবে কোনো হুমকি হতে পারবে না সে। অন্য একজন মনে হচ্ছে নেশাগ্রস্ত। বাকি থাকে দু'জন। একজন বাস্টার্ডের চেয়েও এক-দু ইঞ্চি লম্বা হবে। অন্যজন তার চেয়ে কিছুটা খাটো। কি করবে ভেবে নিলো সে। ঠিক এ সময় চারজনের মধ্যে একজন এমন একটা কাজ করলো যাকে বলা যেতে পারে বারুদে আগুন দেয়া!

"ওই খানকির পোলা! মাগি নিয়া ফুর্তি করছিস?" লম্বা মতো ছেলেটা আবারো বাস্টার্ডের কলার ধরে বললো।

টাট্টু আঁকা ছেলেটা উমাকে জড়িয়ে ধরলে চিৎকার দিতে শুরু করলো ভয়ার্ত মেয়েটি।

"ওকে ছেড়ে দাও," একেবারে শান্ত কণ্ঠে বললো বাস্টার্ড।

"ছেড়ে দেবো!" বাস্টার্ডের কলারটা হ্যাঁচকা টান মেরে বললল লম্বু। "তোর খুব খারাপ লাগছে?" কথাটা বলে সঙ্গীদের দিকে তাকালো সে। তারা সবাই হেসে ফেললো। বিদ্রুপের হাসি।

বেটে ছেলেটা চোখমুখ খিঁচিয়ে বললো, "আমরা সবাই তোর সামনে এই খানকিটাকে রেইপ করবো...তুই চেয়ে চেয়ে দেখবি। বুঝলি, মাদারফাঁকার!"

বাস্টার্ড দেখতে পেলো টাটু আঁকা ছেলেটার হাত থেকে ছোটার জন্য মেয়েটা হাসফাস করছে। লম্বুটা তার গালে কামড় বসাতে উদ্যত।

তার সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেলো মুহূর্তে। ভেতরে ঘুমন্ত কোনো দানব যেনো জেগে উঠলো, শুরু করে দিলো তাণ্ডব।

এক ঝটকায় ডান হাতের তালু দিয়ে লম্বুর নাকে এমনভাবে আঘাত করলো যে ছেলেটা মুহূর্তে ছিটকে পড়ে গেলো, আর উঠতে পারলো না। এই আঘাতটা সে করেছে থুতনীর নীচ থেকে নাকের ফুটো লক্ষ্য করে। কমব্যাট ফাইটিংয়ের সবচাইতে ভয়ঙ্কর স্ট্রাইক। তার নাক কেঁটে গলগল করে রক্ত পড়ছে। এই ছেলে পাঁচ মিনিটের আগে আর উঠতে পারবে না।

সঙ্গে সঙ্গে টাটু আঁকা ছেলেটি মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে তার দিকে তেড়ে আসতেই বাস্টার্ড ডান পা দিয়ে তার জননেন্দ্রিয় বরাবর সজোরে লাথি মেরে বসলো।

নাক আর বিচি! ছেলেদের সবচাইতে নাজুক জায়গা।

স্বতঃফুর্ত প্রতিক্রিয়ায় মুহূর্তেই বাম পায়ের বুটের খাপ থেকে হান্টার নাইফটা হাতে নিয়েই

এগিয়ে গেলো কানে রিং পরা ছেলেটার দিকে। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে নিজের ধরাশায়ী দুই সঙ্গীকে চকিতে দেখেই উল্টো দিকে দৌড় শুরু করলো পাঙ্কটা।

স্প্রে হাতে বাঁটুল ছেলেটা হতভম্ব হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। বেচারার দু'পা যেনো আঠার সাথে লেগে আছে। বাস্টার্ড ভালো করে চেয়ে দেখলো, ছেলেটা রীতিমতো কাঁপছে এখন। এই সাহস নিয়ে অভিজাত এলাকায় মাস্তানি করা যায়, বাস্টার্ডের মতো কারোর মোকাবেলা করা যায় না।

লম্বুটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে এখনও, তবে নিজের বিচি দু'হাতে ধরে হাটু গেড়ে বসে আছে টাটু আঁকা ছেলেটা। তার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছে, জোরে জোরে কোত দিচ্ছে! মুখ দিয়ে শুধু 'আহ্ করে শব্দ বের হচ্ছে ক্রমাগত।

বেঁটেটার দিকে তাকিয়ে ইশারা করলো চলে যাবার জন্য। বেচারা যেনো ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলো। স্প্রে ক্যানটা ফেলে মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেলো সে। রইলো বাকি দুই। দুজনেই আপাতত কাবু। এদেরকে নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

হঠাৎ ডান পাশে তাকিয়ে দেখতে পেলো উমার পায়ের কাছে তার পিস্তলটা পড়ে আছে। পিস্তলটা তুলে নিয়ে উমাকেসহ গাড়িতে উঠে বসলো।

"তোমাকে তোমার বাড়িতে নামিয়ে দেবো, চিন্তা কোরো না।"

উমা কিছু বলতে যাবে অমনি তীব্র আলোয় দু'চোখ কুচকে এলো। কিছুই বুঝতে পারলো না। দু'হাতে চোখ ঢেকে বাস্টার্ডের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো তার চোখেমুখে বিস্ময়। ঠিক করে বলতে গেলে ভড়কে যাওয়া বিস্ময়!

"শিট!" অস্ফুটভাবে বাস্টার্ডের মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো কথাটা।

ইঞ্জিন স্টার্ট দেবার সুযোগ পায় নি তার আগেই টহল পুলিশের জিপটা তার গাড়ির সামনে এসে আচমকা ব্রেক করলো। হেডলাইটের তীব্র আলোয় কিছুক্ষণের জন্যে চোখ ঝলসে গেলো তার। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে সটকে পড়ার মতো কোনো উপায় রইলো না। টহল জিপটা প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সামনে।

সাইলেন্সার পিস্তলটা তুলে নিলো হাতে। উমা আতঙ্ক ভরা চোখে একবার তার দিকে আরেকবার সামনের দিকে তাকালো।

বাস্টার্ড অবাক হয়ে দেখলো জিপ থেকে দু'জন কনস্টেবল নেমেই রাইফেল উঁচিয়ে রেখেছে তাদের দিকে তবে কেউই সামনে এগিয়ে আসছে না। একটু পর আরো দু'জন কনস্টেবল জিপ থেকে নেমে যোগ দিলো তাদের সাথে। তারপরই জিপের সামনে থেকে একজন অফিসার নেমে এলো।

"উল্টাপাল্টা কিছু করলেই গুলি করা হবে," অফিসার চিৎকার করে দৃঢ়ভাবে বললো। "গাড়ি থেকে নেমে আসো...একজন একজন করে..."

এবার ওয়াকিটকিতে কথা বলছে সেই অফিসার। তার কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে বাস্টার্ড। তাদেরকে যে আটক করা হচ্ছে সে কথা জানিয়ে দিচ্ছে। কন্ট্রোলরুমকে। আরো ব্যাকআপ চাইছে সে।

হঠাৎ বাস্টার্ড দেখতে পেলো তার সামনে অস্ত্র তাক করে থাকা পুলিশগুলো তার গাড়ির পেছনে তাকাচ্ছে বিস্ময় নিয়ে। পেছনে তাকাতেই বুঝতে পারলো বাস্টার্ড।

তার গড়ির পেছন থেকে টাটু আঁকা ছেলেটা নিজের বিচি ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিছুই বুঝতে পারছে না সে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেলো লম্বুটাও। নাক চেপে ধরে সেও উঠে দাঁড়ালো। তারা কেউই বুঝতে পারছে না। পুলিশ দেখে তারাও ভড়কে গেছে।

অফিসার চিৎকার করে বললো, "হল্ট! হাত তুলো!"

লম্বুটা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো পুলিশের দিকে। এদিকে পুলিশও কিছু বুঝতে পারছে না। এরা কারা?

অফিসার আবার বললো, "তোমরা দুজন হাত তুলে হাটু গেঁড়ে বসো!"

লম্বুটা দু'হাত উপরে তুললো ঠিকই কিন্তু আচমকা বাম দিক দিয়ে দৌড়ে পালানোর ব্যর্থ

চেষ্টা করলো, আর টাটু আঁকা ছেলেটা নিজের সঙ্গীকে অনুসরণ করতে এক সেকেন্ডও দেরি করলো না। ডান দিক দিয়ে সেও দৌড় মারলো। তাদের দেখে এমনিতেই পুলিশগুলো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে, এখন দুটোকে দু'দিকে দৌড়াতে দেখে তারাও তাদের পেছনে ছুটলো। সামনে থাকলো শুধু অফিসার। সেও অবাক চোখে চেয়ে আছে পলায়নরত ছেলে দুটোর দিকে। একবার ডানে, একবার বায়ে। চিৎকার করে নিজের কনস্টেবলদেরকে বললো, "গুলি করো খানকিরপোলাগো!"

এই সুযোগ, মনে মনে বললো বাস্টার্ড। সাইলেন্সারটা এক ঝটকায় খুলে ফেলে জানালার কাঁচ দিয়ে হাতটা বের করে পর পর তিন রাউন্ড গুলি চালালো। সবগুলোই পুলিশের জিপ লক্ষ্য করে। এলোপাতারিভাবে নয়, তার টার্গেট হেডলাইট দুটো, সেই সাথে পুলিশকে ভড়কে দেয়া।

হঠাৎ এরকম পরিস্থিতিতে পড়ে অফিসার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো আত্মরক্ষার্থে। আর যেসব পুলিশ ঐ দুটো ছেলেকে ধাওয়া করার জন্য কিছুটা দূরে চলে গেছে তারা গুলির শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকাতেই বাস্টার্ড আরো তিনটি গুলি করলো তাদের লক্ষ্য করে। একটা গুলি কারোর গায়ে না লাগলেও বাস্টার্ডের উদ্দেশ্য পূরণ হলো। টহল পুলিশের চারজন কনস্টেবল নিজেদের হাতে রাইফেল থাকা সত্ত্বেও ভিমরি খেয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আশেপাশে দৌড়ে শেল্টার নেবার চেষ্টা করলো।

গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েই সামনের জিপটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু জায়গাটা সংকীর্ণ হওয়াতে জিপের গায়ে ভয়ঙ্কর শব্দে আঘাত লাগলো লাল রঙের গাড়িটা। বাস্টার্ড পরোয়া করলো না। গাড়িটার প্রতি তার কোনো মায়া নেই। এটা তার নিজের গাড়ি নয়।

পুলিশের জিপটা ধাক্কা মেরে ভয়ঙ্কর শব্দ করে তার গাড়িটা মেইন রাস্তায় উঠে এলো। বাস্টার্ড জানে গাড়িটা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এখান থেকে বের হতে পারছে সেটাই আসল কথা।

গাড়িটা ফাঁকা রাস্তা দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চললো। এতাক্ষণ পর টের পেলো বাম কাঁধটা আড়ষ্ট বোধ করছে। হাতটাও কেমন জানি দূর্বল দুর্বল লাগছে।

একটা গুলি লেগেছে আমার কাঁধে।

ভাগ্য ভালো গুলিটা লেগেছে তার বাম কলার-বোনের ঠিক নীচে। কোনো হাঁড় ভেদ করে নি, বুঝতে পারলো। যদি হাঁড়ে লাগতো তাহলে হাতটা কোনোভাবেই নাড়তে পারতো না। অকেজো হয়ে যেতো।

কিছু দূর যাওয়ার পর লক্ষ্য করলে খ্যাখ্যা করে একটা শব্দ হচ্ছে। বাস্টার্ড জানে সামনের চাকার মাডগার্ডটা দুমরে মুচরে টায়রের সাথে ঘষা লাগছে। কিন্তু দুই-তিন মাইল পর্যন্ত এক গতিতে ছুটে চললো সে। নিরাপদ কোথাও না গিয়ে তার গাড়ি থামবে না।

দশ মিনিট পর অনেক দূর চলে এলো তাদের গাড়িটা। পুলিশের গাড়িটা তাদের অনুসরণ করে নি, এটা এক ধরণের স্বস্তি হলেও বাস্টার্ড জানে যেকোনো সময় রাস্তায় তাদেরকে আঁটকে দেবে পুলিশ। এই গাড়িটা এখন আর নিরাপদ নয়। দ্রুত এটা পরিত্যাগ করতে হবে।

"আমি আপনার কাঁধে ব্যান্ডেজ করে দিই?" উমার কথাটা শুনে তার দিকে তাকালো সে। কিছু বললো না। বুঝতে পারছে না কী বলবে।

"আমি কিছু দিন নার্সের কাজ করেছি।"

মেয়েটার দিকে তাকালো সে।

"ছেড়ে দিলে কেন?" রাস্তার দিকে চোখ রেখেই বললো বাস্টার্ড।

"টেম্পোরারি ছিলো, স্থায়ী করার জন্য আন্দোলন করেছিলাম আমরা, তাই..." বলেই একটু থেমে আবার বললো, "গাড়িটা কোথাও থামান, আমি দেখি কী অবস্থা।"

সংসদ ভবনের পাশে তাদের গাড়িটা থামলো। চারপাশ অদ্ভুত নীরবতায় আচ্ছন্ন। গাড়ির ভেতরে বাতি জ্বালাতে বললো উমা। বাতির আলোয় ক্ষতস্থানটি ভালো করে দেখে নিলো

সে।

"আপনার তো ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত," সব দেখে বললো মেয়েটি।

"সেটা এখন সম্ভব নয়," বিরক্ত হয়েই বললো সে।

"ঠিক আছে, আমি পরিস্কার করে ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি। ব্লিডিংটা পুরোপুরি বন্ধ হয় নি... ওটা বন্ধ করতে হবে।"

কাজে নেমে গেলো উমা। প্যাকেট থেকে ব্যান্ডেজ, কটন আর অ্যান্টিসেপটিক বের করে নিলো। কী যেনো মনে পড়তেই গাড়ির ড্যাশবোর্ডে কিছু খুঁজতে লাগলো সে।

"কি খুঁজছো?" জানতে চাইলো বাস্টার্ড।

"মদের বোতল।" খুঁজতে খুঁজতেই বললো সে।

বাস্টার্ডের দু'চোখ কুচকে গেলো অবিশ্বাসে। "কি!"

তার দিকে তাকিয়ে উমা বললো, "মদে অ্যালকোহল আছে, আপনার ক্ষতে একটু ঢেলে দিলে ব্যাথা কমে আসবে। ইনফেকশনও হবে না।" উমা হাতরাতে হাতরাতে ছোট্ট একটা মদের বোতল পেয়ে গেলো। "এই তো।"

"এখানে মদ আছে সেটা তুমি জানলে কী করে?" বাস্টার্ড অবাক।

তার চোখে চোখ রেখে উমা বললো, "আমি লেডি গিয়াসের সাথে এই গড়িতে করেই এসেছি।"

ও! মনে পড়ে গেলো বাস্টার্ডের।

আগেরবারের মতো বাজেভাবে ব্যান্ডেজ করলো না উমা, এবার বেশ ভালোভাবে কাজটা করতে পারলো। বাস্টার্ড অবাক হয়ে দেখলো তার কাজ। গুলিটা যে তার শরীরের ভেতর নেই সেটা আগেই বুঝেছিলো, উমাও একই কথা বললো।

ক্ষতস্থানে একটু মদ ঢেলে দিতেই কামড়ে ধরলো যেনো, তবে ব্যাথায় একটুও শব্দ করলো না। অবাক হলো উমা। লোকটার কি কোনো অনুভূতি নেই!

উমা তার খুব কাছে এসে ক্ষতস্থান পরিস্কার করতে থাকলে বাস্টার্ড তার চুলের গন্ধটা পেলো। এরকম শারিরীক যন্ত্রণার মধ্যেও গন্ধটা স্বস্তি দিলো তাকে। কিছুক্ষণ পর মেয়েটার শরীরের ঘ্রাণও পেলো। ভালো লাগার একটি অনুভূতি তৈরি হলো তার মধ্যে। তার মায়ের শরীরের ঘ্রাণও কি এরকম ছিলো?

"আমি কিন্তু পুলিশকে ফোন করি নি।" উমা ক্ষতস্থান পরিস্কার করতে করতে কথাটা বললে বাস্টার্ড চমকে তার দিকে তাকালো। "তাহলে কাকে ফোন করেছো?"

"আমার পিসিকে।"

"কেন?"

"আমার মা আর বাবা দুজনেই অসুস্থ, তাদের খোঁজখবর নিতে।"

বাস্টার্ড কিছু বললো না।

পুরো কাজটা করতে পনেরো-বিশ মিনিট লেগে গেলো। চারপাশে চেয়ে দেখলো রাত অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে। এই গাড়িটা নিয়ে বেশি দূর যাওয়া যাবে না। বুঝতে পারছে গাড়িটা পুলিশের কাছে রিপোর্ট হয়ে গেছে। মেয়েটাকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিতে চায় সে, কিন্তু ভালো করেই জানে এতো রাতে রামপুরায় যাওয়া ঠিক হবে না, আর এই গাড়িটা নিয়ে গেলে নিঘাত ধরা খাবে। ধীরেসুস্থে ভেবে নিলো সে। মেয়েটাকে জানানো উচিত।

"শোনো, তোমার বাড়িতে এখন যাওয়া যাবে না।" নিষ্পলক চেয়ে রইলো উমা।

"রাস্তায় বের হলেই বিপদ...আজ রাতটা অন্য কোথাও থেকে কাল সকালে তোমার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আসবো।"

কিছুই বললো না মেয়েটা। যেনো কিছু বলে লাভ নেই, এরকম একটা ভঙ্গি করলো।

আর দেরি না করে গাড়িটা নিয়ে ছুটে চললো নির্দিষ্ট একটা গন্তব্যে।

কিছুক্ষণ পরই মোহাম্মদপুরের একটা বন্ধ গ্যারাজের সামনে চলে এলো তাদের গাড়িটা। রাতের এই সময় আশেপাশের সব কিছুই বন্ধ হয়ে গেছে। বাস্টার্ড গাড়িতে বসে থেকেই

একটা ফোন করলো। অপর প্রান্তে যে ধরলো। তাকে বাচ্চু নামে ডাকলো সে। জানালো তার গ্যারাজের সামনেই আছে এখন। বাচ্চু নামের লোকটা হয়তো কিছু বলতে চেয়েছিলো কিন্তু বাস্টার্ড তাকে বেশি কথা না বলে গ্যারাজের দরজা খোলার জন্য বলেই ফোন রেখে দিলো।

দু'তিন মিনিট পর ঘরঘর শব্দ করে গ্যারাজের বিশাল কাঠের দরজাটা খুলে গেলো।

"বস, হইছে কি?" বাচ্চু নামের লোকটা আসলে বিশ-বাইশ বছরের এক যুবক। চোখেমুখে কৌতূহল নিয়ে সে বাস্টার্ডকে দেখে নিলো। তার শার্টের বাম কাঁধের জায়গায় রক্ত লেগে আছে। তারপরই গাড়িটা দেখলো সে। "গাড়িটা তো ভচকাইয়া গেছে!" আড়চোখে গাড়ির ভেতর বসা উমার দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিলো।

বাস্টার্ড গাড়িটা গ্যারাজের ভেতর ঢুকিয়ে বের হয়ে এলো, তবে উমা চুপচাপ বসে রইলো নিজের সিটে।

"একটা অ্যাকসিডেন্ট করেছি," ছেলেটার প্রশ্নের জবাব দিয়ে তাকে গ্যারাজের এককোণে নিয়ে গেলো সে। "এই গাড়িটা তোর কাছে রেখে দে, নাম্বারপ্লেট আর কালার বদলে ফেলবি।"

"ঠিক আছে, বুঝছি," ছেলেটা যেনো সব বুঝে গেছে এমনভাবে মাথা নেড়ে বললো।

"এর বদলে আমাকে কয়েক দিনের জন্য অন্য একটা গাড়ি দিবি।"

বাচ্চু একটু মাথা চুলকাতে লাগলো। "তা দিবার পারুম...কিন্তু একটু কাম আছে। কাইল সকালে ঠিক কইরা দিতে অইবো।"

"তুই খুব সকালে গাড়িটা রেডি করে রাখবি।" তারপর লাল রঙের গাড়িটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো, "এটা অনেক ভালো দামে বেঁচতে পারবি তুই।"

"এইটা কি আমারে দিয়া দিলেন নাকি, বস?" এবার দাঁত বের করে হেসে বললো বাচ্চু।

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাস্টার্ড। "খুব জলদি এটার চেসিস নাম্বার, কালার আর নাম্বারপ্লেট বদলে ফেলবি...পুলিশের ঝামেলা আছে।"

পুলিশের ঝামেলার কথা শুনে বাচ্চু একুটও চিন্তিত হলো না। কারণ এই শহরের গাড়ি চোরদের নিয়ে তার কাজকারবার, পুলিশকে কিভাবে ফাঁকি দিতে হয় সেটা সে ভালা করেই জানে।

"ওইটা নিয়া আপনে চিন্তা করবেন না, বস্।"

একটু ভেবে বাস্টার্ড বললো, "আরেকটা ব্যাপার..."

"কি?" বাচ্চু আগ্রহভরে চেয়ে রইলো।

"তোর এখানে কি আজ রাতটা থাকা যাবে?"

"যাইবা না কেন...আমার গ্যারাজের পিছনে ঘর আছে না।" দাঁত বের করে হেসে গাড়ির ভেতরে চুপচাপ বসে থাকা উমার দিকে ইঙ্গিত করে বললো, "বস... কেসটা কি?"

"আমার পরিচিত একজন, একটু বিপদে পড়েছে...পরে তোকে সব বলবো। এখন বল, তোর এখানে আর কে কে আছে?"

"আমি আর আমার এক পিচ্চি...রাইতে তো এইখানে আমরাই থাকি।"

"বাকি মেকানিক্সরা?"

"ওরা এগোর বাড়িতে থাকে।"

"ভালো।" কথাটা বলেই বাস্টার্ড একটু ভেবে নিলো। "আমরা গাড়িতেই রাত কাটাতে পারবো..."

"কী যে কন না," বাচ্চু কপট হতাশা ব্যক্ত করলো। "আমরা দুইজন গ্যারাজে থাকি... আপনে আর আপনের মেহমান পেছনের ঘরে থাকেন।"

দশ মিনিট পর, তারা বসে আছে বাচ্চুর গ্যারাজের পেছনে একটা ছাপড়া ঘরে। আম কাঠের সস্তা খাট আর কিছু সেকেন্ডহ্যান্ড ফার্নিচার। খাবার রাখার জন্যে একটা র‍্যাক। কাপড় রাখার আলনা। আয়না। চৌদ্দ ইঞ্চির একটি টিভি।

থাকার জন্যে মোটেও ভালো জায়গা নয়, তবে আশ্রয় হিসেবে ঠিক আছে। বাস্টার্ড

খাটের উপর থেকে একটা কাঁথা আর বালিশ নিয়ে মেঝেতে বিছিয়ে দিলো। উমাকে খাটে শোবার সিগন্যাল এটি।

"আমার সাথে এক ঘরে থাকতে কি তোমার খারাপ লাগবে?" বালিশটা জায়গামতো রেখে জানতে চাইলো সে।

"না।" উমা কথাটা এমনভাবে বললো যার অর্থ বিপরীতও হতে পারে।

"ভালো।" বাস্টার্ড আর কোনো কথা না বলে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। টের পেলো ক্ষতস্থানে তীব্র ব্যাথা হচ্ছে। শারিরীক যন্ত্রণাকে আমলে নিলো না সে। কাল সকালে এই মেয়েটাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে চলে যাবে তার পরিচিত এক ডাক্তারের কাছে।

ঘরে আলো নেই, ঘুটঘুঁটে অন্ধকার কিন্তু তাদের দুজনের কারো চোখেই ঘুম নেই। দু'জনের চোখই খোলা। এভাবে কিছুক্ষণ সময় অতিক্রান্ত হবার পর উমাই প্রথম মুখ খুললো। আস্তে করে বললো সে, "কি হয়েছিলো আপনার?"

তার কী হয়েছিলো! বাস্টার্ড নিজেও ঠিক করে বলতে পারবে না। উমা শুধু শুনতে পেলো বাস্টার্ডের নিঃশ্বাসের শব্দ আরো দ্রুত হয়ে উঠেছে।

"আপনার মায়ের কী হয়েছে?" উমা বললো।

"আমি কখনও মাকে দেখি নি।" কথাটা তার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো। সে জানে না কেন এ কথাটা বললো। কিছু বলার ইচ্ছে ছিলো না তার। কিন্তু অজ্ঞাত এক শক্তি ভেতর থেকে তাকে দিয়ে কথাটা বলিয়ে নিয়েছে।

"আপনি তখন খুব ছোটো ছিলেন?"

"জানি না।"

অবাক হলো উমা। কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছে না সে মিথ্যে বলেছে। "আপনি জানেন না?"

দু'চোখ বন্ধ করে ফেললো বাস্টার্ড। "জানি...কিন্তু কখনও তাকে দেখি নি।"

"কেন?"

"আমার মা..." আর বলতে পারলো না সে। গলা ধরে এলো।

"মাকে অনেক ভালোবাসেন?"

কোনো জবাব দিলো না সে।

"এখন আপনার কেমন লাগছে?" জানতে চাইলো উমা।

"ভালো।"

যে মেয়েকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিলো সেই মেয়েটি কিনা তার প্রতি এমন মমত্ব দেখাচ্ছে! অদ্ভুত! অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে অচেতন ছিলো, মেয়েটা তাকে ফেলে পালিয়ে যেতে পারতো। তকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারতো। গাড়ির বুটে প্রচুর টাকা আছে, সে কথাও মেয়েটার অজানা নয়।

"তুমি আমাকে ফেলে চলে যেতে পারতে...গেলে না কেন?"

"আপনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন," বললো উমা।

"আমি তো আরেকটু হলে তোমাকে খুন করে ফেলতাম।"

মেয়েটা কিছু বললো না।

"আমাকে ছেড়ে চলে গেলে না কেন?"

"জানি না," আস্তে করে বললো উমা।

মেয়েদের মন বোঝার ক্ষমতা বাস্টার্ডের কোনো কালেই ছিলো না, এখন মনে হচ্ছে কোনো কালেই সেই ক্ষমতা তার হবে না।

"তোমার নাম কি?"

"উমা।"

"এটাই কি তোমার আসল নাম?"

"উমা রাজবংশী।"

“এ রকম একটা... মানে, এ পথে এলে কেন? এদের সাথে তোমার পরিচয় হলো কিভাবে?”

উমা তার গল্পটা বলতে শুরু করলো।

ছয়-সাত মাস আগে চাকরি স্থায়ী করার জন্য আন্দোলনে নামলে নার্সের চাকরিটা হারায় সে, তারপর মিনা আপা নামের এক মহিলার বিউটিপার্লারে কাজ নেয়। বিউটিপার্লারের ছদ্মবেশে দীর্ঘদিন ধরে দেহব্যবসা চালিয়ে আসছে মহিলা। সমাজের উঁচুতলায় কলগার্ল সাপ্লাই দেয়। অনেক হোমরাচোমরার সাথে মহিলার সম্পর্ক আছে।

দেখতে সুন্দর বলে উমার উপর নজর পড়ে মহিলার। তারপর যখন জানতে পারে অভাব অনটনে বিপর্যস্ত সে তখন সুযোগ বুঝে তাকে এই লাইনে আসার প্রলোভন দেয়। প্রথমে উমা রাজি হয় নি, কিন্তু দুর্ঘটনায় পঙ্গু বাবা আর মায়ের সংসারে একমাত্র আয় রোজগার করা মেয়ে কোনোভাবেই বিউটিপার্লারের স্বল্প বেতনে চলতে পারছিলো না। গত সপ্তাহে যখন তার মা বাথরুমে পড়ে গিয়ে কোমর ভাঙলো তখন আর কিছু করার থাকলো না। এ শহরে তাদের আত্মীয় বলতে তেমন কেউ নেই। যারা ছিলো তাদের বেশিরভাগ চলে গেছে ইন্ডিয়ায়। আশেপাশের প্রতিবেশীরা ধার দিতে দিতে অতীষ্ঠ হয়ে গেছে, তাদের কাছে যাবার মুখও নেই। সুতরাং মিনা আপার লোভনীয় প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় সে। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর বিএ'তে ভর্তি হয়েছিলো উমা, কিন্তু পরীক্ষা দিতে পারে নি।

সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো বাস্টার্ড। “তুমি আর এসব কাজ করবে না,” আস্তে করে বললো অবশেষে।

বুঝতে পারলো না উমা। এই লোক এ কথা বলছে কোন অধিকারে? “কেউ শখ করে আসে না,” একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো সে।

“শখ করে এলে তোমাকে গুলি করে মারতাম।”

অন্ধকারেই উমা তার দিকে চেয়ে রইলো। “আর বাধ্য হয়ে এসেছি বললে কি করবেন?”

“তোমাকে আর ওপথে যেতে দেবো না,” দৃঢ়তার সাথে বললো সে।

অবাক হলো উমা। খুব সহজ কথা কিন্তু কী দৃঢ়তার সাথেই না বলছে! “এভাবে ক'জনকে উদ্ধার করবেন?”

“যে ক'জন আমার সামনে পড়বে।” একদম নির্বিকার তার কণ্ঠ।

চুপ মেরে রইলো উমা।

মেয়েটির প্রতি কোন মায়া জন্মে গেছে কিনা বুঝতে পারছে না সে শুধু বুঝতে পারছে মেয়েটার উপর অধিকার জন্মে গেছে। অদ্ভুত। এরকম অভিজ্ঞতা তার কখনও হয় নি।

অনেকক্ষণ চলে গেলো, কেউ কোনো কথা বললো না। অবশেষে বাস্টার্ড বললো, “ব্ল্যাক রঞ্জুর দল তোমাকে ছেড়ে দেবে না। খুব সম্ভবত পুলিশও তোমাকে খুঁজবে। ওদের হাত থেকে বাঁচতে হলে তোমাকে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। অন্তত এক মাস গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে।”

“আমি কোথায় যাবো?” অসহায়ের মতো বললো সে। “অসুস্থ বাবা মা...আমার হাতে খুব বেশি টাকা-পয়সাও নেই...”

মেয়েটার অসহায়ত্ব বুঝতে পেরে একটু ভেবে বললো, “একটা ব্যবস্থা করা যাবে...চিন্তা কোরো না।”

উমা চুপ মেরে রইলো। এভাবে আরো কিছুক্ষণ চলে গেলেও কেউ কিছু বললো না। বাস্টার্ড টের পেলো সারা শরীর ঘেমে জ্বর আসছে।

“ওদের সাথে আপনার কি হয়েছে?”

উমার প্রশ্নটা বুঝতে পারলো না। “কাদের সাথে?”

“লেডি গিয়াস, মিনা আপা...”

“তুমি বুঝবে না। বোঝার দরকারও নেই।”

আরো পাঁচ-দশ মিনিট পর প্রচণ্ড জ্বর হয়ে সমস্ত শরীর ঘেমে উঠলো। যেখানটায় গুলি

লেগেছে তীব্র ব্যাথা হতে লাগলো সেখানে। নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠলো তার। একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেলো। সেই ঘোরে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলো সে।

ছোট্ট এক শিশু। মায়ের কোলে শুয়ে আছে। অল্পবয়সী মা শিশুটির কপালে পরম মমতায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। গুন গুন করে গান গাইছে মা। ঘুম পাড়ানির গান। শিশুটি ঘুমিয়ে আছে...

...সে টের পাচ্ছে তার কপালে কোমল একটি হাত। এরকম আদর সে জীবনেও পায় নি। তার অনেক ভালো লাগছে। প্রতিটি স্পর্শ তাকে ভালো লাগার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে গেলে দেখতে পেলো উমা নামের মেয়েটি তার মাথার কাছে বসে আছে। তার কপালে ভেজা পট্টি।

"কি!"

"আপনার অনেক জ্বর হয়েছিলো, সারারাত ঘুমাতে পারেন নি। ছটফট করেছেন।"

বাস্টার্ড মেয়েটার দিকে চেয়ে রইলো। কিছু বলতে পারছে না। খুব দুর্বল দুর্বল লাগছে তার। কাঁধটা যেনো অসাড় হয়ে আছে। ঘাড় নাড়াতে পারছে না, নাড়াতে গেলেই ব্যাথা ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে।

চারপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারলো ভোরের আলো ফুটছে। তাকে উঠতে হবে। অনেক কাজ আছে। এই মেয়েটাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যেতে হবে ডাক্তারের কাছে। ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে নি কোনো মধ্যবয়সী মহিলা পিস্তলের মুখে ভড়কে না গিয়ে পাল্টা তাকে গুলি করে বসবে। বুঝতে পারলো শুটার সামাদের কথাটাই ঠিক। ব্ল্যাক রঞ্জু আর তার দল খুবই বিপজ্জনক। সুলতানকে সহজে কাবু করে তার মনে হয়েছিলো রঞ্জুর দলের সবাই বুঝি খুব সহজেই বাগে আনা যাবে। আসলে খাটো করে দেখেছিলো ওদেরকে। পরিণামে এখন গুলিবিদ্ধ হয়ে কাতরাচ্ছে সে। এই প্রথম গুলিবিদ্ধ হলো। তাও আবার কোনো মহিলার হাতে!

উঠে বসলো সে। উমাকে একুট ঘুমিয়ে নিতে বললো, মেয়েটা যে সারা রাত ঘুমায় নি বুঝতে পারলো। বাস্টার্ড চলে গেলো গ্যারাজে।

খুব বেশিক্ষণ ঘুমাতে পারলো না উমা। খুটখাট শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে উঠে বসলো। গ্যারাজ থেকে আওয়াজটা আসছে। বিছানা থেকে উঠে গ্যারাজের গেট দিয়ে ভেতরে উঁকি মারতেই দেখতে পেলো বাচ্চু নামের ছেলেটার সাথে বাস্টার্ড কথা বলছে। বনেট খোলা সাদা রঙের একটি গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে তারা। বুঝতে পারলো লাল রঙের গাড়িটা রেখে এটাই ব্যবহার করবে এখন, গত রাতে এরকম কথাই শুনেছে সে।

বাচ্চুর এনে দেয়া নাস্তা সেরেই তারা রওনা হয়ে গেলো সকাল সাড়ে আটটার দিকে। বাস্টার্ড এখন সাদা রঙের গাড়ি চালাচ্ছে। আগের গাড়িটা থেকে এটা সব দিক থেকেই জৌলুসহীন তবে এই গাড়িটাই তাদের জন্য নিরাপদ।

"রামপুরার কোথায় নামিয়ে দিলে তোমার জন্য সুবিধা হয়?" গাড়ি চালাতে চালাতে জানতে চাইলে বাস্টার্ড।

"ব্রিজের কাছে নামিয়ে দিলেই হবে।"

বাস্টার্ড আর কিছু না বলে গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে চলতে শুরু করলো আবার। তার গাড়িতে খুব বেশি তেল নেই, সুতরাং ব্রিজের কাছে নামিয়ে দিলেই ভালো হয়, সে জানে ব্রীজ থেকে একটু সামনেই একটা পেট্রলপাম্প আছে।

রাস্তা ফাঁকা, দ্রুত গতিতে চলছে গাড়িটা। রামপুরা ব্রিজের কাছে পৌঁছাতে পনেরো মিনিটের বেশি লাগলো না। ব্রিজ পেরিয়ে গাড়িটা থামলো রাস্তার বাম দিকে।

এবার পাশে বসা উমার দিকে ফিরলো সে। তার দিকে হাজার টাকার দুটো বান্ডিল বাড়িয়ে দিলো। এটা রাখো।"

উমা যারপরনাই বিস্মিত। কিছুই বুঝতে পারছে না।

“নাও।” তাড়া দিলো সে। মেয়েটার কোলের উপর বান্ডিল দুটো রেখে দিলো সে। বাচ্চু যখন তাদের জন্য নাস্তা আনতে গিয়েছিলো তখনই গলফ ব্যাগ থেকে টাকাগুলো সরিয়ে রেখেছিলো। “আজকেই অন্য কোথাও চলে যাবে। তোমার বাবা-মা’র চিকিৎসাও করাতে পারবে এ টাকা দিয়ে। দেরি করবে না। ঝামেলায় পড়বে।”

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো উমা। “আপনি আমাকে টাকা দিচ্ছেন?”

“হ্যাঁ, দিচ্ছি!” ঝাঁঝের সাথে বললো সে। “কোনো সমস্যা আছে?”

চুপ মেরে রইলো উমা।

“ব্ল্যাক রঞ্জু খুবই ভয়ঙ্কর লোক। তার দলটা বিশাল। তারা তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজবে... পুলিশও আসতে পারে। আজ নয়তো কাল ওরা আসবেই। যতো জলদি পারো অন্য কোথাও চলে যেও।” একটু থেমে আবার বললো সে, “যদি না যাও তাহলে তোমার তো সমস্যা হবেই, আমারও হবে।”

উমা তার এ কথাটা বুঝতে পারলো না। তার কপালে ভাঁজ পড়লো। “আপনার কী সমস্যা হবে?”

“তুমি বুঝবে না। বোঝার দরকারও নেই।”

তার হাতে দুটো অপশন ছিলো : হয় মেয়েটাকে মেরে ফেলা; নয়তো তাকে ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। প্রথমটা করতে পারে নি। তাই দ্বিতীয় কাজটা করছে।

বাস্টার্ড অধৈর্য হয়ে উঠলো। “বাসায় চলে যাও। যা বললাম তাই করো...সবার ভালো হবে। তোমার নিজের, তোমার মা-বাবার...আর যা দেখেছো, যা বুঝেছো, কাউকে কিছু বলবে না। বললেই সমস্যায় পড়বে।”

উমা টাকাগুলো ভ্যানিটি ব্যাগে রাখতে গিয়ে দেখতে পেলো গতরাতের রক্তাক্ত শার্টটা নেই। তার মানে সে যখণ ঘুমিয়েছিলো তখন ওটা সরিয়ে ফেলেছে লোকটা।

দরজা খুলে বের হয়েই কী যেনো মনে করে ফিরে তাকালো আবার। “আপনার নামটা?”

“আমার কোনো নাম নেই।” কথাটা বলেই এক্সেলেটরে পা রাখলো সে। গাড়িটা দ্রুত চলে গেলো।

বিস্ময়ে চেয়ে রইলো উমা।

হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। গতকাল রাতে উত্তরার পিং সিটিতে খুন হয়েছে কুখ্যাত সন্ত্রাসী ব্ল্যাক রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী লেডি গিয়াস। ব্যাপারটার পেছনে যে বড় কোনো ঘটনা জড়িত জেফরি বেগ সেটা তখনই বুঝতে পেরেছিলো। রাতের বেলায়ই সম্ভাব্য খুনিকে পুলিশ ধরেও ফেলেছিলো কিন্তু খুনি চার-পাঁচজন অস্ত্রধারী পুলিশকে কাবু করে পালিয়ে গেছে। খবরটা শোনা মাত্রই তার মেজাজ বিগড়ে যায়। এটা হলো চূড়ান্ত অযোগ্যতা!

পুলিশ যদি আরেকটু সতর্ক থাকতো তাহলে কতো সহজেই না কেসটা সমাধান করা যেতো! সে তো বলেই দিয়েছিলো, খুনি খুবই ভয়ঙ্কর প্রকৃতির।

খবরটা যখন প্রথম শোনে আনন্দে তার শরীরে শিহরণ বয়ে যায়। কিন্তু সেই আনন্দের স্থায়িত্ব ছিলো মাত্র পাঁচ মিনিট। সারাটা রাত তার ঘুম আসে নি এই ব্যর্থতার কথা ভেবে। মেজাজ এতোটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিলো যে সকালে ঘুম থেকে উঠে জগিং করতেও ইচ্ছে করে নি।

খুব সকালে অফিস থেকে ফোন করে তাকে জানানো হয় গতকাল রাতে শান্তি নগরের এক অ্যাপার্টমেন্টে নির্মমভাবে এক মহিলা খুন হয়েছে। আরেকটা খুন! জেফরি বুঝতে পারলো হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের লোকবল বাড়াতে হবে। অবশ্য নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছিলো এই বলে যে, কখনও কখনও পর পর কয়েকটি খুন হওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। প্রায়ই এরকম হয়ে থাকে; কিন্তু তখনও বুঝতে পারে নি এই মহিলার হত্যাকাণ্ডের সাথে ব্ল্যাক রঞ্জু এবং লেডি গিয়াসের কানেকশান রয়েছে।

অফিসে এসে দশ মিনিটের মতো থেকেই চলে যায় শান্তি নগরের ঘটনাস্থলে। এভিডেন্স টিম চলে গিয়েছিলো আরো আগে। ঘটনা ঘটেছে রাত এগারোটার দিকে। স্থানীয় পুলিশ জানতে পারে বারোটার পর।

মিনা নামের মহিলার লাশের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জেফরি বেগ। মহিলার হাতে একটা ওয়েম্বলি অ্যান্ড স্কট মডেলের পয়েন্ট থার্টি টু ক্যালিবারের রিভলবার। ওয়ার্ডরোবের পাশে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মহিলা অস্ত্র চালিয়েছে। অবাক হলো সে। দুটো গুলি বিদ্ধ হয়েছে মহিলার পেটে আর বুকে। তবে মহিলা নিজেও দুটো গুলি করেছে, দুটোই বিদ্ধ হয়েছে সামনের সোফায়। বোঝাই যাচ্ছে তার নিশানা ব্যর্থ হয়েছে। অজ্ঞাত খুনি সেই সুযোগে মহিলাকে শেষ করে দিয়েছে। খুনির নিশানা মহিলার চেয়ে অনেক ভালো। প্রফেশনাল। ঘর থেকে মোবাইল ফোন ছাড়া আর কিছুই খোয়া যায় নি।

আজব!

এটা ডাকাতির ঘটনা নয়। কোনোভাবেই না। পুলিশ খতিয়ে দেখেছে : ঘরের ভেতর প্রচুর টাকা আর স্বর্ণালঙ্কার এখনও অক্ষত আছে। কিছুই সরানো হয় নি। সবচাইতে বড় কথা মহিলার ওখানে ছয়-সাতজন যুবতী মেয়ে থাকে, তাদের মধ্যে দু'জন ঘটনা ঘটার পর পরই পালিয়ে গেছে। বাকি চারজন জানিয়েছে খুনের ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না। পালিয়ে যাওয়া ঐ দুই মেয়েও এসবের সাথে জড়িত নয়। তারা নিতান্তই মানসম্মানের ভয়ে পালিয়েছে।

মানসম্মানের ভয়ে?

জেফরি জানতে পেরেছে মিনা আপা নামের ভদ্রমহিলা বিউটি পার্লারের ব্যবসা করতো, তবে এর আড়ালে দেহব্যবসাই ছিলো তার মূল ব্যবসা। গ্রেফতার হওয়া চার মেয়ে পুলিশকে এ তথ্য দিয়েছে। তবে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তারা দিয়েছে : দুটো গুলির শব্দ শুনেছে তারা। গুলির শব্দ শুনেই ভয়ে যার যার রুমের দরজা লক করে দিয়েছিলো।

ঠিক আছে, একজন দেহব্যবসায়ী মহিলা খুন হয়েছে। মোট চারটা গুলি করা হয়েছে অথচ গুলির শব্দ শোনা গেছে মাত্র দুটি!

জেফরি বেগকে পুলিশ নিশ্চিত করেছে, শুধু মেয়েরাই নয়, অ্যাপার্টমেন্টের অন্য বাসিন্দারাও দুটোর বেশি গুলির শব্দ শোনে নি। এমনকি অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে এক পান দোকানিও জানিয়েছে সে দুটো গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।

চমৎকার!

আবারো সাইলেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে?

অবশ্যই।

সবচাইতে মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে অ্যাপার্টমেন্টের কিছু বাসিন্দা আর রাস্তার লোকজনের কাছ থেকে : গুলির পর পরই তারা নাকি এক যুবক আর এক যুবতাঁকে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। যুবকের হাতে পিস্তল ছিলো। পিস্তলটার নল অস্বাভাবিক রকমের বড়।

সাইলেন্সার!

তাহলে কি উত্তরার হোটেলে লেডি গিয়াস আর এই মহিলার খুন একই ব্যক্তির কাজ?

জেফরি নিশ্চিত, দুটো খুন একজনই করেছে। এটা কাকতালীয় হতে পারে না। দুটো খুনের মধ্যে সময়ের ব্যবধানটাও বেশ চোখে পড়ার মতো। উত্তরার পিং সিটি হোটেলে খুন করেই খুনি চলে যায় শান্তি নগরে। হোটেল থেকে সে এক মেয়েকে নিয়ে বের হয়। শান্তি নগরেও সেই মেয়েটি ছিলো তার সাথে।

এই মেয়েটি কে?

মিনা আপা নামের যে মহিলা খুন হয়েছে সে পতিতা-ব্যবসার সাথে জড়িত। তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে চারজন মেয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। শান্তি নগর থানার ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক এখানেই আছে, ইন্সপেক্টরকে ডাকলো জেফরি।

"মেয়েগুলো কোথায়?"

"স্যার, পাশের ঘরে আছে। লাশ নিয়ে যাবার পর তাদেরকে থানায় নিয়ে যাবো।"

"আমি তাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই।"

চারটা মেয়ে বসে আছে একটা বিছানার উপর। সবাই ওড়না দিয়ে যতোটা সম্ভব নিজেদের মুখ ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে। শান্তিনগর থানার ইন্সপেক্টর মেয়েগুলোকে বলে দিয়েছে উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা তাদেরকে কিছু প্রশ্ন করবে, ঠিক ঠিক যেনো উত্তর দেয়া হয়। উল্টাপাল্টা কিছু বললে ভালো হবে না।

"তোমার নাম কি?" চারজনের মধ্যে যে মেয়েটি মাথা উঁচু করে রেখেছে তাকে বললো জেফরি। বাকিরা মাথা কুটে মারা যাচ্ছে যেনো।

"শর্মিলি," ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো সে।

"তোমার পাশের জন?" শর্মিলি নামের মেয়েটির গা ঘেষে অল্প বয়সী এক মেয়েকে দেখিয়ে বললো জেফরি।

"ওর নাম রোজিনা।"

"আর বাকি দু'জনের?"।

"এর নাম শাবনূর, বিছানার পেছনে গুটিসুটি মেরে বসে থাকা দু'জন মেয়েকে দেখিয়ে বললো। "আর এ হইলো পপি।"

"তোমরা এখানে কতো দিন ধরে আছো?"

"আমি আছি দুই বৎসর ধইরা, জেফরির দিকে চোখ নাচিয়ে বললো শর্মিলি নামের মেয়েটি। রোজিনা এক বৎসর ধইরা...না, আট-নয় মাস অইবো। আর এরা," পেছনের মেয়ে দুটোকে দেখিয়ে বললো, "তিন-চাইর মাস হইবো।"

"তাহলে তুমি এখানে সবচেয়ে পুরনো?"

"হুম।"

"লেখাপড়া কতো দূর করেছো?"

শর্মিলি নামের মেয়েটি একটু অবাক হলো। এই লোক কি পুলিশের লোক? তার বিশ্বাস হচ্ছে না। পুলিশ কখনও তাদের মতো মেয়েদের সাথে ভালো ব্যবহার করে না। এই লোক তো দেখি তার পড়াশোনার কথা জানতে চাইছে। "ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়ছি...পরীক্ষা দিতে পারি নাই।"

"তাহলে তো পড়াশোনা ভালোই করেছো," একটু থেমে আবার বললো, "বাকিরাও কি তোমার মতো লেখাপড়া জানে?"

"খালি একজন আমার চায়া বেশি...পপি...ডিগ্রি পাস...রোজিনা মেট্রিক ফেল...আর ওরা কেউই এইট-নাইনের বেশি না।"

"মিনা আপা খুন হবার আগে আরো কয়েকজন ছিলো এখানে, তাই না?" মাথা নেড়ে সায় দিলো শর্মিলি। "তারা কারা?"

"ডলি আর তিনি...পলাইছে।"

"এই ছয়জনই ছিলো?"

"হ।"

"আর কেউ ছিলো না? ঠিক করে বলো?...আমরা একজনকে গ্রেফতার করেছি, সে লেডি গিয়াস নামের একজনের সাথে ছিলো।"

শর্মিলি চুপ মেরে গেলো।

"ঐ মেয়েটি বলেছে সেও এখানেই থাকতো..." টোপ দিলো জেফরি। এখন অপেক্ষা বঁড়শি গেলে কিনা।

"সে এখানে থাকতো না, মিছা কথা কইছে।"

"তাহলে কোথায় থাকতো?"

"আপনে সুবর্ণার কথা কইতাছেন তো?" মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি বেগ। "ঐ মাইয়া এই লাইনে নতুন...এখানে সে থাকে না। কাইল গিয়াস ভায়ের সাথে গেছিলো।"

আচ্ছা! তাহলে তুমি গিয়াসকেও চেনো। মুচকি হাসলো জেফরি। "ঐ মেয়েটার আসল নাম কি?"

শর্মিল চেয়ে রইলো জেফরির দিকে।

"আমি জানি তোমাদের কেউই আসল নাম বলো নি...ঐ মেয়েটার আসল নাম বলো।"

"উমা...হিন্দু মাইয়া।"

"কোথায় থাকে?"

"রামপুরায়।"

"তুমি তার বাসা চেনো?"

"না। খালি জানি রামপুরায় থাকে...আপার বিউটি পার্লারে কাম করতো।"

"তাহলে কার কাছ থেকে ঐ মেয়েটার ঠিকানা জানা যাবে?"

"বিউটি পার্লারের ইনচার্জ হাবিব ভাই কইতে পারবো।"

"ভালো," কথাটা বলেই জেফরি তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শান্তি নগর থানার ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরলো। "আপনি বিউটি পালারে গিয়ে ঐ হাবিব লোকটাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যান। আমি আসছি।"

"স্যার?" শর্মিলি জেফরিকে বললো। "আমাগো অ্যারেস্ট কইরা কি হইবো...আমরা তো এইসব খুনখারাবির মইদ্যে নাই। আমাগো ছাইড়া দেন।"

"তোমরা ছাড়া পেয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে পুলিশকে সব ধরণের সহযোগীতা করতে হবে, সেটা যদি করো তাহলে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। লাভই হবে। আমি বলবো তোমাদেরকে ছেড়ে দিতে।"

"কন, স্যার, কি করতে হইবো?"

"তোমার মোবাইল ফোন আছে না?"

শর্মিলি তার কামিজের গলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা মোবাইল ফোন বের করলো। নিজের ভরাট স্তনের অনেকটা অংশ যে উন্মোচিত করে ফেলছে সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

"এখান থেকে মিনা আপনার ফোন নাম্বারটা বের করে দাও।"

শর্মিলি নামের মেয়েটি বেশ চটপটে। মিনা আপার ফোন নাম্বার বের করে দিলে জেফরি সেটা নোটবুকে টুকে রাখলো।

“লেডি গিয়াসের ব্যাপারে তোমরা কতোটুকু জানো?”

শূর্মিল একটু ঢোক গিললো। “স্যার, হেরা তো মানুষ ভালা না। সন্ত্রাসী। আমরা তেমন কিছু জানি না। আমাগো জানতেও দেয় না। কিছু জিগাইলে ধমক দিতো। মাজেমইদ্যে ইন্ডিয়া থেইকা আইলে এইহানে আসে গিয়াস ভাই।”

“মিনা আপার সাথে তার কি সম্পর্ক?”

“ওরা দেবর-ভাবি।”

অবাক হলো জেফরি। “দেবর-ভাবি?”

“মিনা আপার স্বামীরে সে ভাই বইলা ডাকে।”

“মিনা আপার স্বামী কে?”

“ব্ল্যাক রঞ্জু।”

“কি!”

রামপুরা ব্রিজের কাছে উমাকে নামিয়ে দিয়ে বাস্টার্ড চলে গেলো কাছের একটা পেট্রলপাম্পে। তার গাড়িতে সামান্য তেল আছে। এ দিয়ে খুব বেশি পথ যেতে পারবে না। যে ডাক্তারের কাছে সে যাবে সে থাকে কেরাণীগঞ্জে। অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। গুলির কেস, সুতরাং পরিচিত আর নির্ভরযোগ্য ডাক্তারের কাছেই যেতে হবে।

সকালের এই সময়ে পেট্রলপাম্পে খুব একটা ভীড় নেই। তার সামনে একটা গাড়িতে তেল ভরা হচ্ছে। সেই গাড়ির পেছনে গিয়ে সিরিয়াল নিলো। গাড়ি থেকে বের হয়ে অয়েল-ট্যাঙ্কটার মুখ খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। এই গাড়িটা সিএনজি'তে চলে না। ফলে তার সুবিধাই হয়েছে। আজকাল সিএনজি'র জন্য দীর্ঘ লাইন দিতে হয়, অতো সময় তার হাতে নেই।

এখান থেকে কোথায় যাবে ভেবে নিলো। গাড়ির বুটে এখনও গলফ ব্যাগটা আছে। প্রায় দু'কোটি টাকা! এতোগুলো টাকা দেখে কিছুক্ষণের জন্য তার মনে হয়েছিলো ব্ল্যাক রঞ্জুর পেছনে ছোটার দরকার নেই। এই পরিমাণ টাকা নিয়ে বাকি জীবনটা বেশ ভালোভাবেই কাটিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু এটা হবে কাপুরুষের মতো কাজ। বেঈমানি করা তার রক্তে নেই। কন্ট্রাক্টটা ভালোভাবে শেষ করবে সে। এটা এক ধরণের পেশাদারিত্ব। এক ধরণের চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া তার ট্রাস্টিকে সে ছোটো করতে পারবে না। অন্তত তার জন্যে হলেও কাজটা করতে হবে তাকে।

উমা নামের মেয়েটি তার মায়ের কাল্পনিক স্মৃতি উসকে দিয়েছে। হয়তো তার মাও অল্প বয়সে এভাবে এ লাইনে...।

আর ভাবতে পারলো না। মা সম্পর্কে অনেক খারাপ কথা শুনেছে এ জীবনে, তারপরও তার মনের গহীনে মাকে নিয়ে প্রচণ্ড আবেগ কাজ করে। যদিও সেটা কখনও প্রকাশ হয় নি। প্রকাশ হবার মতো পরিস্থিতি কখনও তার জীবনে আসে নি। অন্তত গতকালের আগে!

"স্যার, কয় লিটার?"

কণ্ঠটা তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলো। ব্যারেল হাতে ছেলেটা চেয়ে আছে তার দিকে।

"চল্লিশ।"

খ্যাচ করে তার ঠিক পেছনেই একটা গাড়ি ব্রেক করলে পাশ ফিরে তাকালো সে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলো তার গায়ের পশম।

পুলিশ!

***

শান্তি নগর থেকে কাজ শেষে করে বেইলি রোডে অবস্থিত হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে ফিরে এলো জেফরি বেগ। অল্প একটু পথ, তাই হেঁটেই এসেছে।

মিনা আপার বিউটি পার্লারের ইনচার্জ হাবিব মিয়াকে জেরা করে বেশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে সে। লোকটা উমা রাজবংশী নামের এক মেয়ের ঠিকানা দিয়েছে। রামপুরা থানার পুলিশ হয়তো এতোক্ষণে মেয়েটাকে গ্রেফতারও করে ফেলেছে।

তবে জেফরি খুব খুশি যে তার হাতে প্রচুর তথ্য আছে এখন। এসব তথ্য জোড়া লাগিয়ে, ঠিকমতো সাজিয়ে নিতে পারলে, একটার সঙ্গে আরেকটার সঠিক কানেকশান খুঁজে বের করতে পারলে এই কেসে অনেক অগ্রগতি হবে।

নিজের রুমে বসে আছে এখন, সামনে বসে আছে তার সহকারী জামান।

"মিনা আপা হলো রঞ্জুর স্ত্রী, আপন মনে বললো জেফরি বেগ। "দ্বিতীয় স্ত্রী।"

"প্রথম স্ত্রীকে ব্ল্যাক রঞ্জু নিজের হাতে খুন করেছে, স্যার। আট বছর আগে," জামান যোগ করলো। "খবরটা পত্রিকায় এসেছিলো। পুরনো ঢাকার এক নামকরা রেস্তোরাঁর সামনে প্রকাশ্যে নিজের স্ত্রীকে হত্যা করে সে।"

কথাটা শুনে একটু ভেবে জেফরি বললো, "ব্ল্যাক রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী লেডি গিয়াস খুন হলো উত্তরায়, একটি হোটেলে...তার বর্তমান স্ত্রী খুন হলো নিজের অ্যাপার্টমেন্টে...খুনির সাথে এমন এক মেয়ে ছিলো যেকিনা রঞ্জুর স্ত্রীর বিউটি পার্লারে কাজ করতো, গতকালই

দেহব্যবসায় নাম লিখিয়েছে। মেয়েটা লেডি গিয়াসের সাথে ছিলো। আবার খুনির সাথেও তাকে দেখা গেছে। অদ্ভুত!"

"স্যার, মেয়েটা কোনো এক পক্ষের হয়ে কাজ করেছে," জামান নিজের মতামত জানলো। মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। হয়তো রঞ্জুর দলের ভেতর কোনো কোন্দল সৃষ্টি হয়েছে।"

"হতে পারে।" কথাটা বলেই জেফরি উদাস হয়ে গেলে জামানও চুপ মেরে রইলো। তার বসের চিন্তায় কোনো ছেদ ঘটাতে চাইলো না সে।

"খুনির কাছে লেডি গিয়াস আর রঞ্জুর স্ত্রীর মোবাইল ফোন আছে।" অনেকক্ষণ পর আস্তে করে বললো ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ। "আমরা এগুলো দিয়ে ট্র্যাক-ডাউন করতে পারি।"

"আমিও সেটাই ভাবছিলাম, স্যার," জামান বললো।

"তবে কাজটা একটু অন্যভাবে করতে হবে।"

"কিভাবে, স্যার?"

"মিনা, মানে রঞ্জুর স্ত্রীর ফোন নাম্বার আমাদের কাছে আছে, আমি নিশ্চিত লেডি গিয়াস ঐ নাম্বারে ফোন করেছিলো। আমি চাই, আগে সেটা বের করতে।"

"তা করা যাবে, স্যার," জামান আগ্রহী হয়ে উঠলো। "রঞ্জুর স্ত্রীর ফোনটা পোস্ট-পেইড, সুতরাং কললিস্ট সেভ করা থাকবে। ফোন কোম্পানিকে বললেই তারা জানিয়ে দেবে ঐ নাম্বারে গতকাল কোন কোন নাম্বার থেকে ফোন করা হয়েছে। সেইসব নাম্বারগুলো ফোন কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন থেকে চেক করে দেখা যাবে ওগুলো কাদের নাম্বার। সন্দেহজনক নাম্বারটা খুব সহজেই বের করা যাবে মনে হয়।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। "তুমি নাম্বারটা নিয়ে কাজ শুরু করে দাও, আর কমিউনিকেশন রুমকে বলো আমি কিছুক্ষণ পর আসছি। সাবের কামাল যেনো রিপোর্ট নিয়ে ওখানে চলে আসে।"

"ঠিক আছে, স্যার।" জামান রুম থেকে চলে গেলো।

উমা বাড়িতে ফিরে দেখলো তার জন্য তার শয্যাসায়ী বাবা আর পিসি চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে। তার মা এখনও হাসপাতালে। গতকাল বিকেলে শেষ দেখে এসেছিলো, তারপর আর যেতে পারে নি। এরইমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। কতো ঘটনা ঘটেছে তা পুরোপুরি মনেও করতে পারলো না। বলতে গেলে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এসেছে সে।

অজ্ঞাত খুনি তাকে কেন রেহাই দিয়েছে আন্দাজ করতে পেরেছে। জ্বরের ঘোরে লোকটা আবোল তাবোল অনেক কথাই বলেছে। তা থেকে উমা বুঝতে পেরেছে খুনির মা খুব সম্ভবত বেশ্যা ছিলো। হয়তো নিজের মায়ের কথা ভেবে উমাকে এ যাত্রায় শুধু ছেড়েই দেয় নি সেইসাথে দুই লাখ টাকাও দিয়েছে। খুনির এমন বিপরীত আচরণে উমা বিস্মিত হয়েছে তবে তারচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ নিজের প্রাণটা নিয়ে ফিরে আসার জন্য।

বাবাকে বলে গেছিলো বড় লোকের এক বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে, কনেকে সহ আরো অনেককে সাজাতে হবে। সারা রাত লেগে যাবে। ফিরবে সকালে। তারা যেনো কোনো চিন্তা না করে। বেশ ভালো টাকা দেবে তাই এই বাড়তি কাজটা নিয়েছে। বিউটি পার্লারে কাজ করে বলে তার বাবার কাছে কথাটা বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়েছে, তবে তার বিধবা পিসি-যে কিনা তার বাবাকে দেখাশোনা করে থাকে-তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না।

অজ্ঞাত খুনি তাকে টাকা দিয়ে বলেছে যতো দ্রুত সম্ভব জায়গা বদল করতে, এই ব্যাপারটা নিয়েই সে উদ্বিগ্ন এখন। এই শহরে হুট করে কোথাও ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে দু'লাখ টাকা হাতে থাকাতে মনে হচ্ছে চেষ্টা করলে সেটা সম্ভব হলেও হতে পারে। মায়ের অসুখের জন্য যে টাকার দরকার সেটা নিয়ে আর ভাবনা নেই তবে নতুন একটি চিন্তা যোগ হয়েছে। তাকে দ্রুত। এই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। কিন্তু পিসি আর বাবাকে বোঝাবে কিভাবে? কী বলবে তাদেরকে? মিথ্যে কথা বলায় তেমন পারদর্শি নয় সে। মিথ্যে বলতে গেলে ছোটো বাচ্চাদের মতো তোতলাতে থাকে। নিজের কাছে কেমন জানি অপরাধি মনে হয়। তার এই স্বভাবটা সে পেয়েছে বাবার কাছ থেকে। তার বাবা সারা জীবনে মিথ্যে বলে নি -অন্তত পরিচিত লোকজন আর আত্মীয়স্বজন এইরকমটিই বলে থাকে।

কিন্তু উমা জানে তাকে মিথ্যে বলতে হবে। অনেক মিথ্যে। তা না হলে ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে যাবে।

ঠিক করলো স্নান করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধীরেসুস্থে পিসিকে কথাটা বলবে। এই ফাঁকে মিথ্যে একটা গল্প সাজিয়ে নিতে পারবে সে।

ঘরে বসে যখন এসব ভাবছে তখন তার পিসি দরজার কাছে এসে বললো, "কিছু খাবি?"

"না। আমি খেয়ে এসেছি।"

"হাসপাতালে যাবি কখন?"

"এই তো পিসি, স্নান করে যাবো।"

"তাহলে স্নান করে নে।" পিসি তাকে তাড়া দিয়ে চলে গেলো নিজের কাজে।

উত্তর রামপুরার এক সরু গলির শেষ মাথায় তাদের বাড়িটা। আজ অনেক দিন ধরে এখানে ভাড়া থাকে। দুটো মাত্র ঘর। কোনোমতে চলে যায়। চারদিকে পাকা দেয়াল মাথার উপরে টিনের ছাদ। এটাই উমাদের ছোট্ট সংসার। এখন যে ঘরে বসে আছে তার ঠিক পাশের ঘরেই তার বাবা থাকে। বিছানায় পড়ে থাকে আর কি। বাথরুম আর রান্নাঘর তিন ভাড়াটে পরিবার মিলে ব্যবহার করে। স্নান করার জন্য বাথরুমের সামনে এসে দেখতে পেলো লোক আছে ভেতরে। বাথরুমের সামনেই দাঁড়িয়ে রইলো। একটু আনমনা হয়ে ভাবতে লাগলো গতরাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত যেসব ঘটনা ঘটে গেছে।

খুনি লোকটার নাম নেই। তা কি করে হয়! তাকে আসলে বলে নি। বলতে চায় নি। খুনি হলেও লোকটার চোখ দুটো বেশ সুন্দর, তবে রেগে গেলে সেই চোখ দিয়ে যেনো শীতল আগুন বের হয়। উমা সেই আগুন দেখেছে। কী ভয়ঙ্কর হিংস্রতায় সে খুনখারাবি করতে

পারে ভাবাই যায় না! তবে লোকটার প্রতি তার এক ধরণের মায়া জন্মে গেছে। তার প্রতিও লোকটার মায়া জন্মে থাকবে হয়তো। নাকি করুণা? সে জানে না।

তবে আশ্চর্যের বিষয় লোকটার চোখ ছাড়া পুরো চেহারাটা স্মরণ করতে পারছে না এখন। গুলিয়ে ফেলছে। কেমন জানি দেখতে? বার বার শুধু চোখ দুটো ভেসে আসছে। পুরো চেহারাটা নয়।

আজব!

উমা খুব অবাক হলো। এই আগন্তুকের সাথে কাল রাত থেকে একটু আগে পর্যন্ত থেকেছে অথচ তার চেহারাটা মনে করতে পারছে না! বুঝতে পারলো তার মনের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তার জন্যেই হয়তো এমনটি হচ্ছে। এটাকে কী বলে? যে চোখের সামনে নেই তাকে দেখা গেলে বলে দৃষ্টিবিভ্রম। কিন্তু একটু আগের দেখা কাউকে স্মরণ করতে না পারাকে কি বলে?

হঠাৎ তার চোখের সামনে লোকটার চেহারা ভেসে উঠলো। এই তো! মনে পড়েছে তার। পরক্ষণেই বুঝতে পারলো সে আসলে অজ্ঞাত সেই খুনির দিকেই চেয়ে আছে।

এটা কোনো দৃষ্টিবিভ্রম নয়!

হায় ভগবান!

কমিউনিকেশন রুমে বসে আছে ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ। সে নিশ্চিত দুটো খুন একজনই করেছে! পেশাদার কেউই হবে। বেশ সতর্ক।

সম্ভবত খুনির কাছে ব্ল্যাক রঞ্জুর স্ত্রী আর লেডি গিয়াসের মোবাইল ফোন আছে। তারা এখন জেনে গেছে রঞ্জুর স্ত্রীর ফোন নাম্বারটা। জামান চেক করে দেখছে সেই নাম্বারে বিগত চব্বিশ ঘণ্টায় কে কে ফোন করেছিলো। মহিলার নাম্বার থেকে লেডি গিয়াসের নাম্বারটাও জেনে নিতে পারবে তারা। ভাগ্য ভালো থাকলে খুনির অবস্থানও জানা যাবে এভাবে।

কাজ বেশ দ্রুত গতিতেই এগোচ্ছে। রামপুরা থানার একটি টিম চলে গেছে উমা রাজবংশী নামের সেই মেয়েটিকে গ্রেফতার করার জন্য। এই মেয়েটি খুনির সাথে ছিলো, এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত। মেয়েটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা গেলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যাবে। জেফরি আশা করছে খুব জলদি খুনিকে চিহ্নিত করতে পারবে তারা।

দরজা খোলার শব্দ শুনে দেখলো জামান বেশ উৎফুল্ল হয়ে ঘরে ঢুকছে। তার মানে ভালো খবর আছে। আশান্বিত হয়ে উঠলো জেফরি।

"স্যার, মিনা নামের মহিলার ফোনে বিগত চব্বিশ ঘণ্টায় সমস্ত ইনকামিং আর আউট গোয়িং কলের লিস্ট পাওয়া গেছে।"

"গুড।"

"মহিলা খুন হবার ঘন্টাখানেক আগে একটি কল করে এই নাম্বারে, জামান কাছে এসে হাতের একটি কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে জেফরিকে দেখালো। "এই নাম্বারটার পজিশন তখন ছিলো উত্তরায়...পিং সিটি হোটেলের কাছের একটি সেল-টাওয়ার...আমি নিশ্চিত, এটাই লেডি গিয়াসের নাম্বার।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। তার চোখ এখন কল-লিস্টের দিকে।

"স্যার, বিগত চব্বিশ ঘণ্টায় মহিলার ফোনে ইনকামিং কল এসেছে মোট এগারোটি। এরমধ্যে একটা ওভারসিস কল... ইন্ডিয়া থেকে... কোলকাতার একটি নাম্বার। বাকিগুলো পার্লারের ইনচার্জ, মহিলার ড্রাইভার আর লেডি গিয়াসের।"

"ইন্ডিয়ার কলটা খুব সম্ভবত ব্ল্যাক রঞ্জুর, কাগজে চোখ বুলাতে বুলাতে বললো জেফরি।

মাথা নেড়ে সায় দিলো জামান। "পার্লারের ইনচার্জকে ফোন করা হয়েছে দু'বার," যোগ করলো জামান।

লেডি গিয়াসের নাম্বার বলে যেটাকে সাসপেক্ট করছে সেটার খোঁজ নিয়েছো?" জানতে চাইলো জেফরি।

'জি, স্যার।" আরেকটা কাগজ বাড়িয়ে দিলো জেফরির দিকে। "এই নাম্বার থেকে মোট ছয়টি কল করা হয়েছে। রঞ্জুর স্ত্রীর নম্বারে করা হয়েছে তিন বার। মজার ব্যাপার হলো, খুন করার কিছুক্ষণ আগে...উমমম, সাত মিনিট আগে মহিলাকে ফোন করা হয়। অথচ তখন লেডি গিয়াস খুন হয়ে গেছে।"

"ধরে নাও ওটা খুনিই করেছে," কাগজ থেকে চোখ তুলে বললো জেফরি বেগ।

"লেডি গিয়াসের ফোনে একটা নাম্বার থেকে দু'বার কল করা হয়েছে...লাল কালি দিয়ে সেটা আন্ডারলাইন করা আছে, স্যার।"

"এই নাম্বারটার পজিশন কোথায় ছিলো জানতে পেরেছো?"

"সবগুলো চেক করে দেখতে হলে কমপক্ষে দু'ঘণ্টা সময় লাগবে। আপনি বললে আমি চেক করে দেখতে পারবো।"

"আচ্ছা, এটা পরে দেখা যাবে...লেডি গিয়াসের ফোন নাম্বারটা কি এখনও ওপেন আছে?"

জেফরি এটা জামানকে বলে নি তারপরেও তার অনুমাণ তার এই সহকারী খুব সম্ভবত সেটা জেনে নিয়েছে। একজন ইনভেস্টিগেটরকে সব কিছু বলে না দিলেও অনেক কিছু নিজ থেকে করতে হয়। জামান ছেলেটার মধ্যে সেই গুন আছে।

"জি, স্যার। লেডি গিয়াসের ফোনটা ওপেন আছে। রঞ্জুর স্ত্রীরটা বন্ধ।"

“ঠিক আছে, লেডি গিয়াসের নাম্বারটার বর্তমান পজিশন বের করো।”

জামান কমিউনিকেশন রুমের প্যানেলের সারি সারি কম্পিউটার আর সুইচবোর্ডের সামনে বসে গেলো। কিছুক্ষণ কিবোর্ডে আঙুল চালিয়ে পেছন ফিরে বললো, “স্যার, ফিশিং করবো?”

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি।

এই ফিশিং-এর মানে হলো লেডি গিয়াসের নাম্বারটা যে ফোন কোম্পানির এখন সেই কোম্পানির পক্ষ থেকে একটি সার্ভিস মেসেজ পাঠানো হবে। এ কাজ করার অথরিটি তাদের আছে। ফোন কোম্পানিগুলোর সাথে সহযোগীতার মাধ্যমেই এটা করা হয়। প্রতিটি ফোন কোম্পানিই তার গ্রাহকদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে মেসেজ পাঠিয়ে থাকে মাঝেমধ্যে। এরকমই একটি ভুয়া মেসেজ পাঠানো হবে লেডি গিয়াসের নাম্বারে। মেসেজ রিসিভ করার দরকার হবে না। সেন্ট হয়ে গেলেই তাদের স্টেট অব আর্ট জিপিএস মডেমে ধরা পড়বে লেডি গিয়াসের ফোনটি এই মুহূর্তে কোথায় আছে। ফোন কোম্পানির চেয়েও তারা অনেক নিখুঁতভাবে অবস্থান বের করতে পারে। তাদের কম্পিউটারে ঢাকা শহরের ভার্চুয়াল ম্যাপ রয়েছে। একেবারে নিখুঁত একটি ম্যাপ। লক্ষ-লক্ষ হোল্ডিং নাম্বার আর পথঘাটের থ্রি-ডি মানচিত্র। তারা শুধু সবচাইতে কাছের সেল-টাওয়ারই চিহ্নিত করতে পারবে না বরং ফ্রিকোয়েন্সির সূক্ষ্ম তারতম্য অনুসারে সঠিকভাবে জানতে পারবে ঠিক কোথায় ফোন ব্যবহারকারী অবস্থান করছে।

তাদের কাছে থাকা অনেকগুলো মেসেজ থেকে একটা মেসেজ পাঠানো হলো : বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস উপলক্ষ্যে একটি জনসচেতনতামূলক বার্তা!

এবার প্যানেলের সামনে ছাপান্ন ইঞ্চির এলসিডি মনিটরে ঢাকা শহরের মানচিত্রটা ভেসে উঠলো। পাঁচ সেকেন্ড পরই ডিটেক্ট করা যাবে গ্রাহক-ফোনের অবস্থান।

স্ক্রিনের একপাশে লাল রঙের একটি ছোট্ট আলোক বিন্দু ব্লিপ করলে জামান পেছন ফিরে তাকালো। “স্যার, রামপুরায়!”

উমা একেবারে হকচকিয়ে যায়। তার বাড়ির আঙিনায় এসে পড়েছে অজ্ঞাত খুনি! এই লোকটাই কিছুক্ষণ আগে তাকে প্রাণে না মেরে দুই লক্ষ টাকা দিয়ে দিয়েছিলো। এখন আবার কী মনে করে তার বাড়িতে এসেছে। তাহলে তার পেছন পেছন বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করেছে তাকে?

"আপনি!" অস্ফুটভাবে কথাটা বলতে পেরেছিলো সে।

এমন সময় মোবাইল ফোনের বিপ হলে প্যান্টের পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করে বাস্টার্ড। ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের কেউ ফোন করবে এই আশায় চালু রেখেছিলো লেডি গিয়াসের ফোনটা। ডিসপ্লের দিকে তাকায় সে।

একটা মেসেজ! ওপেন করে দেখে :

আজ বিশ্ব মাতৃ দুগ্ধ দিবস...

বিরক্ত হয়ে ফোনসেটটা আবার পকেটে রেখে দেয়।

"জলদি, এখান থেকে চলে যেতে হবে!" উমাকে তাড়া দিয়ে বলে সে। "পুলিশ আসছে..."

"পুলিশ!" আৎকে ওঠে উমা।

বাস্টার্ড তার হাতটা ধরে বলে, "চলো।"

উমার মাথা ঘুরতে শুরু করে। "কোথায়?"

"আগে এখান থেকে পালাতে হবে... আসো!" হাত ধরে টান দেয় সে।

"আমার বাবা... পিসি...?"

"পুলিশ তাদেরকে ধরতে আসে নি... তোমাকে ধরতে এসেছে। আসো!"

উমার হাতটা ধরে টেনে তাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। সাদা রঙের গাড়িটা পার্ক করা ছিলো তাদের বাড়ির গেটের কাছে। গাড়িতে ওঠার আগে বাস্টার্ড চেয়ে দেখে মেইন রোড থেকে পুলিশের একটা জিপ গলিতে ঢুকছে।

আর দেরি করে নি, গাড়িতে উঠেই গলির ভেতরের দিকে ছুটে চলে সে। এই গলিটা ভালো করে চেনে না। এখান থেকে কোথায় যাওয়া যাবে সেটাও বুঝতে পারে না। শুধু জানে পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে হবে তাকে।

"এই গলিটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়, জানো?" উমা তখনও ধাতস্থ হতে পারে নি। মাথা দোলায় সে। জানে না।

বাস্টার্ড চিন্তায় পড়ে যায়। সরু গলি দিয়ে খুব বেশি স্পিডে যেতে পারছিলো না। তবে পুলিশের গাড়িটা তাদের পিছু নেয় নি। ওটার গন্তব্য যে উমাদের বাড়ি সেটা বাস্টার্ড জানতো।

সাপের মতো একেঁবেঁকে অনেকটা পথ পেরোনোর পর মেইন রোডে উঠে আসে তাদের গাড়িটা। হাফ ছেড়ে বাঁচে বাস্টার্ড। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দেয়।

উমা বুঝতে পারে না এই খুনি কিভাবে জানতে পারলো তার বাড়িতে পুলিশ আসছে। লোকটা তো তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছিলো!

রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে চকিতে উমাকে দেখে নেয় বাস্টার্ড। সেও বুঝতে পারে মেয়েটা কি ভাবছে।

"তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি সামনের এক পেট্রলপাম্পে গেছিলাম তেল ভরার জন্য..." সামনের দিকে চেয়ে বলে সে। "ওখানে যখন তেল ভরার জন্য অপেক্ষা করছিলাম তখনই পুলিশের গাড়িটা আসে পেট্রলপাম্পে...ভাগ্য ভালো যে ওদেরও তেল ভরার দরকার পড়েছিলো, তা না হলে যে কী হতো কে জানে!"

"কিন্তু আমার বাড়িতে আসছে সেটা বুঝলেন কী করে?" কাঁদো কাঁদো গলায় জানতে চেয়েছিলো উমা।

"জিপটা আমার গাড়ির পেছনেই ছিলো...পুলিশ অফিসার ওয়াকিটকিতে– কন্ট্রোলরুমের সাথে কথা বলছিলো জোরে জোরে...আমি সব শুনেছি।"

"আমার খোঁজ পেলো কি করে?"

চকিতে তাকায় মেয়েটার দিকে। "সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না!"

"আপনি নিশ্চিত, পুলিশ আমাকে খুঁজছে?" উমা তখনও বিশ্বাস করতে পারছিলো না ব্যাপারটা।

"হুম। উমা রাজবংশী... উত্তর-রামপুরা ...২৭/৩... আমি সেখান থেকেই তোমার বাড়ির ঠিকানাটা জেনেছি।"

কথাটা শুনে উমার চোখের পলক আর পড়ে না।

"সঙ্গে সঙ্গে আর দেরি না করে গড়িটা নিয়ে চলে আসি তোমার বাড়িতে...পুলিশের গাড়ির সিরিয়াল ছিলো আমার পরেই।"

"আমার বাবা, পিসি...তাদেরকে যদি পুলিশ ধরে?" আতঙ্কিত হয়ে জানতে চায় উমা।

গাড়িটা খুব দ্রুত গতিতে চলছে তাই মেয়েটার দিকে না তাকিয়ে বলে, "আমার মনে হয় না তাদেরকে কিছু করবে," একটু থেমে চকিতে আবারো তাকায় তার দিকে। "হয়তো তোমার কথা জানতে চাইবে... একটু জিজ্ঞাসাবাদ করবে..."

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে উমা। সে নিজে তো বিপদে পড়েছেই এখন তার বাবা আর পিসিকেও ঝামেলায় ফেলে দিয়েছে।

জেফরি বেগ নিশ্চিত খুনি মেয়েটাসহ মেয়েটার রামপুরার বাড়িতে গেছে। জিপিএস মডেমে ডিটেক্ট করার পর আর দেরি করে নি, জামানকে বলেছে রামপুরায় উমা রাজবংশী নামের মেয়েটির বাড়িতে পুলিশের যে দলটি গেছে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া, তারা যেনো আরো বেশি সতর্ক হয়ে বাড়িটাতে রেড দেয়। ঐ বাড়িতে সম্ভাব্য খুনি আছে!

জামান যখন পুলিশকে কথাটা জানালো তখন তারা উমাদের বাসার খুব কাছেই। কিন্তু জেফরিকে এক রাশ হতাশায় ডুবিয়ে টহলদলটি হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টকে জানায় ঐ বাড়ি থেকে তারা উমা কিংবা খুনি, কাউকেই গ্রেফতার করতে পারে নি। উমার শয্যাসায়ী বাবা আর বৃদ্ধ পিসি জানিয়েছে, গুলশানের এক বড়লোকের বিয়ে বাড়িতে উমা সাজাগোজের কাজে কাল সারারাত বাড়ির বাইরে ছিলো। সকালে, পুলিশ আসার একটু আগে, বাড়িতে আসে সে। স্নান করবার জন্যে বাথরুমেও গিয়েছিলো, কিন্তু তারপর সে কোথায় গেছে তারা কিছুই জানে না।

অদ্ভুত! পুলিশ আসার আগেই মেয়েটা টের পেয়ে গেলো!

উমার পিসি আরো জানিয়েছে, উমার সাথে আর কেউ ছিলো না। সে একদম একা বাড়িতে ফিরেছিলো।

তাহলে কি লেডি গিয়াসের ফোনটা উমার কাছে?

জেফরির তা মনে হয় নি। কিছুক্ষণ পর পুলিশ জানায় উমাদের প্রতিবেশি এক ভদ্রমহিলা নিজের ঘরের জানালা দিয়ে দেখেছে এক যুবক উমাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। কথাটা শোনার পর থেকে জেফরি কোনো হিসেব মেলাতে পারছে না।

ঐ খুনি কিভাবে জানলো, কোত্থেকে জানলো পুলিশ উমার বাড়িতে রেড দিতে যাচ্ছে?

বুঝতে পারলো গোলকধাঁধার মতো জটিল হয়ে উঠছে কেসটা। পুলিশের আগমনের পাঁচ মিনিট আগে খুনি উমাকে নিয়ে তার বাড়ি থেকে সটকে পড়েছে। জেফরি টের পেলো তার মেজাজ বিগড়ে গেছে। জামানকে উদ্দেশ্য করে বললো, "আরেকটা ফিশিং করো!"

জামান বুঝতে পারলো তার বসের মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। পেছনে না তাকিয়ে কাজ করতে শুরু করে দিলো সে। এবার পাঠালো বোনাস পাওয়া নিয়ে একটি মেসেজ। গ্রাহক কি করলে কতো বোনাস পাবে, এরজন্যে কি লিখে কতো নাম্বারে মেসেজ পাঠাতে হবে এরকম হাবিজাবি একটি মেসেজ। যেকোনো সেলফোন গ্রাহকের কাছে এটি খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয়। খুনি বুঝতে পারবে না তাকে আসলে ডিটেক্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ছাপান্ন ইঞ্চির এলসিডি স্ক্রিনে এবার যে ব্লিপটা হলো সেটা নির্দেশ করছে ফোনসেটটা এখন মালিবাগে আছে। এতো দ্রুত উত্তর রামপুরা থেকে এখানে চলে এলো কিভাবে!

"স্যার, আমার মনে হয় খুনি গাড়িতে করে" জামান তার কথাটা শেষ করতে পারলো না।

"পুলিশকে ইনফর্ম করো," চট করে বললো জেফরি। "ওদেরকে বলো, রামপুরা থেকে মালিবাগ পর্যন্ত সব কটি পয়েন্টে যতোগুলো টহল দল আছে সবাইকে জানিয়ে দিতে..." কথাটা বলেই থেমে গেলো সে। বুঝতে পারলে নির্দিষ্ট কোনো গাড়ির বর্ণনা কিংবা কোন ধরণের গাড়িতে করে যাচ্ছে সেটা উল্লেখ না করলে রাস্তাঘাটে টহল পুলিশ কোনোভাবেই গাড়ি থামিয়ে চেক করতে পারবে না।

চেয়ে দেখলো জামান পেছন ফিরে তার দিকে চেয়ে আছে। নিজেকে একটু বোকা বোকা লাগলো। "স্যার-" জামানকে হাত তুলে থামিয়ে দিলো।

"বুঝতে পেরেছি।" কথাটা বলেই গাল চুলকালো।

ঠিক এমন সময় রমিজ লস্কর ঢুকলো কমিউনিকেশন রুমে। জেফরির উদ্দেশ্যে সে বললো, "স্যার, পুরনো ঢাকার নাজিরা বাজারে একটা মার্ডার হয়েছে...এইমাত্র খবর পেলাম।"

জেফরি একটু অবাকই হলো। নাজিরা বাজারে খুন হয়েছে সে কথা বলার জন্য রমিজ লস্কর এভাবে ছুটে আসবে! কোনো খুন হলে সেটা স্থানীয় থানার বিষয়। তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ কন্ট্রোলরুমে জানায়। সেখান থেকে উর্ধতন কর্মকর্তারা গুরুত্ব বুঝে হোমিসাইড

ডিপার্টমেন্টকে ইনভেস্টিগেশন করতে বলে। রমিজ লস্কর এই খবর পেয়ে এভাবে ছুটে আসবে কেন—এরপরই জবাবটা পেলো সে।

"সুলতান নামের এক বিশ-বাইশ বছরের যুবক।" রমিজ তার কথা শেষ করলো। তার চোখেমুখে উত্তেজনা।

"এটা কি আমাদেরকে তদন্ত করতে বলা হয়েছে?" জেফরি জানতে চাইলো।

"এখনও সেরকম কোনো কিছু বলা হয় নি, স্যার।" রমিজের চোখেমুখে এখনও প্রবল উত্তেজনা।

"তাহলে এই খবরটা আমাদেরকে জানানোর মানে কী?"

"স্যার, এই সুলতান ছেলেটা ব্ল্যাক রঞ্জুর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী!"

বাস্টার্ডের গাড়িটা শহরের কোন জায়গায় আছে উমা সেটা বলতে পারবে না। বাবা-মা আর পিসির চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে সে। নিজের চেয়েও তাদেরকে নিয়েই বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। বিশাল কোনা ঝামেলায় পড়ে গেছে সে ব্যাপারে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো তার পাশে বসা অজ্ঞাত পরিচয়ের লোকটাকে নিয়ে তার মধ্যে কোনো ভয়ডর কাজ কচ্ছে না এখন।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলো জায়গাটা বেশ নিরিবিলি।

"আমরা এখন কোথায়?" জানতে চাইলো উমা।

"ইকুরিয়ায়।"

উমা কিছুই বুঝতে পারলো না। এ নামের কোনো জায়গার নাম সে কখনও শোনে নি। চারপাশটা ভালো করে চেয়ে দেখলো ঢাকা শহরের মতো মনে হচ্ছে না। আধা-গ্রাম আধা-শহর। তবে রাস্তাটা বেশ প্রশস্ত।

"বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে," তার চাহনি দেখে বাস্টার্ড বললো। "কেরাণীগঞ্জ।"

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

মেয়েটার দিকে তাকালো সে। "ডাক্তারের কাছে।"

"তারপর আমি কোথায় যাবো?"

"দেখি কী করা যায়।" একটু থেমে আবার বলতে লাগলো, "আমি জানতাম তোমার এরকম কোনো সমস্যা হবে, কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি হবে বুঝতে পারি নি।" একটু থেমে আবার বললো, "ভেবেছিলাম রঞ্জুর দল তোমার পেছনে লাগবে, পুলিশও দুয়েক দিনের মধ্যে তোমার খোঁজ করবে কিন্তু এখন তো দেখছি...!"

"আমি এখন কী করবো?" উমার কণ্ঠটা ধরে এলো।

উমার দিকে স্থির চোখে তাকালো সে। "আমার নিজের প্রয়োজনেই তোমাকে এসব থেকে দূরে রাখতে হবে।"

উমা কিছু বললো না।

"আমার এক পরিচিত লোকের কাছে তোমাকে রেখে দিতে পারি, বললো বাস্টার্ড।

"কিন্তু আমার বাবা আর পিসি? মা তো এখনও হাসপাতালে!" বাস্টার্ড কিছু বললো না। এটা আসলেই একটা সমস্যা। এই সমস্যাটা খুব সহজেই সমাধান করা যেতো কিন্তু সেই সহজ কাজটাই তার জন্যে কঠিন হয়ে গেছে মেয়েটার কারণে। মেয়েটা যদি তার সাথে এমন না করতো, যদি সে বৈরী আচরণ করতো তাহলে নির্দ্বিধায় তাকে খুন করতে পারতো...

"আপনি কি ঝামেলা মনে করলে আমাকেও খুন করবেন?" বাস্টার্ডের দিকে তাকিয়ে উমা বেশ শান্ত কণ্ঠে বললো।

একটু চমকে গেলো বাস্টার্ড। মেয়েটা কি তার মনের কথা পড়ে ফেলেছে! কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, "সেটা তো অনেক আগেই করতে পারতাম!"

একটু পর মেয়েটা আরো দৃঢ়ভাবে বললো, "আমি এভাবে পুলিশের কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে পারবো না।"

চকিতে তার দিকে তাকালো বাস্টার্ড। "টাকাগুলো কোথায়?"

প্রথমে বুঝতে পারলো না সে, তারপরই মনে পড়ে গেলো দু'লাখ টাকার কথা। এই লোকটাই তো তাকে টাকাগুলো দিয়েছিলো! স্নান করার আগে ওয়ার্ডরোবে কাপড়চোপড়ের ভাঁজে বান্ডিল দুটো রেখে দিয়েছিলো সে।

"আমার বাড়িতে।"

আলতো করে মাথা দোলালো বাস্টার্ড। "বাড়িতে তোমার পিসি আর বাবা আছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো উমা। "তোমার মা কোন্ হাসপাতালে?"

"হলি ফ্যামিলিতে।"

চিন্তায় পড়ে গেলো সে। মেয়েটার মা যদি হাসপাতালে না থাকতো তাহলে তার বাবা আর পিসিকে রামপুরা থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও রাখা যেতো। মাথাটা কাজ করছে না। কাঁধের

ব্যাথাটা তাকে সুস্থিরভাবে চিন্তাও করতে দিচ্ছে না।

“আগে ডাক্তার দেখাই, তারপর এটা নিয়ে ভাবা যাবে।”

“সুলতানকেও সাইলেন্সর পিস্তল দিয়ে খুন করা হয়েছে!” নাজিরাবাজারের আহলে হাদিস মসজিদের পাশে আলিমুদ্দীনের বাড়ি থেকে ফিরে এসে নিজের অফিসে বসে কথাটা বললো জেফরি বেগ। “আশেপাশের কেউ গুলির শব্দ শোনে নি।”

“স্যার, এক দিনে ব্ল্যাক রঞ্জুর তিনজন ঘনিষ্ঠ লোককে হত্যা করা হয়েছে,” বললো জামান। বসে আছে জেফরির সামনে। “মনে হয় রঞ্জুর দলের ভেতর বড় রকমের কোনো ফ্র্যাকশন হয়েছে।”

মাথা দোলালো জেফরি। কথাটা মেনে নিতে পারলো না সে। “ব্ল্যাক রঞ্জুর দলে এরকম কিছু ঘটে থাকলে পাল্টাপাল্টি আরো কিছু ঘটনা ঘটতো, তিন তিনটি খুনের পরও রঞ্জুর দলের কোনো তৎপরতা নেই।”

“ঘটনা তো মাত্র শুরু হয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যেই দেখবেন আরো কিছু খুনখারাবির ঘটনা ঘটে গেছে,” জামান বললো।

“তার মানে, আরো কিছু হত্যাকাণ্ড দেখতে হবে আমাদেরকে?”

মাথা নেড়ে সায় দিলো জামান।

“তার আগেই ব্যবস্থা নেয়ার দরকার।”

“স্যার, এরকম গ্যাংয়ের মধ্যে খুনাখুনি নতুন কিছু না। এরা এভাবে খুনাখুনি করে দুর্বল হলে আমাদের সবার জন্যেই ভালো।”

“এক দিক থেকে তোমার কথায় যুক্তি আছে, মানছি। কিন্তু ঘটনা যদি সেরকম কিছু না হয়ে থাকে?...মানে, আমরা তো এখনও জানি না এর পেছনে আসল কারণটা কি।”

জামান মাথা নেড়ে সায় দিলেও কিছু বললো না।

“একটা ব্যাপার খেয়াল করেছো?” সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকালো জামান। “রঞ্জুর তিনজন সহযোগী খুন হলো...তিনজনের মোবাইল ফোনই খুনি সাথে করে নিয়ে গেছে। অন্য কিছু না।”

একটু ভেবে জামান বললো, “খুনি হয়তো চায় নি মোবাইল ফোনগুলো পুলিশের হাতে পড়ুক। সে হয়তো মোবাইলে ফোন করেছিলো... তার নাম্বার হয়তো সেসব মোবাইলে আছে?”

“হয়তো!” একটু চুপ থেকে জেফরি বললো, “আমার কেন জানি মনে হচ্ছে খুনি একেবারে অজ্ঞাত কেউ... মানে রঞ্জুর দলের লোকজন তাকে চেনে না।”

“এটা কেন মনে হচ্ছে, স্যার?”

“প্রথম খুনটা হবার পর খুনি লেডি গিয়াসের রুম থেকে উমা নামের কলগার্লকে সাথে করে হোটেল থেকে বেরিয়ে যায়। কেন? ঐ মেয়েটাকে সাথে করেই সে চলে যায় রঞ্জুর স্ত্রীর অ্যাপার্টমেন্টে। কারণ...খুনি সম্ভবত রঞ্জুর দলের আস্তানা চিনতো না। তাই মেয়েটাকে ব্যবহার করেছে।”

“স্যার, এমনও তো হতে পারে, মেয়েটার সাথে আগে থেকেই খুনির সম্পর্ক ছিলো... মানে খুনির হয়ে কাজ করেছে?” জামান আগ্রহী হয়ে বললো।

‘না। তাই যদি হতো তাহলে মেয়েটাকে নিয়ে রঞ্জুর স্ত্রীর ওখানে যাবার কোনো দরকারই ছিলো না।”

“স্যার, রঞ্জুর স্ত্রীর অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার জন্যে মেয়েটাকে নিয়ে গেছে হয়তো।”

জামানের এ কথাটা জেফরির মনে ধরলো। মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। “তা হতে পারে।” একটু থেমে আবার বললো, “ভালো কথা, উমার একটা ছবি আর ফোন নাম্বার জোগাড় করার কথা বলেছিলাম, করেছো?” জেফরি বললো।

“উমা কোনো ফোন ব্যবহার করে না। ওর বাড়ির কেউও ফোন ব্যবহার করে না, স্যার। ওদের আর্থিক অবস্থা ভালো না। তবে বিউটি পার্লার থেকে কর্মচারিদের একটা গ্রুপ ছবি জোগাড় করেছে পুলিশ। সেটা থেকে সিঙ্গেল একটা ছবি তৈরি করা যাবে।”

"গুড," একটু ভেবে নিলো জেফরি বেগ। "উমাদের ফোন নেই, তাই না?" মাথা নেড়ে আবারো সায় দিলো জামান। "যাদের ফোন নেই তারা কি করে, জামান?"

জামান চট করে বললো, "স্যার, ফোন-ফ্যাক্সের দোকান থেকে ফোন করে।"

"আর তাদেরকে যদি কেউ ফোন করতে চায়, তখন?"

জামান ভাবতে লাগলো। "উমমম..."

"আশেপাশের কারো ফোন ব্যবহার করে। তাই না?"

"জি, স্যার।"

"তুমি উমার আশেপাশে ওর পরিচিত কয়েক জনের ফোন নাম্বার কৌশলে জোগাড় করার ব্যবস্থা করো। তারা যেনো বুঝতে না পারে, ঠিক আছে?"

"জি, স্যার।"

"আমি নিশ্চিত, মেয়েটা তার বাড়ির লোকজনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেই।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে, স্যার।"

"আচ্ছা, ভালো কথা, উমার বাড়ির আশেপাশে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে নতুন কিছু পেয়েছে?"

"একটা তথ্য পাওয়া গেছে, স্যার। উমার বাড়ির সামনে একটা সাদা রঙের প্রাইভেট কার দেখা গিয়েছিলো পুলিশ আসার কিছুক্ষণ আগে। সম্ভবত ওটাতে করেই তারা দু'জন পালিয়েছে।"

আশান্বিত হয়ে উঠলো জেফরি। "তাহলে তো ট্র্যাকডাউন করার কাজটা আবার করা যায়, নাকি?"

"তা করা যায়, কিন্তু গতকাল রাতে লাল রঙের গাড়ি ব্যবহার করেছিলো খুনি, আজ করছে সাদা রঙের গাড়ি। এখন আবার কী ব্যবহার করছে কে জানে।"

"চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি।"

আবারো একটা ফিশিং করে খুনির অবস্থান জেনে নেয়ার চেষ্টা করলো তারা। জেফরি বেগের চোখ বড় এলসিডি স্ক্রিনে নিবদ্ধ।

ভার্চুয়াল মানচিত্রে কিছু দেখা যাচ্ছে না এখন। ফিশিং করার পরও কোনো রেসপন্স নেই।

"স্যার, মোবাইল বন্ধ করে রাখা আছে হয়তো," জামান পেছন ফিরে বললো।

"কিংবা নেটওয়ার্কের সমস্যা, যোগ করলো জেফরি।

এমন সময় ডিপার্টমেন্টের রমিজ লস্কর কমিউনিকেশন রুমে ঢুকলো।

"স্যার, উত্তরার পিং সিটি হোটেলের ম্যানেজারকে নিয়ে আসা হয়েছে, ইন্টেরোগেশন রুমে রাখা হয়েছে তাকে।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো জেফরি। "জামান, তুমি সেলফোন কোম্পানিগুলোর সাথে যোগাযোগ করে আরো কিছু তথ্য জেনে নাও। কি জানতে হবে নিশ্চয় বুঝতে পারছো?"

"জি, স্যার।"

আর কিছু না বলে রুম থেকে বেরিয়ে গেলো জেফরি বেগ।

জিলানি ডাক্তারের চেম্বারটা কেরাণীগঞ্জের নারকেল বাগে অবস্থিত। বিশাল পৈতৃক বাড়ির সামনের অংশে তার ওষুধের দোকান। সেই দোকানের পেছনেই ছোটোখাটো একটি ডাক্তারি চেম্বার ছিলো এখন সেটাকে ক্লিনিকে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

জিলানি ডাক্তার নামে পরিচিত হলেও তার কোনো ডাক্তারি ডিগ্রি নেই। বহুকাল আগে, তরুণ জিলানি স্থানীয় ডাক্তার বৈদ্যনাথ আচার্যের অধীনে কম্পাউন্ডার হিসেবে কাজ শুরু করে, একাত্তর সালে পাকবাহিনীর হাতে বৈদ্যনাথ নিহত হলে বেকার হয়ে পড়ে জিলানি। কিন্তু বেশি দিন তাকে ঘরে বসে থাকতে হয় নি। চারদিকে যুদ্ধ। শতশত লোকের মৃত্যু হচ্ছে, আহত হচ্ছে তারচেয়েও বেশি। ডাক্তারের খুব প্রয়োজন অথচ ডাক্তার নেই। বেশিরভাগ ডাক্তার পালিয়ে চলে গেছে ইন্ডিয়ায়। যারা আছে তারাও ঢাকা শহর ছেড়ে অন্য কোথাও লুকিয়ে আছে।

এক রাতে স্থানীয় কিছু মুক্তিযোদ্ধা জিলানির বাড়িতে এসে হাজির হয়। তাদের দু'জন সঙ্গী গুলিবিদ্ধ হয়েছে। গুলি বের করতে হবে। কিন্তু আমি তো ডাক্তার নই। আমার কোনো ডিগ্রি নেই! তার দরকার নেই। গুলি বের করতে পারলেই হবে। ডিগ্রি দেখার সময় নেই। বের করতে পারবেন তো? অবশ্যই পারবো। পারবো না কেন! কম্পাউন্ডার হিসেবে তো কম কাজ করি নি!

ব্যস, জিলানি কম্পাউন্ডার হয়ে উঠলো জিলানি ডাক্তার। লোকজন তখন থেকেই তাকে ডাক্তার নামে ডাকতে শুরু করে।

বাস্টার্ডের সাথে তার পরিচয় বহু দিনের। লোকটা তার বাবার বন্ধু। এখন বয়স হয়ে গেছে কিন্তু নিয়মিত ওষুধের দোকানে বসে। নিজের এক ছেলেকে মেডিকেলে পড়িয়ে জিলানি ডাক্তার তার ক্লিনিকের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে সেই ছেলের হাতে। তবে ক্লিনিকের ব্যাপারে এখনও জিলানি ডাক্তারই সর্বেসর্বা।

বাস্টার্ডের গাড়িটা যখন তার চেম্বারের সামনে এসে থামলো জিলানি ডাক্তার তখন ওষুধের দোকানের সামনে বসে পত্রিকা পড়ছে আর আয়েশ করে চায়ে চুমুক দিচ্ছে।

বাইফোকাল লেন্সের চশমার উপর দিয়ে পণ্ডিত মশায়ের দৃষ্টি হেনে দেখলো সাদা রঙের একটি গাড়ি তার দোকানের সামনে এসে থেমেছে। বাস্টার্ডকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে পত্রিকাটা নামিয়ে রাখলো ভদ্রলোক।

"কি ব্যাপার, তুমি...!" অবাক হলো জিলানি ডাক্তার। বাস্টার্ড সচরাচর এখানে আসে না।

গাড়ি থেকে নেমে তার সামনে এসে দাঁড়ালো বাস্টার্ড। "চাচা, একটু ক্লিনিকে আসুন।" বলেই সে ভেতরে যাবার জন্য তাড়া দিলো।

জিলানি ডাক্তার গাড়ির ভেতরে উমাকে দেখিয়ে বললো, "বিয়া করছো নি?"

"না, চাচা। একটা সমস্যায় পড়েছি, একটু ক্লিনিকে আসেন।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো জিলানি ডাক্তার। "বাবা, আমার এখানে কিন্তু এম.আর করা হয় না।"

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো না। "বুঝলাম না, চাচা?"

কানের কাছে মুখ এনে জিলানি সাহেব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললো, "গর্ভপাত!"

বুড়োর কথা শুনে হাসি পেলো তার। মাথা দুলিয়ে বললো, "ওসব কিছু না। গুলি লেগেছে, ইনজুরিটা একটু দেখতে হবে।"

আৎকে উঠলো ডাক্তার। "কার লাগছে?"

"আমার।"

ভালো করে বাস্টার্ডের দিকে তাকালো জিলানি ডাক্তার। "তোমার?" মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "কোনখানে?"

"চাচা, ভেতরে আসেন...সব বলছি।"

এবার জিলানি ডাক্তারই ভেতরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। "চলো চলো।" কী মনে করে যেনো একটু থেমে বাইরে গাড়ির দিকে চেয়ে বললো, "মাইয়াটা কি গাড়িতেই

থাকবো?”

“হুম।”।

“ক্লিনিকের সামনে গাড়িতে কোনো যুবতী মাইয়া বইসা থাকলে লোকজন সন্দেহ করবো...ওরে ভেতরে নিয়া আসো।”

“ঠিক আছে, আপনি ক্লিনিকে যান আমি ওকে নিয়ে আসছি।”

পিং সিটির ম্যানেজার প্রথম থেকেই উল্টাপাল্টা কথা বলে যাচ্ছে। জেফরি অনেক ধৈর্য নিয়ে শুনে গেলো তার কিসসাকাহিনী। লোকটাকে যখন ইন্টেরোগেশন রুমের চেয়ারে বসানোর পর পলিগ্রাফ সেন্সর ক্যাবল তার শরীরে লাগানো হচ্ছিলো তখন বেশ ভড়কে গেছিলো।

হোটেল রেজিস্ট্রেশনে লেডি গিয়াসের নাম-ধাম কেন লিপিবদ্ধ করা হয় নি তার কারণ হিসেবে পুলিশের কাছে যা বলেছিলো এখন সেখান থেকে সরে এসেছে লোকটা।

"স্যার, মেয়েমানুষ নিয়ে একটু... মানে বুঝতেই তো পারছেন, ফুর্তি করতে এসেছিলো, তাই রেজিস্ট্রেশনে নামটাম কিছু লিখি নাই। কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার...বুঝতেই তো পারছেন... আমি স্বীকার করছি এটা অন্যায় হয়েছে কিন্তু বিশ্বাস করেন এর পেছনে আর কোনো কারণ নেই। তাকে আমি চিনতাম না।"

লোকটা যে মিথ্যে বলছে তার জন্যে পলিগ্রাফ টেস্টের রেজাল্ট দেখার দরকার নেই জেফরির। যদিও তার সামনে একটা ল্যাপটপের পর্দায় পলিগ্রাফ টেস্টের ফলাফল ভেসে উঠছে প্রতি মুহূর্তে।

কিছু দিন আগে পলিগ্রাফ মেশিনটা আপগ্রেড করা হয়েছে। এখন আর ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করার দরকার পড়ে না। ইন্টেরোগেশন রুমে বসেই তারা জানতে পারে সেটা। মিথ্যে বলার পর পরই কম্পিউটার স্ক্রিনে ফলাফল দেখা যায়।

লেডি গিয়াসকে আপনি চেনেন সেটা তো আমি বলি নি," টেবিলে একটু আগে দেয়া কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে বললো জেফরি। "হোটেলগুলোতে অসামাজিক কার্যকলাপ হয় সেটা আমরাও জানি... কিন্তু এটাও জানি সেক্ষেত্রে ভুয়া নাম-ঠিকানা লিখে রাখা হয়। আপনি তো তাও করেন নি।"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো ম্যানেজার।

"কতো দিন ধরে এই হোটেলে কাজ করছেন?" জেফরি প্রসঙ্গ পাল্টালো।

"দেড় বছর ধরে।"

"এই হোটেলটা তো দেড় বছর আগেই চালু হয়, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ম্যানেজার।

"তার মানে শুরু থেকেই আছেন... এর আগে কোথায় কাজ করতেন?"

"এর আগে আমি কোথাও কাজ করতাম না, স্যার।"

লোকটা প্রথম থেকেই ক্ষণে ক্ষণে তাকে স্যার বলছে। থ্রি-স্টার দাবি করে এরকম কোনো হোটেলের ম্যানেজার সরকারী কর্মচারিদের স্যার বলবে না। এটা করে থাকে স্বল্প শিক্ষিত লোকজন। অবশ্য অনেক শিক্ষিত লোকজনও যে করে না তা নয়।

"হোটেলে কাজ করার কোনো অভিজ্ঞতা নেই অথচ সরাসরি ম্যানেজার হয়ে গেলেন?"

এবারও কিছু বললো না সে।

"মালিকপক্ষের সাথে খুব খাতির আছে মনে হয়?... আত্মীয়-টাত্মীয় হয় নাকি?"

"জি, স্যার।"

"মালিক কে?"

"মনোয়ার হোসেন।"

"উনার আর কি কি ব্যবসা আছে?"

"রিয়েল এস্টেট...ফিল্ম ...রেস্টুরেন্ট..."

"ফিল্ম?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ম্যানেজার।

"ভালো।" আবারো কফিতে চুমুক দিলো সে। "তাহলে আপনার মালিক মনোয়ার হোসেন সাহেব চলচ্চিত্র প্রযোজক?"।

"জি, স্যার।"

"উনি কি প্রযোজক হিসেবে নিজের নাম ব্যবহার করেন?" জেফরি জানে অনেক

প্রযোজকই নিজের নামে ব্যবসাটা করে না। পর্দার আড়াল থেকে টাকা বিনিয়োগ করে থাকে।

"জি, স্যার। নিজের নামেই করে।"

"আপনার মালিকের সাথে কি লেডি গিয়াসের কোনো সম্পর্ক আছে?"

"না।"

ল্যাপটপের পর্দায় বিপ হচ্ছে। মিথ্যে।

"আপনি এতো মিথ্যে বলে বাঁচতে পারবেন না," জেফরি হেসে বললো। "আমি নিশ্চিত, যেভাবে মিথ্যে বলছেন তাতে করে এই খুনের ঘটনায় নির্ঘাত ফেঁসে যাবেন। আদালত মনে করবে আপনি এইসব খুনের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত... নইলে এতো মিথ্যে বলবেন কেন।" একটু থেমে দেখে নিলো লোকটাকে। ভড়কে গেছে মনে হলো। "লেডি গিয়াস কবে হোটেলে উঠেছিলো?"

"চার-পাঁচ দিন আগে," ঢোক গিলে বললো ম্যানেজার।

"চার-পাঁচ দিন ধরে লোকটা একের পর এক মেয়ে নিয়ে এসে ফুর্তি করে গেছে?"

"না, স্যার।"

"তাহলে?"

"কালকেই প্রথম মেয়ে নিয়ে আসে..."

সত্যি বলছে।

"ভালো।" একটু সামনে ঝুঁকে এলো সে। "তাহলে তিন-চার দিন ধরে সে হোটেলে এমনি এমনিই থেকেছে?"

"জি, স্যার। শুধু কালকেই মেয়ে নিয়ে এসেছে।"

"একটু আগে যে বললেন, মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করতে এসেছিলো বলে নামটাম কিছু রেজিস্টার করেন নি?... মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার?"

ম্যানেজার এবার বোবা। বুঝে গেছে মিথ্যে বলতে বলতে ধরা খেয়ে গেছে।

অসন্তোষে দু'পাশে মাথা দোলাতে দোলাতে জেফরি বেগ বললো, "ব্ল্যাক রঞ্জুর সবচাইতে ঘনিষ্ঠ লোক লেডি গিয়াস কোলকাতা থেকে ঢাকায় এসে আপনার হোটেলে উঠলো, চার-পাঁচ দিন পর সে আপনার হোটেল রুমেই খুন হলো, আর আপনি একবার বলছেন লোকটা মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করতে এসেছিলো বলে নামটাম কিছু রেজিস্টার করেন নি!" দু'হাত টেবিলের উপর রেখে আবার বলতে লাগলো সে, "আপনি এখনও জানেন না কতো বড় বিপদে পড়ে গেছেন। আগামীকাল পত্রিকায় যখন সব ছাপা হবে তখন বুঝবেন। গতকাল শীর্ষ সন্ত্রাসী ব্ল্যাক রঞ্জুর ডান হাত হিসেবে পরিচিত লেডি গিয়াসই শুধু খুন হয় নি, খুন হয়েছে তার দ্বিতীয় স্ত্রী মিনা আর পুরনো ঢাকায় সুলতান নামে রঞ্জুর আরেক সহযোগী।"

ম্যানেজারের চোখেমুখে বিস্ময়। যেনো কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

মাথা দোলালো জেফরি। "বিরাট ঘটনা। বুঝলেন, ম্যানেজার সাহেব?"

নির্বাক।

"আপনার কয় ছেলে কয় মেয়ে?" আবারো অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলো সে।

"তিন মেয়ে।"

"ছেলে নেই?"

মাথা দোলোললা ম্যানেজার।

"তারা কি করে?"

"সবাই পড়াশোনা করে। বড়টা কলেজে, ছোটো দু'জন স্কুলে।"

"আপনাকে তো মেয়েদের কথাও ভাবতে হবে, নাকি?... এখন যে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে আদালত তো আপনাকে ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের একজন হোমরাচোমরা মনে করবে। কমপক্ষে সাত-আট বছরের জেল। মেয়েগুলো বিয়ে দিতে অনেক সমস্যা হবে। তাদের লেখাপড়াও অনিশ্চিত হয়ে যাবে।"

“স্যার, আমি এরকম কোনো দলের কেউ না, বিশ্বাস করেন।” ম্যানেজার আকুতি জানলো।

“বুঝলাম আপনি নিতান্তই একজন নিরীহ টাইপের লোক। কিন্তু ওদেরকে বাঁচাতে গিয়ে যে নিজেই বিপদে পড়ে যাচ্ছেন সেটা বুঝতে পারছেন?”

লোকটা ভড়কে গেলো। কিছু বলতে পারলো না।

“আপনি যদি আমার কাছে সব সত্যি না বলেন পুলিশ আপনাকে রিমান্ডে নেবে। তারা রিমান্ডে কি করে সেটা নিশ্চয় জানেন। আর আমার কাছে যদি সব সত্যি বলেন তাহলে আমি আর পুলিশ রিমান্ডের জন্য রিকমেন্ড করবো না।”

“স্যার, লেডি গিয়াস ব্ল্যাক রঞ্জুর লোক, তাই হোটেলের রেজিস্টারে রেকর্ড রাখি নি।”

“গুড।” স্বাভাবিক থাকলো জেফরি। যেনো এটা কোনো আহামরি তথ্য নয়। আপনার মালিক আপনাকে নিশ্চয় বলেছে কোনো রেকর্ড না রাখতে?”

“জি, মানে... জি, স্যার।” একটু তোতলালো লোকটা।

সত্যি।

“আপনার মালিকের সাথে রঞ্জুর কতো দিনের সম্পর্ক?”

ম্যানেজার তার দিকে চেয়ে রইলো। মিথ্যে বললে এরা ধরে ফেলে, কী এক আজব যন্ত্র দিয়ে এটা করে কে জানে। না। আর মিথ্যে বলে ফেঁসে যাওয়ার কোনো দরকার নেই।

“আমার মালিকের নাম মনোয়ার হোসেন মঞ্জু।”

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো জেফরি। এই নামটা তো কিছুক্ষণ আগেও সে বলেছে। আবার বলার মানে কী? “হ্যাঁ, সেটা তো একটু আগেও বললেন।”

“উনি ব্ল্যাক রঞ্জুর বড় ভাই!”

গুলিটা গলার খুব কাছ দিয়ে কাঁধের মাংসপেশী ভেদ করে বের হয়ে গেছে। জিলানী ডাক্তার বিস্মিত হয়ে বললো আর এক ইঞ্চির মতো এদিক ওদিক হলেই বুলেটটা প্রাণঘাতি হয়ে উঠতো। কাজ করতে করতে এক ফাঁকে ডাক্তার জানতে চাইলো গুলিটা কে করেছে। বাস্টার্ড শুধু জানালো এক পুরনো শত্রুর কাজ এটি।

খুব বেশি কিছু করতে হলো না জিলানি ডাক্তারকে। শুধুমাত্র ড্রেসিং করে ক্ষতস্থানটি টেপ ব্যান্ডেজ করে দিলো, ফলে শার্ট পরে থাকলে বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই তার কাঁধে ব্যান্ডেজ করা আছে। সব শেষে ডাক্তার একটা ইনজেকশন দিয়ে কিছু ওষুধ দিয়ে দিলো তাকে।

কাজটা করতে আধঘণ্টার বেশি লাগলো না। উমা বসে আছে পাশের একটা ছোট্ট ঘরে। জিলানি ডাক্তার হাত ধুয়ে বাস্টার্ডের কাছে চলে এলো। সে এখন শার্ট পরে উঠে বসেছে।

"মেয়েটা কে?" পিতৃসুলভ অধিকার নিয়ে জানতে চাইলো।

"লম্বা কাহিনী, চাচা।"

"আচ্ছা, বুঝছি। লম্বা কাহিনী বলার মতো সময় তোমার নাই।"

"বলবো, তবে এখন না।"

কাঁধ তুললো জিলানি ডাক্তার। আমার শোনার দরকার নাই।"

প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করে পাঁচশ টাকার দুটো নোট বের করলো সে। জিলানি ডাক্তার তার হাতটা খপ করে ধরে ফেললো। "ভাতিজা, টাকা দিতে হইবো না। রাখো।" তারপর একটু থেমে বললো, "কিছু খাইবা?"

"না, চাচা," টাকাটা মানিব্যাগে রেখে বললো সে। "এক্ষুণি চলে যেতে হবে।

"তোমরা বাপে আছে কেমন?"

"আগের মতোই।"

"অবস্থা আরো খারাপ হইবো... মাথাটা তো একেবারেই গেছে, না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাস্টার্ড।

"ও যদি একটু উইঠা বসতে পারতো তাইলে তোমারে কইতাম, হজ্ব করাইয়া নিয়া আসতে।"

বাস্টার্ড কিছু বলতে যাবে অমনি তার চোখ পড়লো বাম দিকের দেয়ালে থাকা একটি পোস্টারের দিকে। একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। জিলানি ডাক্তার বুঝতে পারলো না পোস্টারের কী দেখছে সে। পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে দেখে নিলো বাস্টার্ড।

সর্বনাশ!

তার মাথা দ্রুতই কাজ করতে শুরু করলো।

"চাচা, আমি এখন যাই। আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন, হঠাৎ তড়িঘড়ি করে বললো সে।

"আরে না, তেমন কিছু না। খালি ড্রেসিং করছি। আঘাতটা মারাত্মক হইলে অনেক ভুগতে হইতো। বাঁইচা গেছে।"

উমাকে নিয়ে জিলানি ডাক্তারের ওখান থেকে বের হয়েই গাড়িতে উঠে বসলো। বাস্টার্ডের মধ্যে প্রবল তাড়না দেখে উমা কিছুই বুঝতে পারলো না। সে শুধু দেখলো পকেট থেকে একটি মোবাইল ফোন বের করে বন্ধ করে ফেললো বাস্টার্ড।

ঢাকা মওয়া সড়ক ধরে খুব দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাতে লাগলো।

"কি হয়েছে?" একটু ভয় পেয়ে বললো উমা।

মাথা দোলালো সে, তেমন কিছু না। কিন্তু ভালো করেই জানে, সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে।

অবশেষে পিং সিটির ম্যানেজার তোতা পাখির মতো সব বলে দিয়েছে। বেচারা অনেক চেষ্টা করেছিলো সব তথ্য গোপন রাখার জন্য কিন্তু পারে নি। জেফরির ধারণা লোকটা আদৌ সেরকম জাঁদরেল কেউ না। একবারেই নিরীহ আর গোবেচারা টাইপের একজন।

ব্ল্যাক রঞ্জুই পিং সিটি হোটেলের মালিক, তবে কাগজেকলমে এর মালিকানা দেখানো হয়েছে তার বড় ভাই মনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নামে। লোকটা কয়েক বছর আগেও সামান্য মুদি দোকানি ছিলো। ছোটো ভায়ের কল্যাণে এখন বিরাট ব্যবসায়ী। অপারেশন ক্লিনহার্টের পর ব্ল্যাক রঞ্জু দেশ ছেড়ে কোলকাতায় স্থায়ী হয়। তখন থেকেই মনোয়ার হোসেন মঞ্জু ছোটো ভায়ের হয়ে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে আসছে।

ইন্টেরোগেশন রুম থেকে সোজা কমিউনিকেশন রুমে ফিরে এলো জেফরি বেগ। তার সহকারী জামানকে দিয়ে মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো থেকে আরো কিছু তথ্য জেনে নিতে পেরেছে সে।

"স্যার," জামান বললো, "লেডি গিয়াস, রঞ্জুর স্ত্রী আর সুলতানের ফোন নাম্বারগুলো ট্যাপিং করার ব্যবস্থা করেছি।"

"ভালো।"

"যদি ঐ সিমগুলো পাল্টে অন্য কোনো সিমও ব্যবহার করা হয় তাহলেও আমরা জনতে পারবো সেটা। ফোন সেটগুলোর পিননাম্বার পাওয়া গেছে।"

নাম্বারগুলো তো বন্ধ করা ছিলো, এখন দ্যাখো চালু হয়েছে কিনা।"

জামান বসে গেলো কম্পিউটারের সামনে। পাঁচ মিনিট পর ফলাফল পাওয়া গেলো। লেডি গিয়াসের মোবাইল নাম্বারটা ওপেন করা হয়েছিলো একটু আগে। কিছুক্ষণ আগে যে ভুয়া মেসেজটা পাঠানো হয়েছিলো সেটা রিসিভ করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে খুনি এখন প্রথম বুড়িগঙ্গা সেতুর ওপারে কেরাণীগঞ্জের ইকুরিয়া নামক একটি এলাকায় রয়েছে। সম্ভবত একটা হাইওয়ের উপর, বিক্রমপুরের দিকে চলে গেছে সেটা। ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক। গাড়িতেই আছে হয়তো।

ভার্চুয়াল ম্যাপ বলছে খুনি এখন যেখানে অবস্থান করছে তার ঠিক আধ কিলোমিটার দূরেই ইকুরিয়া থানা অবস্থিত। জেফরি দেরি না করে জামানকে বলে দিলো ঐ থানায় যোগাযোগ করে এক্ষুণি ফোর্স পাঠাতে।

কমিউনিকেশন রুমের কম্পিউটারে বাংলাদেশের সবগুলো থানার ফোন নাম্বার এন্ট্রি করা আছে। থানার নাম ইনপুট করে দিলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডায়াল হয়ে যায়। কাজটা করতে কয়েক সেকেন্ডর বেশি লাগে নি।

ইকুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বলে দেয়া হলো তাদের ফোর্স যেনো হাইওয়ের পাশে পার্ক করে রাখা কিংবা চলতে থাকা সবগুলো প্রাইভেট কার থামিয়ে চেক করে। তারা ত্রিশ বছরের এক যুবক আর এক তরুণীকে খুঁজবে। খুনি ভয়ঙ্কর প্রকৃতির। পুলিশ যেনো সতর্ক থাকে।

জামান পেছন ফিরে তাকালো জেফরির দিকে।

"কি?"

"স্যার, আরেকবার ফিশিং করি?...তাদের গাড়িটার সর্বশেষ অবস্থান জানা গেলে পুলিশকে গাইড করা যাবে।"

কোনো রকম দেরি না করে জেফরি সায় দিয়ে দ্রুত কিছু নির্দেশনা দিয়ে দিলো। "এবার আনোন নাম্বার থেকে কল করো। কল রিসিভ করলে তুমি লেডি গিয়াসকে চাইবে। খুনির গলা শুনে সন্দেহ করবে...কিছুটা সময় কথা বলে টাইম কিলিং করবে, ঠিক আছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জামান কাজে নেমে পড়লো। এমন একটা নাম্বার থেকে কল করবে যেটার নাম্বার রিসিভারের ডিসপ্লেতে উঠবে না। রিসিভার দেখতে পাবে ইংরেজি 'আনোন' শব্দটি। ভাববে বিদেশ থেকে কল করা হয়েছে।

দুঃখিত...

মোবাইল ফোনটা বন্ধ!

"স্যার?" জামান কি করবে জানতে চেয়ে বললো।

জেফরি বুঝতে পারছে না, একটু আগেও ফোনটা চালু ছিলো এখন বন্ধ করে রেখেছে। অনেক কিছুই হতে পারে। নেটওয়ার্ক সমস্যা...চলতি গাড়িতে থাকলে অনেক সময় এটা হয়...আবার এমনও হতে পারে গাড়ি চালাচ্ছে বলে ফোন অফ করে রেখেছে। যাইহোক তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলো সে।

"সম্ভবত ব্রিজ পার হতে পারে, জেফরি বললো। "ব্রিজটায় ব্যারিকেড দিতে বলল। দুটো ব্রিজে ব্যারিকেড আর মাওয়াঘাটে যে টহলপুলিশ আছে তাদেরকেও অ্যালার্ট করে দিতে বলে। মাওয়াঘাটের দিকে গেলে সমস্যা নেই, ওখানে ফেরির জন্যে অনেকক্ষণ লাইনে থাকতে হবে...সবার আগে ব্রিজ দুটো সিকিউর করতে বলল।"

জেফরি জানে গাড়িতে করে খুনি যেখানেই যাক না কেন এই তিনটি জায়গা অতিক্রম করতে হবে। তার ধারণা খুনি প্রথম বুড়িগঙ্গা সেতু পার হবার চেষ্টা করবে। তার সর্বশেষ অবস্থান ঐ সেতুর কাছাকাছি ছিলো।

জামান সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে ইকুরিয়া থানার ওসিকে জানিয়ে দিলো নির্দেশনাটি।

"জি, স্যার," ওসির উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেলো। "আমি এখনই যাচ্ছি।"

জামান দ্রুত বললো, "খুনি এখনও হাইওয়েতেই আছে, আমরা নিশ্চিত।"

"জি, স্যার। আমি নিজে যাচ্ছি ফোর্স নিয়ে!"

ইকুরিয়া থানা থেকে ওসি মইনুল ইসলাম একটি পিকআপ ভ্যান আর জিপ নিয়ে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে ঢাকা-মাওয়া সড়ক ধরে। মহাসড়কের যতোগুলো স্থানে টহলপুলিশ আছে সবাইকে সাদা রঙের একটি গাড়ির ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। মহাসড়ক দিয়ে যাবার সময় রাস্তার দু'পাশে কোনো প্রাইভেট কার পার্ক করা অবস্থায় দেখতে পেলো না। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট থেকে তাকে গাইড করা হচ্ছে একটু পর পর। সার্বক্ষণিক যোগাযোগ আছে তাদের সাথে। ওসি সাহেবও মনে করছে খুনি প্রথম ব্রিজটার দিকেই যাবে।

একজন মাত্র খুনিকে ধরার জন্য আটজন পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে তার কারণ হোমিসাইড থেকে বলা হয়েছে খুনি ভয়ঙ্কর প্রকৃতির। তিন তিনটি খুন করে পালাচ্ছে। গতরাতে একদল পুলিশকে অস্ত্রের মুখে নাস্তানাবুদ করে সটকে পড়তে পেরেছে। ঠিক আছে, এবার দেখা যাক খুনি কিভাবে পালায়! মনে মনে বললো ওসি মইনুল ইসলাম।

ওয়াকিটকিটা হাতে নিয়ে দুটো ব্রিজের উপর যে টহল পুলিশের দল আছে। তাদেরকে একটা অর্ডার জানিয়ে দিলো সঙ্গে সঙ্গে।

"সাদা রঙের সব প্রাইভেট কার আটকে দেবে.. অস্ত্রধারী এক খুনি আছে... একটু সতর্ক থাকবে। আমরা না আসা পর্যন্ত সাদা রঙের কোনো গাড়িই ছাড়বে না... ওকে?"

ওপাশ থেকে জানানো হলো কোনো সমস্যা নেই, তারা প্রস্তুত আছে।

মহাসড়কের মোড় নিতেই ওসি দেখতে পেলো দূরে ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে। তার ধারণা খুনি কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। আগেভাগে ব্রিজে আসতে পেরে ভালো লাগছে তার। উত্তেজনায় তার রক্ত টগবগ করছে এখন। বহুদিন হলো এরকম কোনো কাজ করে নি। রাস্তাটা ধীরে ধীরে খাড়া হয়ে ব্রিজের কাছে চলে গেছে। ওসি সাহেব ড্রাইভারকে তাড়া দিলো গাড়িটা আরো জোরে চালাতে।

ব্রিজের ঢালু দিয়ে ওঠার সময় দেখতে পেলো সাদা রঙের একটি প্রাইভেট কার ঠিক ঢালুর উপর, রাস্তার পাশে। ব্রিজ পার হয় নি। সম্ভবত টহল পুলিশের ব্যারিকেড দেখে পার হবার ঝুঁকি নেয় নি। ঘুরে উল্টো দিকে যে যাবে সে সময়ও পায় নি, তার আগেই দু'দুটো পুলিশের গাড়ি চলে এসেছে ব্রিজের কাছে। মইনুল হোসেন কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা তুলে নিলো। "সবাই অ্যালার্ট হয়ে যাও!...নামার সাথে সাথে সাদা গাড়িটা ঘিরে ফেলতে হবে!"

পুলিশের দু'দুটো গাড়ি সাদা রঙের প্রাইভেট কারের কাছে সশব্দে ব্রেক করে থেমে

যেতেই লাফ দিয়ে বেশ কয়েকজন অস্ত্রধারী পুলিশ নেমে পড়লো।

জিলানি ডাক্তারের ওখান থেকে তাড়াহুড়া করে চলে আসার সঙ্গত কারণ আছে। উমা প্রথমে বুঝতে না পারলেও বাস্টার্ড যখন ব্রিজের গোড়ায় এসে গাড়িটা পরিত্যাগ করলো তখন আন্দাজ করতে পারলো কিছু একটা ঘটেছে।

বাচ্চুর দেয়া পুরনো মডেলের সাদা গাড়িটার কাগজপত্র পুলিশের হাতে পড়লে কোনো সমস্যা নেই। এই গাড়িটা এমন এক মালিকের নামে রেজিস্ট্রেশন করা আছে যার অস্তিত্ব খুঁজে বের করা পুলিশের পক্ষে কখনও সম্ভব হবে না।

ব্রিজের গোড়ায় গাড়িটা ফেলেই বুট থেকে গলফ্ ব্যাগটা নিয়ে নিলো সে। উমা এসব দেখে জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে, বাস্টার্ড শুধু বললো পুলিশ তাদের পিছু নিয়েছে। কথাটা শুনে উমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

ব্রিজের গোড়ায় সারি সারি সিএনজি পার্ক করে রাখা, এখানে সব সময়ই কিছু না কিছু সিএনজি থাকেই, বাস্টার্ড সেটা জানে। সিএনজি'তে করেই ব্রিজটা পার হওয়া যাবে, মনে মনে ভাবলো সে।

একটা সিএনজি'র সামনে এসে জিজ্ঞেস করলো যাবে কিনা। ড্রাইভার লোকটা সিএনজি'র সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা তার কথা শুনে তার দিকে না তাকিয়ে, তাকালো পাশে দাঁড়ানো উমার দিকে। বাস্টার্ড আবারো জিজ্ঞেস করলো যাবে কিনা।

"না। আমার গাড়ি নষ্ট।" এখনও বদমাশটা চেয়ে আছে উমার দিকে। বাস্টার্ড আর দেরি করলো না, পাশের সিএনজিটার কাছে চলে গেলো। এটার ডাইভার এক কথায় রাজি হয়ে গেলে, উঠে বসলো তারা দু'জনে। সিএনজিটা ব্রিজের উপর উঠতেই বাস্টার্ড দেখতে পেলো যানবাহনের দীর্ঘ লাইন পড়ে গেছে।

"এতো বড় লাইন কেন, কি হয়েছে?" সিএনজি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলো সে।

"ব্রিজের উপর টহলপুলিশ সব সাদা রঙের প্রাইভেটকার চেক করতাছে...আমাগো চিন্তা নাই। আমাগো ছাইড়া দিবো।"

"কখন থেকে এরকম চেক করছে?"

"কিছুক্ষণ ধইরা।"

সতর্ক হয়ে উঠলো বাস্টার্ড। সাদা রঙের প্রাইভেটকার চেক করা হচ্ছে।

"গাড়ি ঘুরাও!" ড্রাইভারকে বললো সে। অবাক হয়ে পেছন ফিরে তার অস্থির যাত্রির দিকে তাকালো ড্রাইভার।

"কি হইছে?!"

"গাড়িটা ঘুরাও!" বাস্টার্ড তাড়া দিয়ে বললো আবার।

"কি কন?!"

"গাড়ি ঘুরাও...আমরা সামনেই নেমে যাবো।"

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো ড্রাইভার। "যাইবেন না?"

"না।" কথাটা বলেই একটা একশ' টাকার নোট বের করে ড্রাইভারের দিকে বাড়িয়ে দিলো। "ধরো। আমরা যাচ্ছি না। যেখান থেকে উঠেছিলাম সেখানে নামিয়ে দিলেই হবে।"

টাকাটা না নিয়েই ড্রাইভার তার সিএনজি ঘুরিয়ে ব্রিজ থেকে নামতে শুরু করলো।

"রাখো! রাখো!" পেছন থেকে টাকাটা ড্রাইভারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অস্থিরভাবে বললো সে। "এই নাও।"

টাকাটা হাতে নিয়ে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ড্রাইভার।

পাশে বসা উমাকে দেখিয়ে বললো সে, "আমরা বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করতে বের হয়েছি...মনে হয় আমাদের পেছনে পুলিশ লেগেছে।"

উমা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো তার দিকে। কতো দ্রুত মিথ্যে গল্প বানাতে পারে এই লোক!

মুখ টিপে হেসে ড্রাইভার টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে বললো, "আচ্ছা, এই ঘটনা। রাখেন, রাখেন। টাকা লাগবো না।"

“ওর বাপ অনেক পাওয়ারফুল লোক।” তড়িঘড়ি করে সিএনজি থেকে নেমে পড়লো সে উমাকে নিয়ে।

“শুনেন,” সিএনজি থেকে নামতেই ড্রাইভার বললো। “ব্রিজের নীচ দিয়া নদী পার হইয়া যান। ওইটাই সবচাইতে নিরাপদ হইবো।”

মুচকি হাসলো বাস্টার্ড। “অনেক ধন্যবাদ, তোমাকে।”

বাস্টার্ড সিএনজি ড্রাইভারের কথামতোই কাজ করলো। লোকটা ঠিকই বলেছে। ব্রিজ হলেও নৌকা তো উঠে যায় নি। এখনও প্রচুর নৌকা আছে পারাপারের জন্য।

ব্রিজের ঢাল থেকে নামার সময় দেখতে পেলো দু'দুটো পুলিশের গাড়ি ব্রিজের দিকে ছুটে আসছে।

উমাকে নিয়ে দ্রুত চলে গেলো নদীর পারে। অনেকগুলো নৌকা ঘাটে ভেড়ানো আছে। অলস সময় পার করছে মাঝিরা। তাদেরকে দেখেই সবাই নড়েচড়ে উঠে ডাকতে শুরু করে দিলো। কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা একটা নৌকায় উঠে বসলো তারা।

নদী পার হতে সাত-আট মিনিটের বেশি লাগলো না। একেবারে নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেলো।

জিলানি ডাক্তারের ওখানে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস উপলক্ষ্যে ইউনিসেফের পোস্টারটা না দেখলে আজ হয়তো ধরা-ই পড়ে যেতো। পোস্টারটা তার কাছে মোটেই আগ্রহের বিষয় হতো না যদি কিছুক্ষণ আগে তার মোবাইলে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস উপলক্ষ্যে একটি মেসেজ না আসতো। পোস্টারে বড় বড় করে লেখা ছিলো ৭ই আগস্ট। হ্যাঁ, ৭ই আগস্ট হলো বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস। কিন্তু আজ তো ৭ই আগস্ট না! এটা ফেব্রুয়ারি মাস! তাহলে আজকে কেন তাকে মাতৃদুগ্ধ দিবস উপলক্ষ্যে মেসেজ পাঠানো হলো?

তার মাথাটা খুব দ্রুত কাজ করতে শুরু করে। বুঝতে পারে তার কাছে থাকা মোবাইল ফোনে মেসেজ পাঠিয়ে আসলে তার অবস্থান জেনে নেয়া হয়েছে। এরকম প্রযুক্তি র‍্যাবের কাছে আছে। এখন হয়তো পুলিশের কাছেও চলে এসেছে। নাকি হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট? অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনায় তাদের কাছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অনেক বেশিই আছে। এ নিয়ে পার্লামেন্টে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি কিছুদিন আগেও সমালোচনা করেছিলো। বিশাল টাকা খরচ করে নাকি শ্বেতহস্তী পালা হচ্ছে।

ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি পুলিশ এতো দ্রুত তার পেছনে লেগে যাবে। এই কারণেই সে উমাকে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে দেয় নি, অথচ তারা ঠিকই জেনে গেলে শেষ পর্যন্ত! মোবাইল ফোনটাই যে এক্ষেত্রে কাজ করেছে বুঝতে পারলো। আগামীকাল যখন পত্রিকায় খুনের সংবাদগুলো ছাপা হবে তখন পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে যাবে। কী অসাধারণ টেকনিকই না ব্যবহার করেছে তারা। পুলিশের কাছে এরকম জিনিস আছে সেটা সে জানতো না। এখন যতো দ্রুত সম্ভব ঢাকা ছাড়তে হবে। দেরি করলে সমস্যা বাড়বে বৈ কমবে না।

জেফরি বেগের মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না খুনি কিভাবে আগেভাগে জেনে গেলো পুলিশ তাকে ধরার জন্য আঁটঘাঁট বেধে নেমেছে। তারা যেভাবে, যে টেকনিক ব্যবহার করে তাকে ট্র্যাকডাউন করেছে সেটা তো খুনির পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তারপরেও সে জেনে গেছে! গাড়িটা ঠিক ব্রিজের কাছে পরিত্যাক্ত করে চলে গেছে অন্য কোথাও।

ইকরিয়া থানার ওসি সব জানানোর পর থেকে সে এ নিয়ে ভেবে যাচ্ছে। কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না।

"স্যার, খুনি লোকটার ব্যাপারে আমার কাছে অন্য রকম একটা থিওরি আছে," জেফরির সহকারী জামান তার বসকে অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ থাকতে দেখে অবশেষে বললো।

জেফরি শুধু ভুরু কুচকে তাকালো তার সহকারীর দিকে।

"আমার মনে হচ্ছে খুনি লোকটা গোয়েন্দাসংস্থার কেউ হবে..."

"মানে?" জেফরি বুঝতে পারেলো না জামানের কথাটা।

"স্যার, এরকম শীর্ষ সন্ত্রাসীদের বেলায় সরকারের একটি অলিখিত নিয়ম আছে, আমরা সবাই সেটা জানি। ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার, বিভিন্নভাবে তাদেরকে নির্মূল করার কাজ তো অনেক আগে থেকেই চালু আছে।"

"তুমি কি বলতে চাও, ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা সংস্থা কিংবা র‍্যাব-পুলিশ কোনো অপারেশন চালাচ্ছে?"

"এটা তো হতেই পারে, স্যার, পারে না?"

"কিন্তু কাজটা তো করেছে একজন মাত্র লোক। একেবারে পেশাদার কোনো খুনির মতো। যাদের কথা বলছো, তারা কি এভাবে কাজ করে? না। আমার তা মনে হয় না।"

জামান একটু আশাহত হলো তবে হাল ছেড়ে দিলো না। "কাজটা হয়তো একজনই করছে, তার সাথে আছে আরো অনেকে। তা না হলে এভাবে একটা সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের ভেতর ঢুকে..."

"না, না।" জেফরি তার সহকারীর থিওরিটা বাতিল করে দিলো। "এরকম কিছু বলে মনে হচ্ছে না।"

"তাহলে আমরা যে মোবাইল ফোনের সাহায্যে ট্র্যাকডাউন করি সেটা খুনি জানলো কি করে, স্যার?"

এই প্রশ্নটা জেফরিকেও ভাবাচ্ছে। সে ভালো করেই জানে তাদের কাছে থাকা স্টেট অব দি আর্ট ইকুইপমেন্ট কমপক্ষে আরো দুতিনটি প্রতিষ্ঠানের কাছেও আছে- যার আর দুটো গোয়েন্দা সংস্থা।

তার সহকারী জামানের কথায় যুক্তি আছে কিন্তু জেফরির মন তাতে সায় দিচ্ছে না। সরকারী কোনো সংস্থা এরকম কাজে নামবে? অসম্ভব। কিন্তু খুনি যেভাবে শেষ মিনিটে সব জেনে গাড়িটা ফেলে পালিয়েছে তাতে করে মনে হচ্ছে সে তাদের ট্র্যাকিং করার খবরটা জেনে গেছে। বুঝতে পারছে খুনিকে ধরার কাজটা এখন কঠিনই হয়ে গেলো। সহকারী জামানের আইডিয়াটা বাতিল করে দিলেও মনে মনে ঠিক করলো একটু খতিয়ে দেখবে আসলেই এরকম কোনো গোপন অপারেশন চালানো হচ্ছে কিনা।

"স্যার, হোটেল পিং সিটির মালিককে গ্রেফতার করা হলে কিছু তথ্য পাওয়া যেতো।"

জামানের এই কথাতে সায় দিলো জেফরি। হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে সব জানার পর তারা উত্তরা থানাকে জানিয়ে দিয়েছে। দেখা যাক লোকটাকে গ্রেফতার করতে পারে কিনা। জেফরি অবশ্য মনে করছে এতোক্ষণে রঞ্জুর ভাই গা ঢাকা দিয়েছে।

তবে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয় সে। শেষ একটি অস্ত্র প্রয়োগ করবে এখন। খুনিকে ধরার আরেকটা উপায় আছে। উমা রাজবংশী নামের মেয়েটি। সেই মেয়েটি নিশ্চয় জানে খুনি কে। আর জানে বলেই খুনি তাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে গেছে। ঐ মেয়েটার অনেক কিছুই এখন তারা জানে। এমনকি মেয়েটার ছবিও তাদের কাছে আছে। বিউটি পার্লারের কর্মচারীদের একটি গ্রুপ ছবি থেকে এটা জোগাড় করা হয়েছে। সুতরাং

তাকে ধরার দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

"জামান, উমা নামের মেয়েটির ছবি তৈরি করেছো?"

"জি, স্যার," জামান বললো। "একটা গ্রুপ ছবি থেকে পোর্ট্রেট করা হয়েছে।"

"ছবিটা কি সাম্প্রতিক সময়ে তোলা?"

"তিন মাস আগের।"

"দ্রুত ছবিটার অনেকগুলো প্রিন্ট করে ফেলো...হুম, এক থেকে দেড়শ' কপি? কিংবা যতোগুলো দরকার পড়ে।"

জামান একটু অবাক হলো। "এতোগুলো?"

"হুম। সারা শহরে ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে হবে। খুব দ্রুত।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

একটু ভেবে বললো জেফরি। "মেয়েটার মা হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে আছে না?"

"জি, স্যার।"

"ওখানে কি সাদা পোশাকের পুলিশ আছে?"

"আছে।"

"তার বাড়ির আশেপাশে?"

"সেখানেও আছে।"

"গুড।" আবারো একটু ভেবে সহকারীকে বললো সে, "কেরাণীগঞ্জের ইকুরিয়া থানার আশেপাশে, ব্রিজের দুই পারে মেয়েটার ছবি নিয়ে খোঁজ করতে হবে। এই কাজটা করবে তুমি নিজে। ফিল্ডের কাজ। আরো দু'তিনজনকে সাথে করে নিয়ে যাও। এ ব্যাপারে ইকুরিয়া থানারও সহযোগীতা নিতে পারো। আমি রমিজ লস্করকে বলে দিচ্ছি সবগুলো থানায় মেয়েটার ছবি পাঠিয়ে দিতে।"

"আমি কি এখনই চলে যাবো ওখানে?"

"হ্যাঁ। দেরি কোরো না। ফিল্ড থেকে আশা করি কিছু পাওয়া যাবে।"

জামান সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়লো।

বাস্টার্ড বুঝতে পারছে না এই মেয়েটাকে নিয়ে সে কী করবে। এমন নয় যে পুলিশের কাছে ধরা পড়লে এই মেয়ে তার সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দেবে সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে। মেয়েটা খুবই নিরীহ। একটা বড়সড় ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেছে। এমন ঝামেলা যা তার জীবনটাকে তছনছ করে দিতে পারে। কিন্তু সে চায় না মেয়েটার কোনো ক্ষতি হোক। কোনোভাবেই চায় না। কালকের রাতের পর থেকে এক ধরণের মায়া জন্মে গেছে মেয়েটার উপর।

আড়চোখে তাকালো উমার দিকে। এখন তারা বসে আছে সিএনজি'তে। জুরাইন রেলগেটে আটকে আছে সেটা। রেলক্রসিংয়ে ফটক পড়েছে, এখান দিয়ে একটু পরই রেল যাবে। তাদের গন্তব্য গুলশান। উমা জানে না গুলশানে কেন যাচ্ছে। সিএনজি নেবার সময় সে জানতেও চায় নি গুলশানে কেন যাচ্ছে তারা। মেয়েটার চোখমুখ দেখে বুঝতে পারছে খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে।

"আমার মাকে দেখতে যাবো," আস্তে করে বললো উমা।

"সেটা সম্ভব না।" সোজাসুজি বলে দিলো বাস্টার্ড। "ওখানে সাদা পোশাকের পুলিশ আছে।"

চুপ মেরে রইলো উমা।

"তোমার বাড়ির আশেপাশেও পুলিশ আছে।"

"কিন্তু মার সাথে দেখা করাটা জরুরি।"

"এটা পুলিশও জানে...তুমি হাসপাতালে একবারের জন্যে হলেও যাবে।"

"আমি কি এভাবেই পালিয়ে বেড়াবো?" কাঁদো কাঁদো গলায় বললো মেয়েটি।

"না।" জ্যামে আটকা পড়ে বিরক্তি ধরে গেছে তার, তারপরও শান্ত কণ্ঠে বললো, "একটা ব্যবস্থা করবো...খুব জলদিই করবো।"

উমা কিছু বললো না। এই লোকটা যে তাকে খুন করবে না সেটা সে বুঝে গেছে। আরো বুঝে গেছে লোকটা কোনোভাবেই চায় না সে বিপদে পড়ুক। পুলিশের কাছে ধরা পড়ুক। কিন্তু তার মনে অসংখ্য প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, আর এইসব প্রশ্নের একটারও উত্তর তার জানা নেই।

এই লোকটা কে। কেন সে ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের লোকজনকে খুন করছে। ব্ল্যাক রঞ্জুর ঠিকানা জানতে চাচ্ছে। অন্য দিকে পুলিশ এতো দ্রুত কিভাবে তাদের অবস্থান জেনে যাচ্ছে। তার পরিবারের লোকজনের অবস্থা কি। তাদেরকে পুলিশ কি করেছে। তাকে ধরতে পারলেই বা পুলিশ কি করবে-কিছুই তার জানা নেই।

ভেতরে ভেতরে সে অস্থির থাকলেও ভয়ে কুকড়ে আছে। পাশে বসা অজ্ঞাত পরিচয়ের লোকটার দিকে তাকালো। ট্রাফিক জ্যামের দিকে উদাস হয়ে চেয়ে আছে। চেহারাটা একেবারে নিষ্পাপ শিশুর মতো। রেগে না গেলে তাকে কেউ খুনি হিসেবে কল্পনাও করতে পারবে না। নির্দ্বিধায় যে লোকটি মানুষ খুন করতে পারে সে-ই কিনা শিশুর মতো ভেঙে পড়েছিলো কাল রাতে। ইচ্ছে করলে লোকটাকে ফেলে চলে যেতে পারতো সে। কেন যায় নি জানে না।

রেল চলে যাবার পর তাদের সিএনজিটা ছুটতে শুরু করলো আবার।

জামান বুদ্ধি করে গাড়ি নিয়ে আসে নি, সে এসেছে একটা মোটরসাইকেলে করে। তারা দুজন এসেছে। বাইকটা চালাচ্ছে ডিপার্টমেন্টে সদ্য যোগ দেয়া এক জুনিয়র ছেলে-হোমিসাইডে যাদেরকে বলা হয় জুনিয়র ইনভেস্টিগেটর।

ইকুরিয়া থানা থেকে সহযোগীতা পাওয়া যাবে তাই তিনজনের জায়গায় দু'জন এসেছে, ফলে মোটরসাইকেলে করে দ্রুত চলে আসতে পেরেছে প্রথম বুড়িগঙ্গা সেতুতে। এই সেতুর কাছেই সাদা রঙের গাড়িটা পাওয়া গেছে-একটা ভুয়া নাম-পরিচয়ে সেটা রেজিস্ট্রি করা। ডিটেইল চেক না করলে কোনো ট্রাফিক পুলিশ বুঝতে পারবে না গাড়িটার কাগজপত্র আসলে জাল।

ইকুরিয়া থানার দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর আগে থেকেই তাদের জন্য ব্রিজের গোড়ায় অপেক্ষা করছিলো। সাদা রঙের গাড়িটা এখনও জায়গামতোই আছে। পরে থানায় নেয়া হবে। সেই গাড়ির সামনেই থামলো জামানের মোটরসাইকেলটা।

থানার ইন্সপেক্টরদের সাথে পরিচয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে দ্রুত কাজে নেমে গেলো তারা।

জামান খেয়াল করলো ব্রিজের গোড়ায় সারি সারি সিএনজি পার্ক করা আছে। দৃশ্যটা দেখেই তার মাথায় চট করে একটা আইডিয়া চলে এলো। খুনি কি তাহলে গাড়িটা এখানে ফেলে রেখে কোনো সিএনজি'তে করে চলে গেছে?

এটার সম্ভাবনা আছে। যদি তা নাও করে থাকে এখানকার কেউ হয়তো মেয়েটাকে সহ খুনিকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেছে। এখান থেকেই তো খুনি সটকে পড়েছে, সুতরাং কাজটা এখান থেকেই শুরু করা যাক।

"একটু আগে এই মেয়েটা এখানে ছিলো, তাকে কি দেখেছেন?" সারি সারি সিএনজি'র মধ্যে থেকে একজন ড্রাইভারকে ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো জামান। ড্রাইভার লোকটা অলস ভঙ্গিতে বসেছিলো, ইকুরিয়া থানার দু'জন পুলিশ দেখে বের হয়ে এলো।

"না, স্যার। আমি তো এইমাত্র আইলাম। আপনে ট্যাগরা সালামরে জিগান...ওই তো অনেকক্ষণ ধইরা এইখানে আছে...ওর সিএনজি নষ্ট হইয়া গেছে। ওই কইতে পারবো।"

ট্যাগরা সালাম নিজের নষ্ট হয়ে যাওয়া সিএনজির পেছনের ঢাকনা খুলে উপুড় হয়ে কী যেনো দেখছে। পুলিশ দেখে সেও সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

"মাইয়াটারে তো চিনা চিনাই লাগতাছে..." ট্যাগরা সালাম ছবিটা দেখে বললো, ছবির দিকে চেয়ে থাকলেও মনে হচ্ছে অন্য দিকে চেয়ে আছে।

"একটু আগে দেখেছেন?" জামান জানতে চাইলো। "ঐ যে সাদা রঙের গাড়িটা আছে না...ওটা থেকে নেমেছে..." অদূরে পার্ক করে রাখা সাদা রঙের গাড়িটা দেখিয়ে বললো সে।

ট্যাগরা সালাম সাদা রঙের গাড়িটার দিকে তাকালো, কিন্তু জামানের কাছে মনে হলো সে রাস্তার অন্য একটা দিকে তাকাচ্ছে। লোকটা ট্যারা। গভীর মনোযাগ দিয়ে ছবিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো আবার।

"ঐ গাড়ি থেইকা নামছে?" মাথা নেড়ে সায় দিলো জামান। "গাড়ি থাকতে সিএনজি'তে উঠবো ক্যান?"

ট্যাগরা সালামের কথায় জামানের মেজাজ চড়ে গেলো। "সেটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি বলেন, মেয়েটাকে দেখেছেন কিনা।"

"গাড়ি থেইকা তো নামতে দেখি নাই..." খুব বিচক্ষণতার সাথে জবাব দিলো সে। তার চোখ পাশে দাঁড়ানো পুলিশের দিকে। জামান জানে লোকটা আসলে চেয়ে আছে তার দিকে।

"তাহলে কি থেকে নামতে দেখেছেন?"

"এইটা তো আমি কইবার পারুম না...আমি তো গাড়ির চিন্তায় অস্থির...ভাবতাছিলাম আইজকা জমার খরচ উঠবো কেমনে।"

"তাহলে আপনি দেখেন নি?" অধৈর্য হয়ে জামান বললো।

"আমি তো তা কই নাই।"

নড়েচড়ে উঠলো জামান। "তার মানে দেখেছেন?"

"হেরা তহন আমার কাছে আইয়া কইলো, ভাই যাইবেন নি?...আমি কইলাম, না। আমার গাড়ি তো নষ্ট"।

"এটা কে বললো?" জামান তার কথার মাঝখানে জিজ্ঞেস করলো।

"মাইয়াটার লগে যে ব্যাটা আছিলো হে..."

"তারপর?"

"তারপর আর কি...আমার পরে যে গাড়িটা আছিলো ঐটার কাছে গেলো...কইলো-"

লোকটার বেশি কথা শোনার মতো ধৈর্য নেই জামানের। "ঐ গাড়িটা কার ছিলো? তাকে কি আপনি চেনেন?"

"চিনুম না ক্যান...কন দেহি কী রকম কথা!" পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ইকুরিয়া থানার এক সাব-ইন্সপেক্টরকে বললো সালাম। তার দৃষ্টি এখনও বিভ্রান্ত করছে। জামানকে।

"সেই ড্রাইভারটা কে?...তার নাম কি?"

"আমাগো ইউসুফ ভাই...খুব ভালা লোক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, এইখানকার"

জামান ট্যাগরা সালামের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে, "ইউসুফ ড্রইভার এখন কোথায়?"

"কোথায় আবার! খ্যাপ মারতাছে...হের গাড়ি কি আমার মতোন নষ্ট অইছে নি যে বইয়া বইয়া বাল-" ট্যাগরা সালাম মনে মনে জিভ কাটলো। আরেকটু হলে পুলিশের সামনেই বেফাঁস কথাটা হয়ে যেতো।

"ইউসুফ ড্রাইভার এখানে কখন আসবে?" ট্যাগরা সালামের বেশি কথা শুনে তার মেজাজ বিড়ড়ে গেলেও লোকটার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে, সুতরাং মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রেখে শান্ত কণ্ঠে বললো জামান।

"ডাকলেই আইবো..."

"মানে?"

এবার দাঁত বের করে হেসে বললো ট্যাগরা সালাম, "হের লগে মোবাইল আছে তো।"

ট্যাগরা সালামের কাছ থেকে ফোন নাম্বারটা নিয়ে ইউসুফ ড্রাইভারকে ফোন করে জানা গেলো লোকটা এখন জিঞ্জিরা বাজারের কাছেই কোথাও আছে। পুলিশের পরিচয় দিলে লোকটা একটু থতমত খেয়ে গেলো। তবে জানালো দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই আসছে।

মাঝবয়সী ইউসুফ ড্রাইভার লোকটা যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে সেটা তার কপালের দাগ দেখেই বোঝা গেলো। বেশ ধীরস্থির আর নম্র স্বভাবের। জামান তাকে ছবিটা দেখালো।

"এই মেয়েটা এক যুবকের সাথে ছিলো, একটু আগে আপনার গাড়িতে উঠেছিলো তারা। চিনতে পেরেছেন?"

ইউসুফ ছবির দিকে চেয়ে চুপ মেরে গেলো। অবশেষে বললো, "তাগোরে খুঁজতাছেন ক্যান?"

"আমরা মেয়েটাকে খুঁজছি না, খুঁজছি তার সাথের ছেলেটাকে..."

"ছেলেটা কি করছে?" ভুরু কুচকে জানতে চাইলো ইউসুফ।

"সে কী করেছে সেটা আপনার জানা দরকার নাই, আপনি বলুন তাদেরকে কোথায় নামিয়ে দিয়ে এসেছেন।" জামান একটু ঝাঁঝের সাথেই বললো কথাটা। .

"আমি হেগোরে দেহি নাই," পাল্টা ঝাঁঝের সাথে বললো ইউসুফ।

জামান বুঝতে পারলো লোকটার সাথে অন্যভাবে কথা বলতে হবে। "ট্যাগরা সালাম নামের একজন বললো এই মেয়েটা আর এক যুবক আপনার গাড়িতে উঠেছিলো..."

ইউসুফ চুপ মেরে রইলো।

"মেয়েটার সাথে যে ছিলো সে খুব ডেঞ্জারাস লোক...আপনি জানেন না সে কী

করেছে।”

“জানি, ভালা কইরাই জানি।”

ড্রাইভার ইউসুফের কথা শুনে মারাত্মক ধাক্কা খেলো জামান। “আপনি জানেন সে কি করেছে!”

“প্রেমই তো করছে, খুনখারাবি তো আর করে নাই!”

“কি!?” জামান যারপরনাই বিস্মিত হলো। “আপনি এসব কী বলছেন?”

“কি কইতাছি হেইটা তো আপনেও জানেন...হুনেন, তাগোরে ধইরা লাভ হইবো না... এতোক্ষণে মনে হয় বিয়া কইরা ফালাইছে।”

প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, কিছু খাওয়া দরকার। গোসল করে একটু বিশ্রামও নেয়ার দরকার আছে। তার শরীরটা মোটেও ভালো যাচ্ছে না। গুলির আঘাতে অনেক ব্লিডিং হয়েছে। জ্বর জ্বর লাগছে। পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে সেটা ভাবার আগে দুটো কাজ করতে হবে তাকে : মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করা আর গলফ ব্যাগে থাকা বিশাল পরিমাণের টাকা নিরাপদ কোথাও রাখা।

তাদের সিএনজিটা থামলো গুলশানের এক গেস্টহাউজের সামনে। দোতলার এই গেস্টহাউজটি এই এলাকার আরো অসংখ্য গেস্টহাউজের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা কারণে ভিন্ন। এর মালিক ক্ষমতাসীন দলের একজন এম.পি। ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে ঢুকে পড়লো সেই গেস্টহাউজে।

মাঝবয়সী এক লোক বসে আছে ফ্রন্টডেস্কে। জায়গাটা একেবারে নিরিবিলি। বাস্টার্ড লোকটাকে বললো তাদের একটা রুম দরকার।

"নাইট স্টে করবেন, স্যার?" জানতে চাইলো লোকটা। বার বার আড়চোখে উমাকে দেখছে।

"না।"

হঠাৎ লোকটা দাঁত বের করে হেসে বাস্টার্ডকে এড়িয়ে ডেস্ক থেকে সরে গেলো। বাস্টার্ড পেছন ফিরে দেখলো এক মাঝবয়সী লোক, সঙ্গে বোরকা পরা এক মহিলাকে নিয়ে ফ্রন্টডেস্কের সামনে এসে তাদের পেছনে দাঁড়িয়েছে। বোঝা যাচ্ছে লোকটা এখানকার পুরনো এবং নিয়মিত কাস্টমার। ফ্রন্ট ডেস্কের লোকটা বাস্টার্ডের দিকে ফিরে বললো, "একটু ওয়েট করেন, প্লিজ। লোকটা ডেস্কের নীচ থেকে একটা চাবি বের করে মাঝবয়সী লোকটার হাতে তুলে দিলো। "২০৩, স্যার।" কোনো ফর্মালিটিজের ধার ধারলো না।

মাঝবয়সী লোকটা বোরকা পরা মহিলাকে নিয়ে হাসিমুখে চলে গেলো ২০৩ রুমে। বাস্টার্ড বুঝতে পারলো বোরকা পরার কারণ কি-নিজের পরিচিত মুখটা আড়াল করার চেষ্টা।

এবার বাস্টার্ডের দিকে ফিরলো লোকটা। "কী যেনো বলছিলেন?"

"রুম দরকার।" কাটাকাটাভাবে বললো সে।

"নাইট স্টে করবেন?" আবারো একই প্রশ্ন।

"না।"

মুখ টিপে হেসে আড়চোখে উমার দিকে তাকালো লোকটা।

তেমন কোনো ফর্মালিটিজ করতে হলো না। বাস্টার্ড নিজের নাম বললো তওফিক আহমেদ। একটা কাগজে স্বাক্ষর করার পর লোকটা অল্পবয়সী এক ছেলেকে ডেকে তাদেরকে রুমে নিয়ে যেতে বললো। তার রুম নাম্বার ২০৬। তার মানে দোতলায়।

ইচ্ছে করেই বাস্টার্ড গেস্টহাউজে উঠেছে। সে জানে এখানে তেমন কোনো ফর্মালিটি করতে হয় না। যেকোনো একটা নাম বললেই হলো। কেউ কিছু জানতে চাইবে না। হোটেলের চেয়ে অনেক ভালো আর নিরাপদ হলো গেস্ট হাউজ আর সেটা যদি হয় সরকারী দলে কোনো এমপি সাহেবের তাহলে তো কথাই নেই। বাস্টার্ড জানে এখানে ভুলেও পুলিশ আসবে না। সরকারী দল মানে রাজার দল, রাজা-বাদশাদের নিয়ে পুলিশ ঘাটাঘাটি করে না।

ঘরে ঢুকেই বিছানায় সটান হয়ে শুয়ে পড়লো বাস্টার্ড। শরীরটা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। চেয়ে দেখলো উমা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

"তুমি গোসল করে নিতে পারো। আমি একটু বিশ্রাম নিই।"

একটু দ্বিধাগ্রস্ত দেখালো তাকে।

"যাও, গোসল করে আসো। আমিও গোসল করবো একটু পর। তারপর খেয়ে নিতে হবে। এখানে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা নেই। বাইরে থেকে আমি নিয়ে আসবো।"

উমা আস্তে করে বিছানার প্রান্তে বসলো। "পিসির সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম।"

বাস্টার্ড উঠে বসলো বিছানায়। "তোমার পিসির কাছে ফোন করলেই পুলিশ জেনে যাবে আমরা কোথায় আছি।"

বিস্মিত হলো উমা। পুলিশ কিভাবে জানবে আমরা এখানে আছি?"

"তুমি বুঝবে না। তোমার পিসি'র ফোন নাম্বার পুলিশের কাছে চলে গেছে। ঐ নাম্বারটা খুব সম্ভবত ট্যাপিং করা হচ্ছে। ফোন করলেই তারা বুঝে যাবে,.."

"কিন্তু আমার পিসির কাছে তো কোনো মোবাইল নেই," বললো উমা।

এবার বাস্টার্ড অবাক হলো। "মোবাইল নেই! তাহলে তুমি তাকে ফোন করবে কিভাবে?"।

"পাশের ঘরে এক ভাড়াটিয়া আছে, তাকে ফোন করে যদি বলি জরুরি দরকার আছে তাহলে পিসিকে ফোনটা দেবে।"

একটু ভাবলো বাস্টার্ড। তার কাছে অনেকগুলো ফোন আছে। সবগুলোই বন্ধ। তবে তার নিজের নাম্বার থেকে সুলতান, লেডি গিয়াস কিংবা মিনা আপার নাম্বারে ফোন করা হয় নি। সেটা ব্যবহার করা যেতে পারে।

"ঠিক আছে, ফোন করতে পারো, তবে ফোনটা করবো আমি...তারপর তোমার পিসির কাছে ফোন দেয়া হলে তুমি কথা বোলো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মেয়েটি। উমার কাছ থেকে নাম্বারটা জেনে ডায়াল করলো বাস্টার্ড। ফোন করে কি বলতে হবে সেটাও বলে দিলো সে।

"আপনি সুলোচনা পিসিকে চাইবেন, বলবেন খুব জরুরি," বললো উমা।

"হ্যালো," একটা নারী কণ্ঠ বললো অপরপ্রান্ত থেকে।

"স্লামালাইকুম..."

"ওয়ালাকুম সালাম...কাকে চাই?"

"আমি একটু সুলোচনা পিসিকে চাইছিলাম...খুব জরুরি...আপনি যদি একটু কষ্ট করে উনাকে দিতেন খুব উপকার হতো।"

"একটু ধরেন।" ওপাশ থেকে কণ্ঠটা বললো।

কিছুক্ষণ পরই সুলোচনা পিসি ফোনটা ধরলে সাথে সাথে উমাকে ফোনটা দিয়ে দিলো সে।

"পিসি, আমি," উমা ব্যাকুল হয়ে বললো পিসিকে।

"হায় ভগবান! তুই কোথায়? কেমন আছিস? তোর চিন্তায় তো আমরা অস্থির হয়ে আছি..." মহিলা হরবর করে বলে চললো।

"পিসি, শোনো, আমি ভালো আছি।"

"মারে, পুলিশ তোকে খুঁজছে কেন? কী করেছিস তুই?"

"পিসি, আমি কিছু করি নি। তবে বিরাট একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি। সব বলবো," উমা বাস্টার্ডের দিকে তাকালে বাস্টার্ড মাথা নেড়ে সায় দিলো। "আমি ভালো আছি। খুব জলদি বাসায় ফিরে আসবো। আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না। পুলিশ এলে বলবে আমি কোথায় আছি তোমরা জানো না। আমার সাথে তোমাদের কোনো যোগাযোগ হয় নি।"

"এখন কোথায় আছিস?"

"পিসি, সব বলবো। এখন কোনো প্রশ্ন কোরো না...বাবাকে বলবে আমি মায়ের সাথে হাসপাতালে আছি।"

"বাবাকে নিয়ে চিন্তা করিস না...তোর মায়ের অবস্থাও ভালো। আমি একটু আগে গিয়ে দেখা করে এসেছি। তোর কথা জিজ্ঞেস করলো...বললাম তুই কাজ নিয়ে একটু ব্যস্ত আছিস।"

"ঠিক আছে, পিসি। এখন রাখি, পরে আবার যোগাযোগ করবো।"

"ভগবান তোর মঙ্গল করুক।"

ফোন রেখে বাস্টার্ডের দিকে তাকালো উমা।

"যাও, এবার গোসল করে নাও। আমি খাবার নিয়ে আসছি।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

একটু আগে জামানের কাছ থেকে ফোনে সব জানতে পেরেছে জেফরি। খুনি একটা সিএনজি'তে করে পালাতে চেয়েছিলো কিন্তু ব্রিজের উপর টহল পুলিশের ব্যারিকেড দেখেই গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যায় ব্রিজের গোড়ায়। ড্রাইভার ইউসুফকে একটা প্রেমকাহিনীর গল্প বলে পটিয়ে ফেলে। বেচারা সহজ সরল ড্রাইভার সেই প্রেমকাহিনী বিশ্বাস করে খুনিকে দ্রুত নিরাপদে পালিয়ে যাবার বুদ্ধিটা দিয়ে দেয়। সিএনজি ড্রাইভার ইউসুফের কাছ থেকে মূল্যবান একটি তথ্য পাওয়া গেছে : খুনির গন্তব্য ছিলো গুলশানে।

ঠিক আছে, তাহলে গুলশানে খুনির একটা ঠিকানা আছে হয়তো। সেখানে একটু নজরদারি করতে হবে। মনে মনে গুছিয়ে নিলো ব্যাপারটা।

ত্রিশ বছরের এক যুবক, সঙ্গে পঁচিশ বছরের এক যুবতী, যুবকের হাতে একটা ব্যাগ আছে। তাদের গন্তব্য ছিলো গুলশানে। কোনো গাড়ি ব্যবহার করছে না। রিক্সা ব্যবহার করতে পারবে না। গুলশানের বেশিরভাগ রোডেই রিক্সা চলে না। তাহলে? সিএনজি কিংবা ট্যাক্সিক্যাব ব্যবহার করবে তারা। গুলশান থানা আর ঐ এলাকার সব ট্রাফিক-পুলিশকে জানিয়ে দিতে হবে।

জামানকে ফিল্ডে পাঠিয়ে যে ভালো ফল পাওয়া গেছে তাতে করে জেফরি ভীষণ খুশি। সে জানে ঘরে বসে যতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তিই ব্যবহার করা হোক না কেন ফিল্ডের কোনো বিকল্প নেই। মাঠে নামলেই পরিস্কার চিত্র পাওয়া যায়।

একটু আগে হোমিসাইডের প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক ফারুক আহমেদের রুমে গিয়েছিলো সে। মহাপরিচালক মোটামোটি সন্তুষ্ট। ঘটনা ঘটার পর মাত্র এক দিন অতিক্রান্ত হয়েছে, এতো অল্প সময়ে যতোটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাতে তিনি খুশি। জেফরিকে আরো সময় নিয়ে কাজ করতে বলেছেন তিনি। এতো তাড়াহুড়ার কিছু নেই। তিনটি খুন যদি একই সূত্রে গাঁথা হয়ে থাকে তাহলে হাতে যথেষ্ট সময় আছে। সে যেনো ধীরেসুস্থে তদন্ত করে। সময়ের ব্যাপারে কোনো রকম চাপ নেই।

"স্যার?"

নিজের ডেস্কে বসে আছে জেফরি। মুখ তুলে তাকালো। রমিজ লস্কর দরজা দিয়ে মাথা বের করে রেখেছে।

"আসো।"

"স্যার, কমিউনিকেশন রুম থেকে এলাম...একটা ফোন ডিটেক্ট করা গেছে।"

নিজের চেয়ারে সোজা হয়ে বসলো জেফরি। "কোন ফোনটা?"

"উমা রাজবংশী নামের মেয়েটার পাশের ঘরে যে ভাড়াটে থাকে তার ফোনটা। আমরা তো তার পাশের ঘরে প্রায় সবার ফোন নাম্বার জোগাড় করেছিলাম..."।

"কোত্থেকে করেছে?"

"গুলশানের একটা প্রাইভেট প্রোপার্টি থেকে কলটা করা হয়েছে। আমাদের ম্যাপে জায়গাটার তেমন কোনো ডেসক্রিপশন নেই। শুধু দেখা যাচ্ছে প্রাইভেট পোপার্টি।"

গুলশান! একটু আগেই সে এটা ভাবছিলো। "হোল্ডিং নাম্বারটা কতো?"

"৭ নাম্বার রোডের ২৩ নাম্বার বাড়ি, স্যার।"

ঢাকা শহরের ভার্চুয়াল ম্যাপ তৈরি করার সময় যেসব জায়গা আভার কনস্ট্রাকশনে ছিলো সেগুলোকে শুধুমাত্র হোল্ডিং নাম্বার দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই জায়গাটা বোধহয় সেরকম কোনো জায়গা হবে। তা না হলে আরো কিছু ডেসক্রিপশন থাকতো।

নিজের মোবাইল ফোনটা বের করে জামানকে ফোন করলো জেফরি। রিং হচ্ছে, কিন্তু কেউ ফোন ধরছে না। মোটরসাইকেলে আছে। রিং হবার শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। জেফরি আবারো চেষ্টা করলো। চার বারের বার কলটা রিসিভ করলো জামান।

"জি, স্যার?"

"তোমরা এখন কোথায় আছো?"

"মতিঝিলে, স্যার।"

"শোনো, অফিসে আসার দরকার নেই, তোমরা গুলশান দুই নাম্বারে চলে যাও। সেখানে ৭ নাম্বার রোডের ২৩ নাম্বার হোল্ডিং নাম্বারটায় সম্ভবত খুনি আর মেয়েটা আছে...জায়গাটা খুঁজে বের করে লোকাল থানার সাহায্য নিয়ে রেড দেবে। দ্রুত কাজ করতে হবে, ঠিক আছে?"

"জি, স্যার।"

বাস্টার্ড গুলশান দুই নাম্বারের গোলচক্করে এসে একটা রেস্তোরাঁ দেখতে পেলো। এখানে অনেক ফাস্টফুডের আউটলেট থাকলেও ভালোমানের বাংলা খাবারের রেস্তোরাঁর সংখ্যা খুব বেশি নেই। বাস্টার্ডের ইচ্ছে করছে দেশি খাবার খেতে।

দু'জনের জন্য লাঞ্চ নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো কারণ রিক্সা পাওয়া যাচ্ছে না। যে গেস্টহাউজে উঠেছে সেখানে রিক্সা যায়ও না, অগত্যা পায়ে হেঁটেই রওনা হলো সে। শরীর যে খুব দুর্বল হয়ে গেছে টের পেলো। রীতিমতো হাফাচ্ছে। এটুকু পথ হাঁটতেই এই অবস্থা!

ঠিক করলো পেট ভরে খেয়েদেয়ে একটু রেস্ট নেবে। কী করবে না করবে সেসব পরে ভাবা যাবে, আগে তার প্রয়োজন বিশ্রামের।

মেইন রোড থেকে ৭ নাম্বার রোডে ঢুকতেই দেখতে পেলো দু'জন মোটরসাইকেল আরোহী ফুটপাতের পাশে বাইক থামিয়ে এক লোককে কী যেনো জিজ্ঞেস করছে। বাস্টার্ডের গা ছমছম করে উঠলো। কিন্তু নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে পারলো সে। ইচ্ছে করেই মোটরসাইকেল আরোহীদের কাছ দিয়ে এগিয়ে গেলো যেনো তাদের কথাবার্তা শুনতে পায়।

"হাউজ নাম্বার ২৩ কোনো বাসা বাড়ি না?" মোটরসাইকেলে পেছনের সিটে যে বসে আছে সে বললো পথচারীকে।

"না। ওইটা তো গেস্টহাউজ। সামনে গিয়া ডাইনে গেলেই দেখবেন বড় কইরা গেস্টহাউজ লেখা আছে," লোকটা বললো।

বাস্টার্ড তার হাটা ধীরগতির করে ফেললো। তার হাতে খাবারের প্যাকেট। হঠাৎ থেমে গিয়ে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের কর কথা বলার ভান করলো সে। চলতিপথে ফোন এসে পড়েছে, ফোনে কথা বলতে ব্যস্ত। একজন মানুষ। মোটরসাইকেল আরোহীদের সামনে এসে অন্য দিকে তাকিয়ে কাল্পনিক সংলাপে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

যে লোকটাকে মোটরসাইকেল আরোহীরা থামিয়েছিলো সে চলে গেলো নিজের গন্তব্যে। বাস্টার্ড এখনও ফোনালাপে ব্যস্ত। তবে একেবারে থেমে না থেকে এক পা দু'পা করে এগোতে লাগলো যেনো আরোহীরা সন্দেহ না করে। মোটরসাইকেলটা তাকে অতিক্রম করে সামনে চলে গেলে সেও হাটার গতি বাড়িয়ে দিলো সঙ্গে সঙ্গে।

গেস্টহাউজের সামনে এসে আবারো মোটরসাইকেলটা থামলো। এবার . আরোহীদের একজন কার সাথে যেনো ফোনে কথা বলছে। বাস্টার্ড তার কানে ফোনটা ধরে রেখে আস্তে আস্তে মোটরসাইকেলের সামনে দিয়ে যাবার সময় শুধু অল্প কিছু কথাই শুনতে পেলো, কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট।

"স্যার, এটা একটা গেস্টহাউজ,..জি...স্যার...না, স্যার...থানা থেকে ব্যাকআপ টিম আসার জন্যে বলি নি...আগে জায়গাটা লোকেট করে নিলাম... এক্ষুণি বলছি...ঠিক আছে, স্যার। জি, স্যার..."

হন হন করে হেঁটে গেলো সে। কোমরে পিস্তলটার অস্তিত্ব টের পেলো। এটার হয়তো দরকার হতে পারে। মাইগড! আবারো তারা তার অবস্থানের কথা জেনে গেছে!

কিন্তু কিভাবে?

এসব পরে ভাবা যাবে, এখন দরকার দ্রুত গেস্টহাউজে ঢোকা। সে বুঝে গেছে এই দু'জন মোটরসাইকেল আরোহী পুলিশের ব্যাকআপ টিমের সাহায্য চেয়ে পাঠাবে এক্ষুণি। গুলশান থনায়! হ্যাঁ। এখান থেকে থানাটা কতোক্ষণের পথ?

বুঝতে পারলো খুব বেশি সময় তার হাতে নেই।

বাস্টার্ড টের পেলো তার কপাল বেয়ে ঘাম জমতে শুরু করেছে। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলো। জানে, মাথা ঠাণ্ডা না রাখলে বিপদে পড়ে যাবে। মোটরসাইকেল আরোহীদের অতিক্রম করে ঢুকে পড়লো গেস্টহাউজে। দ্রুত ভেবে নিলো কি করবে।

তার রুমের সামনে এসেই মাথায় একটা আইডিয়া চলে এলো। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো ২০৩ রুমটা কোথায়। খুব কাছেই থাকার কথা। এই রো'তেই হবে। হ্যাঁ। ঐ তো, তার রুমের দুটো রুমের পরই।

নিজের রুমের দরজায় পর পর তিন-চারটা টোকা দিলে একটু পরই দরজা খুলে দিলো উমা। সদ্য গোসল করেছে। চুলগুলো এখনও ভেজা। তোয়ালে দিয়ে পেঁচিয়ে রেখেছে। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে খাবারের প্যাকেটটা কফি টেবিলের উপর রেখে দিলো সে। উমা বুঝতে পারছে তার মধ্যে এক ধরণের অস্থিরতা কাজ করছে।

"জলদি চলো, আমাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে," উমাকে তাড়া দিয়ে বললো সে।

"কেন, কি হয়েছে?" ভয় পেয়ে গেলো উমা।

"কোনো প্রশ্ন কোরো না, যা বলছি তাই করো।"

পুলিশ? আৎকে উঠলো মেয়েটা। এখানে!

গলফ ব্যাগটা হাতে নিয়ে নিলো বাস্টার্ড। "মাথা থেকে তোয়ালেটা খুলে ফেলো। কাপড়চোপড় ঠিক করে নাও...জলদি!"

ঘরের ভেতর একটা বন্ধ জানালার সামনে চলে গেলো বাস্টার্ড। খুব সম্ভবত জানালাগুলো দিয়ে গেস্টহাউজের সামনে যে পার্কিংলনটা আছে সেটা দেখা যায়, তার মানে মেইন গেটটাও দেখা যাবে। জানালার ভারি পর্দা সরিয়ে একটু ফাঁক করতেই তার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেলো।

মোটরসাইকেলটা হুরমুর করে গেস্টহাউজে প্রবেশ করছে, তাদের ঠিক পেছন পেছন পুলিশের একটা জিপ।

ফাঁদে পড়ে গেছে সে!

গেস্টহাউজে পুলিশের গাড়ি হুরমুর করে ঢুকে পড়তেই চরম নাটকীয় অবস্থার সৃষ্টি হলো। বেশিরভাগ গেস্টের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশি সময় নিলো না। তবে গেস্টহাউজের কর্তৃপক্ষ শুধু বিস্মতই হলো না, রেগেমেগে রীতিমতো যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে আঁটকে দিলো জামানসহ গুলশান থানা থেকে আগত পুলিশের ছোটোখাটো দলটাকে। হাজার হলেও সরকারী দলের এম.পি সাহেবের গেস্টহাউজ, এভাবে পুলিশের আগমনে তাদের যে অপূরণীয় সুনাম হানি হবে সেটা কি কেউ পুষিয়ে দিতে পারবে, পারবে না। তাদের এখানে সমাজের অনেক উঁচুতলার লোক আসে, কেন আসে? নিরাপদ মনে করে তারা।

ফ্রন্ট ডেস্কের সামনে দু'পক্ষের তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেলো।

ইতিমধ্যে গেস্টহাউজের ম্যানেজার এম.পি সাহেবকে ফোন করে জানালো, তিনি পুলিশকে রীতিমতো ভর্ৎসনা করতে শুরু করে দিয়েছেন টেলিফোনে। কিন্তু পুলিশ নাছোড়বান্দা। একজন ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী-খুনি গেস্টহাউজে আছে। ব্যাপারটা এম.পি সাহেবকে বুঝতে হবে। তিনি তো আইনপ্রণেতা। তিনি কি নিজের গেস্টহাউজে একজন খুনিকে আশ্রয় দিতে পারেন? না। ঠিক আছে, এম.পি সাহেব একমত পোষণ করে বললেন। তবে পুলিশের উচিত ছিলো আগেভাগে জানিয়ে আসা, তাহলে অন্তত গেস্টেদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়তো না। কিন্তু পুলিশ যেভাবে তার গেস্টহাউজে প্রবেশ করেছে তাতে করে তার বিরাট রকমের ব্যবসায়িক ক্ষতি হয়ে গেছে। তাদের বোঝা উচিত ছিলো এটা এম.পি সাহেবের গেস্টহাউজ।

গুলশান থানার সাব-ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে ফোনটা নিয়ে জামান কথা বললো এম.পি সাহেবের সাথে।

"স্যার, খুনিকে ট্রেস করতে করতে আমরা এখানে এসেছি। আগে থেকে জানার কোনো উপায় ছিলো না। তা না হলে অবশ্যই আপনাকে জানিয়ে আসতাম।"

মনে হলো এম.পি সাহেব কিছুটা নমনীয় হলেন। "না, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু-"

জামান কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো, "স্যার, আমরা কোনো গেস্টকেই ডিস্টার্ব করবো না। শুধু যে রুমে খুনি আছে সেই রুমটা তল্লাশী করবো।"

"কিন্তু আপনারা কি করে জানবেন খুনি কোন্ রুমে আছে?" এম.পি সাহেবের সন্দিগ্ধ কণ্ঠ।

"স্যার, আমাদের কাছে খুনির ছবি আছে। আপনার ম্যানেজারকে ছবি দেখালেই বলে দেবে কোন রুমে সে আছে।" ইচ্ছে করেই জামান একটু মিথ্যে বললো। আসলে তার কাছে আছে উমা নামের মেয়েটির ছবি।

এম.পি সাহেব একটু ভেবে বললেন, "ঠিক আছে, আপনি যা বলছেন তা করতে পারেন তবে কোনো গেস্টকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না। অন্য কারোর রুমে গিয়ে তল্লাশীও চালানো যাবে না। শুধু আমার ম্যানেজার যে রুমের কথা বলবে, মানে যে রুমে আপনার ঐ খুনি আছে, শুধু সেই রুমটা, ঠিক আছে?"

"জি, স্যার। আপনি এ নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না।"

"ঠিক আছে, আমার ম্যানেজারকে দিন।"

জামান গেস্টহাউজের ম্যানেজারের দিকে ফোনটা বাড়িয়ে দিলো। লোকটা কানের কাছে ফোন নিয়ে শুধু জি জি করে গেলো এক নাগাড়ে। ওপাশ থেকে একগাদা নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে, বুঝতে পারলো জামান।

ফোন রেখে ম্যানেজার জামানের দিকে ফিরলো। "আপনার কাছে নাকি খুনির ছবি আছে? দেখান আমাকে।"

জামান উমার ছবিটা তার হাতে তুলে দিলো। "দু'জন খুনি। একজনের ছবি আমাদের কাছে আছে..."

ম্যানেজার চোখ তুলে তাকালো জামানের দিকে। "মহিলা খুনি?"

"হুম...কিন্তু এই মহিলার সঙ্গে যে পুরুষটা আছে সে খুব বিপজ্জনক।"

মাথা দোলালো ম্যানেজার। "হ্যাঁ, এই মহিলা আর এক লোক কিছুক্ষণ আগেই এখানে উঠেছে।"

"কতো নাম্বার রুমে?" উত্তেজিত হয়ে উঠলো জামান।

"২০৬-এ।"

ম্যানেজারের কাছ থেকে জামান ২০৬-এর স্পেয়ার চাবি নিয়ে নিলো, তারপর গুলশান থানার পুলিশের দলটিকে সাথে নিয়ে ছুটে চললো সেই রুমের দিকে।

পুলিশের দলটি নিঃশব্দে অবস্থান নিয়ে নিলো ২০৬-এর দরজার দু'পাশে। জামান ইতিমধ্যে তার অটোমেটিকটা হাতে তুলে নিয়েছে। বলতে গেলে এই রেইডের নেতৃত্ব দিচ্ছে সে-ই।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে মৃদু টোকা দিলো। কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। দু'পাশে সশস্ত্র পুলিশদের দিকে একবার তাকালো সে। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জানালো তারা প্রস্তুত আছে।

স্পেয়ার চাবিটা ঢুকালো দরজার কি-হোলে। আস্তে করে ঘুরিয়ে দরজাটা দুই তিন ইঞ্চির মতো ফাঁক করে বুঝতে পারলো ভেতরে কোনো আলো জ্বলছে না। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় রুমের ভেতর ঢুকে পড়লো সে, হাতের অস্ত্রটা দু'হাতে ধরে একেবারে সোজা নাক বরাবর তাক করে রেখেছে।

তার ঠিক পেছনে থাকা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকেই দরজার পাশে সুইচ টিপে দিলে বাতি জ্বলে উঠলো।

কেউ নেই!

রুম নাম্বার ২০৬-এ কেউ নেই!

বাথরুমটা চেক করে দেখা হলো। একদম ফাঁকা।

বিছানার পাশে ছোট্ট কফি টেবিলের উপর দুই প্যাকেট খাবার পড়ে আছে, কিন্তু খাওয়ার লোকগুলো উধাও হয়ে গেছে। একেবারে ভেলকিবাজির মতো . ব্যাপার।

গেলো কোথায়!

পুলিশ ঢোকার সাথে সাথেই বাস্টার্ড টের পেয়ে যায় বিরাট এক হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে। এটাকে কাজে লাগিয়ে এখান থেকে সটকে পড়তে হবে। ভাগ্য ভালো, বিপদের মুহূর্তে তার মাথাটা বেশ ভালোমতো কাজ করেছে। দেখতে পায় উমা ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

যতোক্ষণ পুলিশ আছে এখান থেকে বের হতে পারবে না। কারণ মেইন গেট দিয়ে কোনোভাবেই কারো চোখে ফাঁকি দিয়ে বের হওয়া সম্ভব নয়। তবে এ ঘরে থাকলে বিপদে পড়ে যাবে। এখান থেকে বের হতে হবে। মাথাটা দ্রুত কাজ করতে শুরু করে তার। গলফ্ ব্যাগটা হাতে নিয়ে উমাকেসহ বেরিয়ে পড়ে রুম থেকে। সে জানতো কোথায় যেতে হবে তাকে।

রুম নাম্বার ২০৩-এর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আলতো করে টোকা মারে। প্রথম তিন-চারটি টোকায় কোনো সাড়া পায় নি। তবে যে-ই না ফিসফিসিয়ে বলে, "স্যার, আমি রুমসার্ভিস...দরজা খুলুন..."

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে একটা ভয়ার্ত কণ্ঠ জানতে চায়, বাইরে নাকি পুলিশ এসেছে?"

"জি, স্যার...আপনার কোনো ভয় নেই। দরজা খুলুন। ম্যানেজার সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন। লোকটা দেরি করাতে আবার তাড়া দেয় সে। "স্যার, দেরি করবেন না, প্লিজ..."

আর দেরি করে নি, ভেতর থেকে দরজা খুলে দেয় মাঝবয়সী লোকটা। বাস্টার্ডকে দেখে ভড়কে যায় সে কিন্তু অস্ত্রের মুখে বোবা হওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারে নি।

উমাকে নিয়ে খুব সহজেই রুম নাম্বার ২০৩-এ ঢুকে পড়ে।

"কোনো চিৎকার চেঁচামেচি করবেন না," পিস্তলটা উঁচিয়ে বললো বাস্টার্ড।

মাঝবয়সী লোকটা স্যান্ডো গেঞ্জি আর পাজামা পরে আছে। সঙ্গের মহিলা যে খুলে ফেলা শাড়ি তড়িঘড়ি করে আবার পরেছে সেটা তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। বোরকা পরার কারণে মহিলাকে দেখে চিনতে পারে নি, এখন বুঝলো মহিলা আর কেউ নয়, এক টিভি অভিনেত্রী। ঠিক নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করে না তবে নিয়মিত টিভি নাটকে তাকে দেখা যায়। বাস্টার্ড মহিলার নাম না। জানলেও উমা জানে এই মহিলার নাম রোমেনা চৌধুরি।

"আপনারা কি পুলিশ?" বেশ সন্দিগ্ধ হয়ে জানতে চাইলো লোকটা। বাস্টার্ডের সাথে উমাকে দেখে ভুরু কুচকে রেখেছে।

"চুপ! কোনো কথা বলবেন না। লোকটার মাথা বরাবর পিস্তল তাক করে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললো, "আমি যা বলবো তাই করতে হবে, নইলে দুটোকেই গুলি করবো।"

পিস্তলের মুখে ভয়ে মাথা নেড়ে লোকটা জবাব দিলো, "ভাই, প্লিজ...ওটা সরিয়ে রাখুন। যা বলবেন তাই করবো, কিন্তু ওটা সরিয়ে রাখুন।"

ফ্রন্ট ডেস্কের সামনে আবারো হট্টগোল। জামানের সাথে গেস্টহাউজ ম্যানোরের তকাতর্কি। ম্যানেজারের সাফ কথা, রুম নাম্বার ২০৬-এ খুনি উঠেছিলো, এখন তো তারা সবাই নিজের চোখেই দেখেছে ওখানে কেউ নেই। সম্ভবত খুনি পালিয়েছে। সুতরাং পুলিশের উচিত এখান থেকে চলে যাওয়া। তারা তো এম.পি সাহেবকে এ কথাই দিয়েছিলো, নাকি?

কিন্তু চারদিকে পুলিশ থাকা সত্ত্বেও তারা কিভাবে পালালো?

আচ্ছা, ভালো প্রশ্ন। ম্যানেজারের মনে পড়ে গেলো একটা কথা। তথাকথিত খুনি গেস্টহাউজে ওঠার কিছুক্ষণ পরই তো বাইরে বেরিয়ে গেছিলো। তাকে তো আর ফিরে আসতে দেখে নি। আসলে বাস্টার্ড যখন খাবারের প্যাকেট নিয়ে ফিরে এসেছিলো তখন ফ্রন্ট ডেস্কে ম্যানেজার লোকটা ছিলো না।

"ঐ লোকটা রুমে ঢোকার কিছুক্ষণ পরই তো বের হয়ে যায়, তাকে তো আর ফিরে আসতে দেখি নি," জামানকে বললো ম্যানেজার।

"তাই নাকি," অবাক হলো জামান। "তাহলে সেটা আমাদের আগে বলেন নি কেন?"

"ঐ সময়ে মনে পড়ে নি, কিন্তু এখন যখন বলছেন লোকটা তার রুমে নেই তখনই মনে পড়ে গেলো!"

জামান কথাটা বিশ্বাস করতে পারলো না। সে নিশ্চিত, এই ম্যানেজার লোকটা তাদেরকে এখানে থেকে ভাগানোর জন্য চালাকি করছে।

"এমনও তো হতে পারে, খুনি অন্য কোনো রুমে ঢুকে আছে?" বললো জামান।

"অন্য কোনো রুমে ঢুকবে কি করে?...তার কাছে কি সব রুমের চাবি আছে নাকি?"

"আহ, চাবি থাকবে কেন...অন্য কোনো রুমে জোর করেও তো ঢুকে যেতে পারে। মনে রাখবেন তার কাছে পিস্তল আছে।"

ম্যানেজার একটু ঢোক গিললো। "আমার তা মনে হচ্ছে না।"

জামান সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো লোকটার দিকে।

"ঐ লোকটা, মানে যাকে আপনারা খুনি বলছেন সে কি আপনাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেখেছে? সে কি জানতো আপনারা এখানে আসবেন?"

জামান কিছু বললো না।

"আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেনো ঐ লোকটা আপনাদের দেখে " ফেলেছে, তারপর হুট করে অন্য আরেকটা রুমে ঢুকে পড়েছে। আমি বুঝি না এইসব কেন বলছেন।"

অবাক হলো জামান। "কেন বলছি?"

"এই অজুহাতে আপনি সবগুলো রুম চেক করে দেখতে চাইছেন।" ম্যানেজার দৃঢ়তার সাথে বললো। যেনো জামানের চালাকিটা সে ধরে ফেলেছে।

উফ! মনে মনে বললো জামান। "আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, আপনার গেস্টহাউজে একজন খুনি ঢুকে বসে আছে আর আপনি কিনা রেপুটেশন নিয়ে চিন্তা করছেন। এখানে আপনার কোনো গেস্ট খুন হয়ে গেলে আপনাদের রেপুটেশনের কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছেন?"

ম্যানেজার একটু ভড়কে গেলো।

"এই খুনি গতকাল কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে তিন তিনটি খুন করেছে?"

ঢোক গিললো ম্যানেজার।

"আরো তিন-চারটা খুন করা তার জন্যে কোনো ব্যাপারই না।"

মনে হলো ম্যানেজার চিন্তায় পড়ে গেছে। "একটু দাঁড়ান। লোকটা এ কথা বলেই তার মনিবের কাছে ফোন করলো।

"স্যার, পুলিশ তো রুম চেক করে কাউকে পায় নি...এখন বলছে সবগুলো রুম চেক করবে..." ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে কিছুক্ষণ কথা শুনে গেলো তারপর জামানের দিকে বাড়িয়ে দিলো ফোনটা।

"স্লামালেকুম, স্যার...জি, স্যার...না, সেটা তো বলেছিলাম কিন্তু...জি, জি, " কিছুক্ষণ চুপচাপ কথা শুনে গেলো জামান। "স্যার, তাহলে অন্তত প্রতিটি রুমে আপনার লোক গিয়ে চেক করে আসুক। আমাদেরকে জানাক সব ঠিক আছে?...আমরা না হয় গেলাম না...কি বলেন?"

আবারো কিছুক্ষণ কথা শুনে গেলো।

"না, আমরা ফ্রন্ট ডেস্কের এখানেই থাকবো...জি, স্যার...আপনার ম্যানেজার কিংবা অন্য কেউ গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবে...জি, জি...স্লামালেকুম, স্যার।"

জামান ফোনটা ম্যানেজারকে দিয়ে দিলে সেও কিছুক্ষণ কথা শুনে ফোনটা রেখে দিলো।

"শুনেন," জামানকে বললো ম্যানেজার। প্রতি রুমে রুমে লোক পাঠানোর দরকার নেই...বুঝেনই তো, গেস্টরা বিরক্ত হবে। কে কী অবস্থায় আছে কে জানে!" কথাটা বলেই একটু ভুরু নাচিয়ে ইঙ্গিত করলো সে। জামান বুঝতে পারলো লোকটা কি বলতে চাচ্ছে। আমি বলি কি, ইন্টারকমে সবগুলো রুমে খোঁজ নিলেই ভালো হয়। সন্দেহজনক কিছুর আভাস পেলে না হয় চেক করে দেখা যাবে?"

লোকটার কথায় যুক্তি আছে। জামান একটু ভেবে রাজি হয়ে গেলো। ভালো করেই জানে বেশি চাপচাপি করলে এম.পি সাহেব হয়তো পুরোপুরি বিগড়ে যাবে। মন্দের ভালো হিসেবে এটা করা যেতে পারে।

"ঠিক আছে, তাই করুন। কিন্তু একটা শর্ত আছে..."

জামানের দিকে ভুরু কুচকে তাকালো ম্যানেজার। "কি শর্ত?"

"ইন্টারকমে আপনি কথা বলার সময় লাউডস্পিকারে দিয়ে রাখবেন যাতে আমি শুনতে পাই।"

ম্যানেজার একটু ভেবে নিলো। "কিন্তু গেস্টরা যেনো জানতে না পারে আপনারা তাদের কথা শুনছেন, কেউ কোনো শব্দ করবেন না, আমি এক এক করে তাদের সাথে কথা বলবো।"

ম্যানেজার এক এক করে গেস্টদের সাথে ইন্টারকমের মাধ্যমে কথা বলতে আরম্ভ করলো।

"হ্যালো স্যার, একটু ডিস্টার্ব করলাম, কিছু মনে করবেন না..."

"এখানে নাকি পুলিশ এসেছে?" আতঙ্কগ্রস্ত একটি কণ্ঠ জানতে চাইলো।

"জি, স্যার, এসেছে কিন্তু অন্য একটা কাজে...আপনাদের কোনো সমস্যা নেই।"

"কি কাজে এসেছে?"

'ওরা এসেছে আমাদের রিকোয়েস্টে...এখানে নাকি ফেরারি এক আসামি উঠেছে, তাকে ধরার জন্য..."

"তাকে কি ধরেছে?"

"না, স্যার, পায় নি।"

"তাহলে ওরা চলে যাচ্ছে না কেন?"

"এখনই চলে যাবে, স্যার। আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য কল করেছি...আপনারা ঠিক আছেন কিনা...?"

"আমরা ঠিক আছি।"

"কোনো সমস্যা নেই তো, স্যার?"

"না, কোনো সমস্যা নেই।"

কম বেশি এরকম কথোপকথনই চললো বাকি গেস্টদের সাথে।

সব ঠিক আছে। কোনো গেস্টই সামান্যতম সমস্যার কথা জানালো না। শুধু পুলিশের উপস্থিতি ছাড়া। লাউডস্পিকারে জামানও সব শুনেছে। তার কাছেও কারো কথা শুনে মনে হয়নি যে, অস্ত্রের মুখে খুনি কথা বলিয়ে নিচ্ছে। দুয়েকজন গেস্টের মধ্যে যে নার্ভাস ভাব

ছিলো সেটার কারণ একেবারে ভিন্ন।

মানসম্মানের ভয়!

অগত্যা জামানকে গেস্টহাউজ ছেড়ে চলে আসতেই হলো, কিন্তু তার মনের সংশয় কাটলো না। কিভাবে জাদুর মতো ভেলকি দেখিয়ে খুনি সটকে পড়লো? ম্যানেজার বলেছে তারা আসার দশ-পনেরো মিনিট আগে নাকি খুনি রুম থেকে বের হয়ে গেছিলো, তাকে আর ঢুকতে দেখে নি। তাহলে কি আবারো সে পুলিশের আগমনের কথা আগেভাগে জেনে গেছে?

খুনি তো এর আগেও কয়েকবার এরকম করেছে। সুতরাং এটা তো খুবই সম্ভব। তাহলে কি তার ধরাণাই ঠিক?

এটা আসলে গোয়েন্দা সংস্থার কোনো গোপন অপারেশন।

হয়তো পেশাদার কোনো খুনিকে দিয়ে কাজটা করানো হয়েছে। এখন তাকে রক্ষা করার জন্যে আগেভাগে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে সব কিছু। পর্দার অন্তরালে একটা সংস্থা সক্রিয়, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। কিন্তু সমস্যা হলো তার বস জেফরি বেগ এরকম কোনো থিওরি'তে বিশ্বাসী নয়।

গেস্টহাউজ থেকে বের হয়েই জেফরিকে ফোন করে জানালো গেস্টহাউজে খুনিকে পায় নি।

"সব রুম চেক করে দেখেছো?" ওপর প্রান্ত থেকে জেফরি জানতে চাইলো।

"না, স্যার। খুনি যে রুমে উঠেছিলো সেই রুমটা দেখেছি। নেই।"

"সব রুম চেক করে দেখো।"

"স্যার, গেস্টহাউজটা সরকারী দলের এক এম.পি সাহেবের.. খুবই প্রভাবশালী একজন, অনেক কষ্টে সবগুলো রুমে ইন্টারকম দিয়ে গেস্টদের সাথে কথা বলে দেখেছি, কোনো রুমে খুনি আছে বলে মনে হয় না।"

জেফরি একটু ভেবে নিলো। "ঠিক আছে, আরেকটু নিশ্চিত হবার জন্য তোমরা একটা কাজ করো, গেস্টহাউজের আশেপাশে কড়া নজরদারি রাখো...উম, আধঘণ্টার মতো। তারপর যদি সন্দেহজনক কিছু না পাও চলে এসো।"

"ঠিক আছে, স্যার।"

গুলশান থানার পুলিশের দলটাকে বিদায় করে দিয়ে গেস্টহাউজ থেকে একটু সামনে এসে মোটরসাইকেলে থাকা জুনিয়র ইনভেস্টিগেটর ছেলেটাকে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো জামান। তার ধারণা বরাবরের মতোই খুনি সটকে পড়েছে। তবে নিশ্চিত হতে দোষ কী।

বাস্টার্ড পাঁচ মিনিট আগে জানালার পর্দা সরিয়ে দেখতে পেয়েছে পুলিশের দল চলে গেছে। তবে তার ধারণা গেটের বাইরে এখনও পুলিশ আছে। এখানে থাকাটা যে নিরাপদ নয় বুঝতে পারছে। এমনও হতে পারে কিছুক্ষণ পর আরো বড় দল নিয়ে পুলিশ রেইড দিতে পারে। তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে কিন্তু বাইরে পুলিশ ওৎ পেতে আছে কিনা সে ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে হবে।

বিছানার পাশে ইন্টারকমটা তুলে নিয়ে রুম সার্ভিসের সাথে কথা বললো সে। "হ্যালো, রুম সার্ভিস...২০৩ থেকে বলছি।"

"জি, স্যার, বলেন।"

"একটু আগে নাকি পুলিশ এসেছিলো এখানে, তারা কি চলে গেছে?" কণ্ঠে যতোদূর সম্ভব উদ্বিগ্নতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো।

"জি, স্যার, চলে গেছে।"

"ওরা কেন এসেছিলো?"

"একজন গেস্টের ব্যাপারে, স্যার। ঐ গেস্ট নাকি ফেরারি আসামি। তার ছবিও নিয়ে এসেছিলো। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, আপনাদের কারো কোনো সমস্যা-"

ছেলেটাকে কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো, "ছবি নিয়ে এসেছিলো?"

"জি, স্যার। ঐ গেস্টের সাথে যে মহিলা, তার ছবি। মহিলা নাকি ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল।"

"কোন রুমের গেস্ট?"

"২০৬, স্যার।"

"আচ্ছা, আমার দুটো রুমের পর...বুঝতে পেরেছি। ধরতে পেরেছে?"

"না, স্যার। ঐ রুমের দু'জনের কাউকে পায় নি। পুলিশ তো সব রুম চেক করতে চেয়েছিলো কিন্তু ম্যানেজার স্যার দেন নি। এই গেস্টহাউজের মালিক একজন এম.পি, তিনি ফোন করে পুলিশকে এমন প্যাদানি দিয়েছেন যে পুলিশ সুরসুর করে চলে গেছে...যাবার সময় ম্যানেজার স্যারকে বার বার সরি বলে গেছে। গুলশান থানার যে পুলিশগুলো এসেছিলো তাদের সবার পোস্টিং বান্দরবান হয়ে যাবে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন।"

"তাই হওয়া উচিত।" বাস্টার্ড কথার সাথে তাল মিলিয়ে বললো। "আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"স্যার, নিশ্চিন্তে থাকেন। কোনো সমস্যা নেই।"

ইন্টারকমটা রেখে দিলো সে। মাঝবয়সী লোকটা আর তার সঙ্গের মহিলা ভীতসন্ত্রস্ত চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। উমা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বাস্টার্ড বুঝতে পারলো পুলিশ উমার একটা ছবি জোগাড় করে ফেলেছে। এই মেয়েটার সমস্যা আরো বেড়ে গেলো। একে নিয়ে ঘোরাঘুরি করা বিপজ্জনক। কিছু একটা করতে হবে। আর সেটা করতে হবে খুব দ্রুত।

মাঝবসয়সী লোকটার দিকে ফিরলো সে। "আমি যা বলবো তা যদি না করেন তো সোজা গুলি করে দেবো। কোনো রকম চালাকি করবেন না।"

"কোনো রকম চালাকি করবো না, বিশ্বাস করুন," ঢোক গিলে বললো লোকটা।

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাস্টার্ড। "তাহলে মনে দিয়ে শুনুন।"

প্রায় বিশ মিনিট অতিক্রান্ত হবার পরও গেস্টহাউজের আশেপাশে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পেলো না জামান। এই বিশ মিনিটে একজন লোকও গেস্টহাউজ থেকে বের হয় নি, কাউকে ঢুকতেও দেখা যায় নি। সব কিছুই স্বাভাবিক আছে শুধু জামানের ভেতর ক্রমবর্ধমান বিরক্তিটা ছাড়া।

জুনিয়র ছেলেটার দিকে তাকালো সে। এই ছেলেটাও বিরক্ত হয়ে উসখুস করছে।

"স্যার, আমরা আর কততক্ষণ এখানে থাকবো?"

"আর একটু, তারপরই চলে যাবো।" জামান মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে আর দশ মিনিট নয়, পাঁচ মিনিট পরই চলে যাবে। এখানে অপেক্ষায় থাকাটা যে নিষ্ফল সেটা বুঝে গেছে।

হঠাৎ গেস্টহাউজ থেকে একটা কালো রঙের প্রাইভেট কার বের হয়ে আসতে দেখলো সে। ভালো করে লক্ষ্য করলো, কোনো যাত্রি নেই। ড্রাইভারের বয়স ত্রিশের মতো। চোখে সানগ্লাস।

জামান সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেলো না। গাড়িটা মেইন রোডে নামতেই গেস্টহাউজের ভেতর থেকে চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেলো। বাজতে শুরু করলো অ্যালার্ম।

ফায়ার অ্যালার্ম।

গেস্টহাউজে আগুন লেগেছে?

জামান একবার অপসৃয়মান গাড়িটার দিকে আরেকবার গেস্টহাউজের দিকে তাকালো। বুঝতে পারছে না কী করবে। সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে একটু দেরি করে ফেললো সে। যেই না গেস্টহাউজের দিকে পা বাড়ালো অমনি মুখোমুখি হলো এক লোকের। লোকটা দৌড়ে বের হয়ে এসে জামানকে দেখেই চিৎকার করে বললো :

"স্যার, খুনি পালিয়েছে...ঐ যে গাড়িতে...!" গেস্টহাউজের কর্মচারী রীতিমতো হাফাচ্ছে।

জামান আর অপেক্ষা করলো না। মোটরসাইকেলের দিকে ছুটে যেতে উদ্যত হবে কিন্তু দেখতে পেলো তার জুনিয়র কলিগ ইতিমধ্যেই বাইকটা নিয়ে তার কাছে এসে পড়েছে। জামান সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলো বাইকে।

পিস্তলের মুখে মাঝবয়সী লোকটার হাতা-পা-মুখ বেঁধে ফেলার আগে জেনে নেয় তার গাড়িটা কি রঙের, চাবিটাও নিয়ে নেয় পকেট থেকে, সেইসাথে তার সানগ্লাস আর লাইটারটাও। অবশ্য রোমেনা চৌধুরি নামের টিভি অভিনেত্রীকে কিছু করার দরকার পড়ে নি। মাঝবয়সী লোকটার হাত-পা-মুখ বাধার আগে আরেকটা ছোটোখাটো কাজ করেছে সে : মহিলা আর তার সঙ্গীকে বাধ্য করেছে জড়াজড়ি করে একটা ছবি তুলতে। মোবাইল ফোনে ছবিটা তুলে রেখে বাস্টার্ড তাদেরকে ভয় দেখিয়ে বলেছে কোনো রকম চিৎকার চেঁচামেচি করলে এটা পত্রিকায় প্রকাশ করে দেবে।

টিভি অভিনেত্রী রোমেনা চৌধুরির বোরকাটা উমাকে পরিয়ে দেয় সে। তারপর গাড়ির চাবিটা তার হাতে দিয়ে জানালা দিয়ে দেখিয়ে দেয় নীচের পার্কিংলনে কোন গাড়িটায় গিয়ে বসতে হবে।

উমা কথামতোই কাজ করে। বোরকা পরা উমা সোজা নীচে চলে যায় ফ্রন্ট ডেস্কের সামনে দিয়ে কোনো রকম সন্দেহের উদ্রেক না করেই। তার কারণ মাঝবয়সী ব্যবসায়িকে দিয়ে আরেকটা কাজ করিয়ে নিয়েছিলো : ইন্টারকমে ফোন করে সেই লোক ম্যানেজারকে জানিয়ে দেয় তার সঙ্গের মহিলা গেস্টহাউজ থেকে চলে যাবে, তাকে যেনো কোনো রকম প্রশ্ন করা না হয়।

বাস্টার্ড জানালা দিয়ে দেখতে পায় উমা ঠিক ঠিকই গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে, তারপরই গলফ্ ব্যাগটা হাতে নিয়ে ২০৩ নাম্বার রুম থেকে বের হয়ে ২০৬ নাম্বার রুমের সামনে দাঁড়ায়। এটার চাবি তার পকেটেই আছে। চারপাশে তাকিয়ে দেখলো প্যাসেজওয়ে'তে কেউ নেই। চাবি দিয়ে রুমের দরজা খুলে পকেট থেকে একটা লাইটার বের করে বিছানার চাদরে আগুন ধরিয়ে সোজা রুম থেকে বের হয়ে গেলো। এই লাইটারটা মাঝবসয়ী লোকটার পকেট থেকে গাড়ির চাবি নেবার সময় নিয়ে নিয়েছিলো।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় কোমর থেকে পিস্তলটা হাতে নিয়ে নেয়, যেনো ফ্রন্ট ডেস্কের কেউ তার গতিরোধ করার চেষ্টা না করে।

ফ্রন্ট ডেস্কে ম্যানেজার ছাড়া আর কেউ ছিলো না। লোকটা মোবাইল ফোনে কার সাথে যেনো কথা বলছিলো। পিস্তল হাতে তাকে দেখতে পেয়েই ডেস্কের নীচে লুকিয়ে পড়ে ভদ্রলোক।

গাড়ির দরজা আগে থেকেই খুলে রেখেছিলো উমা। গলফ ব্যাগটা পাশের সিটে রেখে উমাকে পেছনের সিটে নীচু হয়ে শুয়ে পড়তে বলে। গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দিতেই গেস্টহাউজের ভেতরে লোকজনের গুঞ্জন আর সেই সাথে ফায়ার অ্যালার্ম বেজে ওঠার শব্দটা তার কানে যায়। গেট দিয়ে যখন বের হবে তখন সেটা ক্রমশ বাড়ছিলো।

গেস্টহাউজ থেকে বের হতেই অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা মোটরসাইকেলটা দেখতে পায়। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলো পুলিশ তার পিছু নিলে সোজা গুলি করবে। কিন্তু একটু এগিয়ে যাবার পর রিয়ারভিউ মিররে দেখতে পায় মোটরসাইকেলের লোকটা তার সঙ্গীকে রেখে গেস্টহাউজের দিকে ছুটে যাচ্ছে। মুচকি হেসে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দেয় বাস্টার্ড। সে ভালো করেই জানে গুলশানের মতো ব্যস্ত এলাকায় মোরটসাইকেলের সাথে কোনো প্রাইভেটকার পাল্লা দিয়ে পারবে না।

এতো কাছে পেয়েও খুনিকে ধরতে না পারার জন্য জামানের প্রতি রুষ্ট হয়ে আছে জেফরি বেগ। পুলিশকে বোকা বানিয়েছে, সেটা মেনে নেয়া যায়, কিন্তু হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের কারোর চোখে ধুলো দিয়ে এভাবে একজন ভয়ঙ্কর খুনি চলে যাবে সেটা মেনে যায় না।

মাথা নীচু করে বসে আছে তার বিপরীতে, ডেস্কের ওপাশে বসে আছে জেফরি। গুলশান

থেকে বিশ মিনিট আগে জামান আর জুনিয়র এক ছেলে ফিরে এসেছে, অবশ্য তারা আসার অনেক আগেই জেফরি এই দুঃসংবাদটি জেনে গেছে ফোনে।

"একজন এম.পি'র গেস্টহাউজ বলে তুমি এভাবে ছাড় দেবে?" অনেকক্ষণ পর কথা বললো জেফরি বেগ।

মাথা তুলে তাকালো জামান। "স্যার, লোকটার সাথে আমি নিজে কথা বলেছি...কিছুতেই সবগুলো রুম চেক করার অনুমতি দেন নি।"

"অনুমতি?" আক্ষেপ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। "ঐ এম.পি অনুমতি দেবার কে? তুমি কি তার চাকরি করো? নাকি সে তোমার অথরিটি?"

জামান বুঝতে পারছে ভুলটা কোথায় করেছে। এম.পি সাহেবের কাছ থেকে কোনো অনুমতি নেবার দরকারই ছিলো না। পুলিশ নিয়ে জোর করে সবগুলো রুম চেক করে দেখলেই হতো। এম.পি সাহেব আর কী করতো। অভিযোগ করতো। হাউকাউ করতো। কিন্তু কোনোভাবেই তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতে পারতো না। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট পুলিশ বিভাগের মতো নয়, এখানকার চাকরিতে বদলী নেই। যে বদলীর ভয়ে পুলিশ কাজ করতে পারে না, সে তো তাদের নেই। তারা একেবারেই খাঁটি তদন্তকারী সংস্থা। সরকারী কোনো কোপানল তাদের উপর সরাসরি পড়ে না। সরকারের কেউ তাদের উপর ক্ষেপে গেলেও খুব একটা সমস্যা হয় না।

"আমি তোমার উপর খুবই অসন্তুষ্ট, জামান।"

জেফরির এ কথা শুনে জামান মাথা নীচু করে রাখলো। আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। নিজের কাজে সে নিজেও অনুতপ্ত। ব্যর্থতা শুধু একটা নয়। খুনিকে ফলো করার বেলায়ও সে বোকার মতো কাজ করেছে। গেস্টহাউজ থেকে গাড়িটা বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার বোঝা উচিত ছিলো। কিন্তু ড্রাইভার ছাড়া গাড়িতে কাউকে না দেখতে পেয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ হয় নি। তবে এটাও তো ঠিক, গেস্টহাউজে অনেক গেস্ট ছিলো, একেবারে নিশ্চিত না হয়ে এভাবে কোনো গাড়ির পেছনে ছোটাও সম্ভব ছিলো না।

"তোমাদের কাছে মোটরসাইকেল ছিলো, তার মানে খুনির চেয়ে তোমরাই এগিয়ে ছিলে," জেফরি আবার বলতে শুরু করলো। "এটা খুনিও বুঝতে পেরেছে।"

আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো জামান। কথা সত্য। কিন্তু খুনি যে এভাবে গাড়ি ফেলে পালাবে সেটা তার মাথায়ই ছিলো না। সে আশা করেছিলো জম্পেশ একটি কার চেজিং হবে। মোটরসাইকেলের সাথে শেষ পর্যন্ত পেরে উঠবে না খুনি। টহলপুলিশ আর ট্রাফিক পুলিশের সহায়তায় খুব দ্রুত গাড়িটা থামাতে পারবে। কিন্তু খুনি ভাবনার দিক থেকে আরেকটু এগিয়ে ছিলো। গাড়িটা নিয়ে মেইন রোডে যেতেই এমন একটা মোড়ে গাড়িটা পরিত্যাগ করে যে জামান কিছুই বুঝে উঠতে পারে নি খুনি কোন্ দিকে গেছে।

গুলশান দুই নাম্বারের গোলচক্কর।

জামানের সামনে তিনটি রাস্তা ছিলো, কমপক্ষে তিনটি সম্ভাবনা। এরকম পরিস্থিতিতে কি মাথা ঠিক থাকে। যে কোনো একটা রাস্তাই বেছে নিতে হয়েছে তাকে। অনেক দূর যাবার পরই বুঝতে পারে ভুল রাস্তা বেছে নিয়েছে। খুনি গাড়িটা ফেলে রেখে পায়ে হেঁটে চলে গেছে, কোনো সিএনজি নিয়েছে নাকি কোনো ট্যাক্সিক্যাবে করে গেছে সেটা জানা সম্ভব ছিলো না।

"ঐ মেয়েটা এখনও তার সাথে আছে, অনেকটা আপন মনে বললো জেফরি বেগ।

জামান কিছু বললো না।

"আমি ভেবে পাচ্ছি না মেয়েটার সাথে তার সম্পর্ক কি?"

"স্যার, একেবারেই সাধারণ একটি মেয়ে। তার মা হাসপাতালে, বাবা অসুস্থ, ভাই-বোন কেউ নেই। এক পিসি থাকে তাদের সাথে। আশেপাশের লোকজনের কাছ থেকে যতোটুকু জানা গেছে, তাতে করে তো মনে হচ্ছে না মেয়েটার সাথে এরকম কারোর সম্পর্ক থাকতে পারে।" একনাগাড়ে বলে গেলো জামান।

এটা জেফরির কাছেও মনে হচ্ছে। খুনির সাথে উমা রাজবংশী নামের মেয়েটির কোনো সম্পর্ক খুঁজে বের করতে পারে নি এখনও।

"সিএনজি ড্রাইভার ইউসুফ বলেছে খুনির সাথে একটা ব্যাগ ছিলো; গেস্টহাউজের ম্যানেজারও একই কথা বলেছে," জেফরি বেগ বললো। "যেখানেই যাচ্ছে, ব্যাগ আর মেয়েটাকে হাত ছাড়া করছে না।"

জামান কৌতূহলী হয়ে তাকালো তার বসের দিকে।

"তার মানে ব্যাগ আর মেয়েটা...এ দুটো জিনিস খুনির কাছে অনেক মূল্য বহন করে। কিন্তু সেটা কি?"

জামানের কাছে মনে হলো তার বসের প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ।

"গেস্টহাউজ থেকে পালিয়ে যাবার পর খুনি আর মোবাইল ফোন ব্যবহার করে নি। আমার ধারণা সে আর মোবাইল ফোন ব্যবহার করবে না।"

"স্যার, আমি আবারো বলছি, আমরা কোনো স্টেপ নেবার আগেই খুনি বুঝে যায়। গেস্টহাউজেও খুনি আগেভাগে টের পেয়ে গেছিলো আমরা রেইড দিতে আসছি।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি।

"আমরা যে গেস্টহাউজে রেইড দেব সেটা কেউ জানতো না। তারপরও..."

"তুমি কি এখনও মনে করো এটা আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর কোনো গোপন অপারেশন?"

"আমার তো তাই মনে হচ্ছে, স্যার," একটু কাচুমাচু করে বললো জামান।

"ঠিক আছে, আমি এটা খতিয়ে দেখবো।"

জেফরির এ কথা শুনে জামান আগ্রহী হয়ে উঠলো। "স্যার, আমি নিশ্চিত, আপনি একটু খোঁজখবর নিলে সব জানতে পারবেন।"

"হুম, তাই করবো। এখন সব ভুলে নতুন করে কাজে নেমে পড়ো। আমি চাই না ব্যর্থতার জন্য আফসোস করে করে মাথা কুটে মরো। যা হয়েছে ভুলে যাও। ভুল থেকে শিক্ষা নাও।"

"জি, স্যার।"

"পিং সিটি হোটেলের কর্নেল সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে তাকে একটু সময় দিতে বলো। ভদ্রলোক বেশ কোঅপারেটিভ। এক-দেড় ঘণ্টার সিটিং দিতে হবে। তার বর্ণনা অনুসারে আর্টিস্ট খুনির ইমেজ তৈরি করবে।"

"জি, স্যার।"

জামান উঠে দাঁড়ালো, দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকালো তার বসের দিকে।

"কিছু বলবে?"

"সরি, স্যার।"

"ডোন্ট বি...ফরগেট দিস। উই অল মেক মিসটেক্স।"

গেস্টহাউজ থেকে বের হওয়াটা ছিলো বিশাল এক চ্যালেঞ্জ, সেই চ্যালেঞ্জে জয়ী হয়ে বাস্টার্ডের আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে এসেছে। যদিও কাঁধের ইনজুরিটা তাকে ভোগাতে শুরু করেছে তারপরও মাথাটা দ্রুত কাজ করছে এখন। সে জানে তার মাথা ঠাণ্ডা থাকলে দ্রুত কাজ করতে পারে।

গেস্টহাউজে যখন পুলিশের দল ঢুকতে দেখলো তখন তার কাছে মনে হয়েছিলো সে একটা ফাঁদে পড়ে গেছে। গোলাগুলি করে অতোগুলো পুলিশের সাথে যে পেরে উঠবে না সেটা জানতো। ঠিক তখনই তার মাথাটা আবার আগের মতো কাজ করতে শুরু করে। এরফলে ভালোয় ভালোয় বের হয়ে আসতে পেরেছে।

গেস্টহাউজ থেকে বের হয়েই গাড়িটা এমন জায়গায় ফেলে সটকে পড়েছে যে বেচারা পুলিশ বিভ্রান্ত না হয়ে পারে নি। সে ভালো করেই জানে তার পেছনে ছুটে আসা পুলিশের মোটরসাইকেলটা চার রাস্তার মোড়ে এসে ডান-বাম নয়তো সোজা, এই তিন জায়গার মধ্যে যেকোনো একটা জায়গা বেছে নিতে বাধ্য হবে। ঘুণাক্ষরেও তারা ভাববে না এরকম পরিস্থিতিতে গাড়ি ফেলে রেখে কেউ খুব কাছেই লুকিয়ে থাকবে।

পুলিশের লোক দুটোকে বোকা বনে যেতে দেখে তার খুব হাসি পাচ্ছিলো। কোথায় যাবে সে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তারা কম করে হলেও এক মিনিটের মতো সময় নিয়ে নেয়। তারপর ডান-বামে না গিয়ে ছুটে চলে সোজা সামনের দিকে।

গুলশান গোলচক্করে যেখানে গাড়িটা পার্ক করে রাখে তার ঠিক বিপরীতে একটা ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকে পড়ে মেয়েটাকে নিয়ে। তারপর কাঁচের ভেতর থেকে বসে বসে তামাশা দেখেছে।

পুলিশের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারলেও নতুন একটা চিন্তা তার মাথায় ঢুকেছে : উমার ছবি পুলিশের কাছে। এই মেয়েটাকে নিয়ে ঢাকা শহরে ঘোরাঘুরি করা এখন আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। পুলিশের দ্রুত কাজকর্ম দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলো না।

এখন তারা সিএনজি'তে বসে আছে। তার গন্তব্য কলাবাগান। তবে তার আগে মেয়েটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ট্রাফিক জ্যামে বসে সেটাই ভাবছে বাস্টার্ড। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো মেয়েটা একদম চুপ মেরে আছে। এই মেয়েটা তার কথামতো কাজ করেছে। যেভাবে যেভাবে বলেছে ঠিক সেভাবেই কাজ করেছে। বাস্টার্ড অবশ্য এতোটা আশা করে নি। কিন্তু মেয়েটা জানে না তার ছবি চলে গেছে পুলিশের কাছে। এরকম নিরীহ একটি মেয়ে কতোক্ষণ পুলিশের কাছে ধরার পড়ার হাত থেকে টিকে থাকতে পারবে? কাল পত্রপত্রিকায় ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের উল্লেখযোগ্য দুয়েকজনের খুনখারাবির কথা ছাপা হলে পরিস্থিতি কতোটা জটিল হয়ে উঠতে পারে সেটা সে নিজেও জানে না। তাকে খুব দ্রুত কোলকাতায় চলে যেতে হবে। তবে তার আগে রঞ্জুর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা দরকার। রঞ্জুর স্ত্রী মিনা যে তাকে ভুয়া ঠিকানা দিয়েছে সে ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

জ্যামের মধ্যে আটকে থেকেই ভাবনাটা তার মাথায় এলো।

"তোমার ছবি পুলিশের কাছে চলে গেছে," বললো সে।

মেয়েটা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললো।

"এভাবে পথেঘাটে তোমাকে নিয়ে ঘোরাটা নিরাপদ না।"

"আমি এখন কী করবো?" মুখ তুলে তাকালো উমা।

"ইচ্ছে করলে তুমি এই ঝামেলা থেকে বাঁচতে পারবে।"

উমা দেখলো অজ্ঞাত লোকটা একদৃষ্টে চেয়ে আছে তার দিকে। "বুঝলাম না!" অবাক হয়ে বললো সে।

"কাজটা কঠিন কিন্তু চেষ্টা করলে তুমি করতে পারবে।"

"কী করতে হবে, বলুন," ব্যাকুল হয়ে বললো উমা।

"তোমাকে পুলিশের কাছে ধরা দিতে হবে।"

হোমিসাইডের পরিচালক ফারুক আহমেদ ভুরু কুচকে চেয়ে আছে জেফরি বেগের

দিকে। এইমাত্র তাকে যে কথাটা বলা হয়েছে সেটাকে উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা ছাড়া আর কিছু বলে মনে হচ্ছে না।

"এরকম উদ্ভট জিনিস তোমার মাথায় এলো কী করে?" পরিচালক অবশেষে বললো।

"স্যার, এটা আমার সহকারী জামানের ধারণা, জেফরি গাল চুলকে বললো।

"তাই তো বলি," ফারুক আহমেদ যেনো স্বস্তি ফিরে পেলেন। "এরকম উদ্ভট আইডিয়া তোমার মাথায় আসার কথা নয়।"

কিন্তু আমিও মনে করছি তার আইডিয়াটা একেবারে ফেলে দেয়ার মতো কিছু না। একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে।"

"পারে না," দু'পাশে মাথা নেড়ে জানালো পরিচালক সাহেব। "এসব উদ্ভট আইডিয়া খতিয়ে দেখার দরকার নেই।"

"কিন্তু ঘটনা যেভাবে এগোচ্ছে তাতে করে এই আইডিয়াটা আরো বেশি বাস্তব বলে মনে হচ্ছে, স্যার।"

"আহ, তুমি বুঝতে পারছে না। এরকম কিছু যে একেবারে অবাস্তব তা নয়, তবে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এরকম কোনো গোপন অপারেশন হচ্ছে না।"

জেফরি কিছু বললো না। সেও জানতো এরকম কথা শুনে তার বস কি বলবে। তারপরও পাল্টা যুক্তি দেখালো সে। "স্যার, এরকম অপারেশন তো আগেও হয়েছে, হয়েছে না?"

"যেমন?" ভুরু কুচকে জানতে চাইলো পরিচালক।

"অপারেশন ক্লিনহার্ট।"

দু'পাশে মাথা দোলাতে লাগলো ফারুক সাহেব। "তুমি ভুলে গেছো, ওটা কোনো গোপন অপারেশন ছিলো না...ঘোষণা দিয়ে, ফলাও করে প্রচার করে করা হয়েছিলো।"

"তা ঠিক, তবে এবার হয়তো গোপনে করা হচ্ছে?"

আবারো মাথা নেড়ে আইডিয়াটা বাতিল করে দিলো জেফরির বস। "অ্যাবসার্ড! এরকম কিছু হচ্ছে না সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো।"

"স্যার, আপনি এতো জোর দিয়ে বলছেন কিভাবে?"

"তোমাকে খুলে বলতে পারবো না তবে একটা কথা মনে রেখো, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কর্তাদের সাথে আমার সম্পর্ক আছে... এরকম কিছু হলে আমি ঠিকই জানতে পারতাম, মানে আমাকে আগে থেকেই জানিয়ে দেয়া হতো। শুধু জানিয়ে দেয়াই হতো না, নির্দিষ্ট কিছু ইন্ট্রাকশনও দেয়া হতো।"

একটু ভেবে নিলো জেফরি বেগ। "ঠিক আছে, ধরে নিলাম এরকম কিছু হচ্ছে না, তারপরও নিশ্চিত হবার জন্য কি ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা যায় না?"

"যে জিনিসের অস্তিত্বই নেই সেটা কিভাবে খতিয়ে দেখবে?" ফারুক সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করে বসলো।

"স্যার, আমি দেখবো না। আপনি দেখবেন। উপরমহলে কারো সাথে কথা বলে একটু জেনে নেবেন।"

"পাগল," চেয়ারে হেলান দিলো পরিচালক। "এরকম কিছু যদি আমার অগোচরে তারা করেও থাকে তাহলে কি সেটা আমার কাছে স্বীকার করবে?" কথাটা বলেই হা হা করে হেসে ফেললো ফারুক আহমেদ।

জেফরি বেগ তার বসের দিকে চেয়ে রইলো। তার ঠোঁটে স্মিত হাসি। এই হাসির সাথে ফারুক সাহেব পরিচিত। যখন যুক্তিতর্কে কাউকে ফাঁসিয়ে দেয় তখন তার এই প্রিয়পাত্র এরকমভাবে হাসে। ভদ্রলোক নিজের হাসিটা কোনোমতে দমন করে বিব্রত ভঙ্গি করলো। তবে এখন ও বুঝতে পারছে, নিজের কথায় নিজে কিভাবে ফেঁসে গেছে।

"স্যার, আপনাকে না জানিয়ে তো তারা কোনো অপারেশন করবে না, সুতরাং এই আশংকা করার দরকার নেই," জেফরির ঠোঁটের হাসিটা আরো প্রকট হলো।

ফারুক সাহেব এবার বুঝতে পারলো আসলেই নিজের কথায় নিজেই ফেঁসে গেছে। থুতনীটা চুলকাতে শুরু করলো সে।

"করবে না সেটা তো জোর দিয়ে বলা যায় না, তাই না?"

"জি, স্যার।"

"এইসব অপারেশন পলিটিক্যাল সিদ্ধান্তে করা হয়, তারা যদি ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলে তাহলে তো আর আমাদের জানানো হবে না।"

"তাতো ঠিকই, স্যার।"

"তুমি বলছো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখা দরকার?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি বেগ। "তবে সরাসরি জিজ্ঞেস করবেন না।"

"তাহলে?"

"স্যার, এরকম কোনো অপারেশন যদি সত্যি হয়ে থাকে তার মানে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টও আছে। ব্ল্যাক রঞ্জুর দল সম্পর্কে পর্যাপ্ত ইন্টেল ছাড়া অপারেশন করা হবে না। আপনি জানতে চাইবেন সাম্প্রতিক সময়ে ব্ল্যাক রঞ্জু সম্পর্কিত কোনো ইন্টেল আছে কিনা। থাকলে আমাদের সাথে যেনো শেয়ার করা হয়।"

ফারুক সাহেব একটু ভেবে নিলো। "ওকে, মাই বয়। সেটা করা যাবে। ডোন্ট ওরি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।"

"আর কিছু?" একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বললো হোমিসাইডের পরিচালক।

"না, স্যার।"

"গুড," একটু থেমে আবার বললো ফারুক সাহেব। "কফি খাবে?"

"না, স্যার, চা খাবো।"

"আমিও সেটাই ভাবছিলাম...চা-ই ভালো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি, এমন সময় তার ফোনটা বেজে উঠলো। "স্যার, এক্সকিউজ মি।"

" প্লিজ।"

জামানের ফোন। জেফরির ভুরু কুচকে গেলো। কলটা রিসিভ করলো সে।

"স্যার?" ওপাশ থেকে জামানের উত্তেজিত কণ্ঠটা শোনা গেলো।

"বলো।"

"উমা রাজবংশী নামের মেয়েটাকে পুলিশ ধরে ফেলেছে!"

বাস্টার্ডের সিএনজিটা যখন কলাবাগানের একটি পুরনো দোতলা বাড়ির সামনে এসে থামলো তখন সন্ধ্যা সাতটারও বেশি বেজে গেছে। এই গলির শেষ বাড়ি এটা। ভাড়া মিটিয়ে সোজা ঢুকে পড়লো সেই বাড়িতে।

উপর তলায় একটা ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় একটু থেমে কী যেনো মনে করে দরজা ঠেলে ভেতরে উঁকি মারলো।

ঘরের ভেতর একটা খাটের উপর মরা লাশের মতো এক বৃদ্ধলোক শুয়ে আছে। কিছুক্ষণ বুড়ো লোকটার দিকে তাকিয়ে থেকে যে-ই না চলে যাবে অমনি শুনতে পেলো একটা কণ্ঠ। "বাবলু?"

ফিরে তাকালো সে। বুড়ো লোকটা তার দিকে চেয়ে আছে। খাটের পাশে এসে বসলো বাস্টার্ড। "কেমন আছো?"

বুড়োর ঠোঁটে উপহাসের হাসি।

"ওষুধ খেয়েছো?"

"হুম।"

"কিছু বলবে?" বুড়োর হাতটা ধরে বললো সে।

"কোথায় ছিলি?"

"একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম।"

"আজ থাকবি?" স্থির চোখে চেয়ে বললো বুড়ো।

"না। কাজ আছে।"

"আমি মনে হয় আজই মারা যাবো!"

বাস্টার্ড মনে মনে হাসলো। আজ তিন বছর হলো তার বাবা শয্যাশায়ী, এই তিন বছরে অসংখ্যবার এ কথা বলেছে।

"ডাক্তার তো বলেছে তোমার সব ঠিক আছে।"

চোখমুখ বিকৃত করে বুড়ো বললো, "সবই যদি ঠিক থাকে তাহলে আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাগামুতা করি কেন?"

"ঠিক আছে মানে, অন্যসব কিছুর কথা বলেছে। আস্তে আস্তে তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।"

"ওই শালারা খালি টাকা খায়, ইচ্ছে করে আমাকে ভালো করে না...ভালো করলেই তো ইনকাম বন্ধ হয়ে যাবে। বুঝলি?"

"হ্যাঁ, বুঝছি।"

"একটু উঠে বসতে পারলেই ওই শালাদের গুলি করে মেরে ফেলতাম।"

"ঠিক আছে, আমি যাই। তুমি ঘুমাও"

"আরে সারাক্ষণই তো ঘুমাই...আর কতো ঘুমাবো!" বাস্টার্ড কিছু বললো না।

"বাবা, এসব ছেড়ে দে," বুড়ো তার হাতটা শক্ত করে ধরে বললো। অবাক হলো বাস্টার্ড। এই দূর্বল শরীরেও বুড়ো এতো শক্তি রাখে! "বিদেশ চলে যা! আমার জন্য চিন্তা করিস না। আমি ঠিক থাকবো। মজিদ আছে, আমেনা আছে..."।

"ঠিক আছে, যাবো। তুমি এখন ঘুমাও। আমি যাই।"

"সত্যি তুই যাবি?" বুড়ো আশান্বিত হয়ে উঠলো।

"হুম...যাবো।"

"কবে যাবি?"

"এই তো, আর কটা দিন পরই চলে যাবো।"

"এই কথা তো অনেক দিন ধরেই শুনছি। তুই আসলে যাবি না।"

"না। যাবো। তোমাকে একটু সুস্থ করেই চলে যাবো।"

"আমি আর সুস্থ হবো না।"

"হবে," বাস্টার্ড মিথ্যে করে বললো।

বুড়ো যেনো রেগে গেলো। "বাল হবে!"

বাস্টার্ড হেসে ফেললো।

"হাসবি না...হাসবি না!" অনেকটা চিৎকার করে বললো বুড়ো।

"একটা কথা বলি?"

"বল!" চট করে বললো পক্ষাঘাতগ্রস্ত বুড়ো।

"আমার মা কে ছিলো সেটা যদি বলো তাহলে বিদেশ চলে যাবো।" বাস্টার্ড জানে বুড়ো এখন কি বলবে। এ কথা সে অনেক শুনেছে।

"যা আমার সামনে থেকে! এক্ষুণি যা!"

বাস্টার্ড মোটেও অবাক হলো না। আস্তে করে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। বুড়ো সব সময় দাবি করে তার মা কে ছিলো সেটা সে জানে না তবে বাস্টার্ডের ধারণা বুড়ো জানে, কী এক অজ্ঞাত কারণে সেটা বলে না তার কাছে।

দরজার বাইরে যখন চলে এলো শুনতে পেলো বুড়ো বিড়বিড় করে বলছে : "জানি না! জানি না!"

নিজের ঘরে ঢুকে ভাবতে লাগলো সে। হয়তো লোকজনের কথাই ঠিক। তার মা বেশ্যা ছিলো। সেজন্যে তার বাপ সব সময় এ প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যায়। হোক তার মা বেশ্যা, তবুও সে মায়ের কথা শুনতে চায়-এটা তার বাপ যদি বুঝতো! একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো তার বুকের ভেতর থেকে।

জন্মপরিচয়হীন একজন মানুষ সে।

১৯৭৪ সালের কোনো একদিন খুইন্যা বাবুল কোত্থেকে ফুটফুটে এক শিশুকে নিয়ে হাজির হলো তার বাড়িতে। বাড়ি বলতে বস্তিতুল্য এক আখড়া। নিম্নআয়ের কয়েকশ' লোকের ঘুপচি ঘর। যুবক বাবুল বেশ প্রভাবশালী, এই বস্তির মা-বাপদের সাথে তার ওঠাবসা। পেশায় যে একজন ভাড়াটে খুনি সেটা অবশ্য তার প্রতিবেশিদের অনেকেই জানে। তার কাছের লোকজন শিশুটি সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে সে এমন খুনে দৃষ্টিতে তাকাতো যে ভয়ে কেউ দ্বিতীয়বার এই প্রশ্ন করার সাহস করতো না। তারপরও একটা কথা বস্তির বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগলো : রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে শিশুটিকে। এই কাহিনীর সূচনা ঘটে বাবুল যখন বাচ্চাটার জন্য একজন দুধ মা নিয়োগ দেয় তখন থেকে। ঐ মহিলার নাম ছিলো পেয়ারির মা। খুইন্যা বাবুল শুধুমাত্র পেয়ারির মাকেই বলেছিলো বাচ্চাটাকে কোত্থেকে পেয়েছে।

"রাস্তায় পইড়্যা আছিলো?" পেয়ারির মা অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবুল বলেছিলো, "হ। কতো মানুষ না খেয়ে মারা যাচ্ছে। কতো মা-বাবা অভাবের চোটে নিজের সন্তান ফেলে চলে যাচ্ছে... সময়টা খুব খারাপ, বুঝলে, পেয়ারির মা।"

পেয়ারির মাও জানে সময়টা কতো খারাপ নইলে কয়েক দিন আগেও যার কাছ থেকে প্রতিবেশিরা টাকা ধার করতো, চাল-ডাল চেয়ে নিতে তাকে কিনা এখন পরের বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর চাকরি নিতে হচ্ছে। তার নিজের ছয় মাসের এক মেয়ে সন্তান আছে-এ নিয়ে পর পর দুটো মেয়ে-তাকেও ঠিকমতো বুকের দুধ খাওয়াতে পারে না। যে ভাতের ফেন ফেলে দিতো, এখন সেটাও হয়ে উঠেছে খাদ্য।

"কুনখানে পইড়া আছিলো?"

পেয়ারির মার এ কথা শুনে বাবুল কিছুটা বিরক্ত হয়। "আহ, তুমি এতো কথা জানতে চাও কেন? এতো কথা শুইনা তোমার কি লাভ।" কথাটা বলেই বাবুল ঘর থেকে চলে যায়।

তো পেয়ারির মা এই গল্পটা তার বিবেচনায় বিশ্বস্ত আরো কয়েকজনের কাছে পাড়ে, সেই বিশ্বস্তরা আবার নিজেদের বিশ্বস্তদের কাছে...এভাবে গল্পটা ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত : খুইন্যা বাবুল রাস্তা থেকে এক ফুটফুটে শিশুকে তুলে নিয়ে এসেছে।

মন্দলোকের সংখ্যা কোনো কালেই কম ছিলো না, আর বস্তিতে সে সংখ্যাটা একটু বেশিই থাকে। ফুটফুটে নিরীহ শিশুটির প্রতি সবারই যে মায়ামমতা ছিলো তা বলা যাবে না।

কিছু ছোটোলোকি নারী-পুরুষ একান্তে, নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় ঠোঁট উল্টে বলতো, "রাস্তা থেইকা যখন পাইছে তাইলে মনে হয় কুনো বেশ্যারই পোলা অইবো। ফালাইয়া দিছে, বুঝলা না?"

এটা বোঝার মতো মানুষের সংখ্যাও কম ছিলো না, তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগলো।

এদিকে বাবুল নিজে খুনি হলেও ছেলেটির প্রতি তার মায়ামমতার কোনো কমতি ছিলো না। বিয়েশাদি না করলেও বাপ হিসেবে কোনো অংশেই কম ছিলো না সে। বস্তিতে থাকার পরও ভালো একটি স্কুলে ছেলেকে পড়তে পাঠায়। এমন স্কুল যেখানে শুধু বড়লোকের ছেলেপুলেরাই পড়াশোনা করে। এ নিয়ে বস্তিতে ঈর্ষাকাতরদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। বাপকে মুখে কিছু বলতে না পারলেও অবোধ শিশুটিকে বাঁকা চোখে দেখতে শুরু করে, জাউরা বলে গালি দিতেও ছাড়ে না অনেকে। শিশুটি হয়তো আপনমনে খেলছে, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে, দূর থেকে তখন তাকে দেখিয়ে কোনো মহিলা কিংবা পুরুষ বলে উঠলো, "ঐ যে জাউরা পোলা যায়!"

খুইন্যা বাবলু শিশুটির জন্য সুন্দর একটি নাম রেখেছিলো মসজিদের মওলানা সাহেবকে দিয়ে তবে সেই ভারিক্কি নামটা স্কুলে ভর্তির সময়ই ব্যবহার করা হয়েছিলো, বাবুল নিজে কখনও ঐ নামে ডাকতো না। সে তার নিজের নামের সাথে মিলিয়ে ছেলেটাকে ডাকতো বাবলু বলে।

পেয়ারির মাকে স্থায়ীভাবে রেখে দেয়া হয় ছেলেটার দেখাশোনা করার জন্য। এজন্যে মাসে মোটা অঙ্কের টাকা দিতে বাবুল। ঐ মহিলাই বাবলুর সবকিছু দেখাশোনা করতো। তার খাবার, পোশাক, সব। সত্যি বলতে কি, বাবলু নামের ছেলেটি সারাদিন থাকতে পেয়ারির মার কাছেই, কারণ খুইন্যা বাবুল প্রায়ই রাতে বাড়ি ফিরতো না, কখনও কখনও তিন-চার দিন এক নাগাড়ে তার দেখা পাওয়া যেত না। এ রকম পরিস্থিতিতে ছেলেটার নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা, বখে যাওয়ার কথা কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো ছেলেটা যতো বড় হতে থাকে সবার থেকে আলাদা হতে থাকে। তার আচার আচরণ একেবারেই অন্যরকম। বস্তির কারো সাথে মেলে না। পেয়ারির মা মাঝেমধ্যে অবাক হয়ে ভাবতো, ছেলেটার রক্ত নিশ্চয় কোনো ভালো বংশেরই হবে।

ছেলেটার বয়স যখন বারো-তেরো তখন একটা ঘটনা ঘটে। তাদের বস্তিতে ওঠে এক আজব লোক। দেখতে অদ্ভুত সেই লোকের গায়ে কোনো পশম নেই। শোনা যায় টাইফেয়েডের কারণে নাকি শরীর থেকে সব লোম ঝরে পড়ে গেছে। চকচকে মাথা, হীন, চোখের পাপড়িহীন, তেলতেলে শরীরের এক আজব প্রাণী। বস্তির সবাই আড়ালে আবডালে সেই লোককে ডাকতে লোম্বাছুট বলে। একাকী ছোট্ট একটি ঘরে থাকতো সেই লোম্বাছুট। খুব বেশি লোকের সাথে তার মেলামেশা ছিলো না। লোকটা যে কী করে, কোথায় যায় সে খবর কেউ রাখতোও না।

একদিন দুপুরবেলা, গ্রীষ্মকালীন ছুটির কারণে বাবলুর স্কুল তখন বন্ধ, সে নিজের ঘরের বাইরে বসে একটা ম্যাগাজিন পড়ছিলো। বিদেশী ম্যাগাজিন। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ার কারণে ইংরেজিটা অল্প একটু বুঝতে পারতো সেই বয়স থেকেই। বস্তির পুরনো কাগজের যে ভাঙ্গার আছে সেখান থেকে ম্যাগাজিনটা চেয়ে নিয়ে এসেছে। বিভিন্ন ধরণের বাইসাইকেলের ছবিতে ভরা সেই ম্যাগাজিনটা গভীর মনোযোগের সাথে পড়ছে সে। চমৎকার চমৎকার সব বাইসাইকেলের রঙ্গিন ছবি। অবাক হয়ে দেখছে আর পড়ছে। ভাবছে এরকম একটি সাইকেল যদি তার থাকতো। তার বাবাকে বললে নিশ্চয় একটা কিনে দেবে। এমন সময় লোম্বাছুট এসে হাজির হয় তার সামনে। কি খোকা, কেমন আছো, কি পড়ছে, এসব দিয়ে শুরু, তারপর বাইসাইকেল সম্পর্কে আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। তার কাছে নাকি ঠিক এ ধরণের একটি বাইসাইকেল আছে। বিস্ময়ে চেয়ে থাকে বাবলু। তাদের বস্তিতে এরকম বাইসাইকেল আছে! হ্যাঁ, তবে এখানকার কোনো ছেলেকে সেটা ব্যবহার করতে দেয়

না। এরা হলো বস্তির ছেলেপেলে। এরকম বিদেশী সাইকেলের মূল্য এরা বুঝবে নাকি! কিন্তু বাবলুকে দেখে তার সেরকম মনে হচ্ছে না। বাবলু নিজেও জানে তাকে সবাই আলাদা মনে করে।

সাইকেল নিয়ে বাবলুর সাথে আলাপ জুড়ে দেয় লোকটা। প্রথম প্রথম বাবলু একটু ইতস্তত থাকলেও লোকটার কথা শুনে ভয় চলে যায়। তার কাছে মনে হয়, দেখতে ভয়ঙ্কর হলেও লোকটা আসলে অনেক ভালো।

এক পর্যায়ে জানতে চায় সে সাইকেল চালাতে জানে কি না। না। বাবলু জানে না। জীবনে সে সাইকেলে চড়ে নি। তবে অনেককে দেখেছে। তার খুব চালাতে ইচ্ছে করে। ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। তার কাছে তো একটা সাইকেল আছেই। এমনি পড়ে আছে সেটা। অনেকদিন ধরে কেউ চালায় নি। তো বাবলুর মতো লক্ষীছেলে চাইলে সেটা তাকে মাঝেমধ্যে ব্যবহার করার জন্য দেয়া যেতেই পারে।

বাবলু দারুণ অবাক হয়। সত্যি! আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে লোকটা জানায় অবশ্যই সত্যি। তবে তার আগে সাইকেল কিভাবে চালাতে হয় সেটা তাকে শিখতে হবে। সে চাইলে তাকে এখনই শেখাতে পারে।

এখনই! বাবলুর কাছে মনে হলো পুরো ব্যাপারটাই স্বপ্নের মতো। হ্যাঁ, আমি শিখবো।

বাবলু ঐ লোম্বাছুটের সাথে চলে যায় তার ঘরে। কিন্তু অবাক ব্যাপার হলো তার ঘরে কোনো সাইকেলই নেই। জিজ্ঞেস করার জন্য পেছন ফিরে তাকাতেই দেখে লোকটা দরজা বন্ধ করে দিয়ে পিশাচের মতো হাসছে।

"সাইকেল কোথায়?" বাবলু শুধু এটাই বলতে পেরেছিলো, তারপরই লোকটা পেছন থেকে জাপটে ধরে তার মুখ চেপে ধরে।

ঘরে কোনো খাট ছিলো না, তবে শীতলপাটি পাতা ছিলো। বাবলুকে ওখানে নিয়ে গিয়ে উপুড় করে ফেলে দেয়। পেছন থেকে শক্ত করে ধরে রাখে তাকে আর তার মুখ। দম বন্ধ হয়ে আসে তার। মুহূর্তের বিভীষিকায় হতভম্ব হয়ে পড়ে সে। কিছুই বুঝতে পারে না, শুধু বুঝতে পারে লোকটা তার সাথে খুব খারাপ কিছু করতে চাইছে। চিৎকার দেবার অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু লোকটা শক্ত হাতে তার মুখ চেপে রেখেছে। বাবলু টের পায় লোকটা প্যান্টের জিপার খুলছে একহাতে। নিজের সমস্ত শরীরের ভার ছোট্ট বাবলুর উপর প্রয়োগ করে তাকে আটকে ফেলেছে।

বাবলু বুঝতে পারে ভয়ঙ্কর খারাপ কিছু হচ্ছে তার সাথে। লোকটার। লোমহীন তেলতেলে শরীর লেগে আছে তার শরীরের সাথে, গা শিউরে উঠছে তার। জঘন্য। এক অদ্ভুত আর কুৎসিত প্রাণী তাকে গিলে খেতে চাচ্ছে। এর থেকে বাঁচার কোনো উপায়ই নেই। ঠিক তখনই চোখের সামনে, হাতের নাগালের মধ্যে একটা জিনিস দেখতে পেলো সে। এটা তো প্রতিদিনই সে ব্যবহার করে!

ওদিকে খুইন্যা বাবুল বাড়ি ফিরে দেখে ঘরে তার ছেলে নেই। এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। এই ছেলে কখনও বাড়ি ছেড়ে বাইরে যায় না। গেলেও পেয়ারির মাকে জানিয়ে খেলতে যায়। সেটাও বাড়ির খুব কাছেই যে মাঠটা আছে সেখানে। বাবুল তড়িঘড়ি করে ছুটে যায় সেই মাঠে। নেই। তার বাবলু নেই। হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে ছেলেকে। এমন সময় বাবলুর সমবয়সী এক ছেলের সাথে দেখা হয় তার। সে জানায় একটু আগে লোম্বাছুটের সাথে বাবলুকে দেখেছে তার ঘরে যেতে। কথাটা শুনেই খুইন্যা বাবুলের বুকটা ধক করে ওঠে। দৌড়ে ছুটে যায় লোকটার ঘরের দিকে। ঘরের দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে গোঙানির মতো আওয়াজ হচ্ছে। মাথায় খুন চেপে যায় তার। এক লাথিতে আমকাঠের দরজাটা ভেঙে ভেতরে ঢুকে যে দৃশ্যটা সে দেখতে পায় সেটা একেবারেই নারকীয়।

তার বারো-তেরো বছরের নিষ্পাপ ছেলেটি উন্মাদগ্রস্তের মতো একের পর এক আঘাত করে যাচ্ছে লোম্বাছুটকে। লোকটা মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে দু'হাতে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু তার ছেলের শরীরে যেনো অশরীরি শক্তি ভর করেছে। মেঝেতে যে

পাটির উপরে লোকটা পড়ে আছে সেটা রক্তে একাকার, একাকার লোকটার সারা মুখ আর বুক। লোকটার এক চোখ এরইমধ্যে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। বাবলুর হাতে মুখেও লেগে আছে সেই রক্ত। সে দেখতে পেলো তার ছেলের হাতের অস্ত্রটা আর কিছু নয়, সামান্য একটা বলপেন।

পেছন থেকে নিজের ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বাবুল। আর না, বাবা, আর না!

কান্নায় ভেঙে পড়ে তার নিষ্পাপ ছেলেটা। বাবার উপস্থিতি বুঝতে পেরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। হাত থেকে রক্তাক্ত কলমটা পড়ে যায়। নিস্তেজ হয়ে থাকা লোম্বাছুটের বুকের উপর থেকে ছেলেকে আস্তে করে তুলে আনে বাবুল। জড়িয়ে ধরে রাখে বেশ কিছুটা সময়। কেউ কিছু বলে না, দু'জনেই জানে কি হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরই খুইন্যা বাবুলের সম্বিত ফিরে আসে। ভাঙা দরজাটা কোনো রকম ভিড়িয়ে দিয়ে ঘরের এককোণে ছেলেকে বসিয়ে রেখে কিছু কাজ করে ফেলে দ্রুত। তারপর ছেলেকে নিয়ে সবার অলক্ষ্যে বের হয়ে যায় ঘর থেকে। কিছুক্ষণ পরই লোম্বাছুটের ঘরটা দাউ দাউ করে আগুনে জ্বলতে শুরু করে।

সবাই জানলো এক দুর্ঘটনায় লোম্বাছুট মারা গেছে।

কতো সহজেই না একটা খুনকে ধামাচাপা দেয়া সম্ভব! কিশোর বাবলু বুঝতে পারে। এই ঘটনার পর থেকে যে তার জীবনটা বদলে গেলো সে খবর কেউ রাখলো না। নিজের হাতে একটা খুন তাকে অন্য এক মানুষে পরিণত করলো রাতারাতি। তার বাবা নিজে একজন পেশাদার খুনি হলেও সে কখনও চায় নি ছেলেকে এ লাইনে আনতে। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হলো, তার ফুটফুটে ছেলেটি তার অজান্তে এবং ঘটনাচক্রে তাই হয়ে উঠতে শুরু করে।

এই ঘটনার পর মাত্র আট মাসের মাথায় আরেকটা খুন করে কিশোর বাবলু।

স্কুলে তার এক সহপাঠি ছিলো, তার সবচাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু-ইরফান। সেই ইরফান স্কুল শেষে আরবী পড়ার জন্য তাদের বাড়ির কাছে মসজিদের এক হুজুরের কাছে যেতো। একদিন ইরফান জানায় তার সাথে হুজুর খারাপ কাজ করেছে জোর করে। লজ্জায় সে এ কথা কাউকে বলতে পারছে না। সে আর হুজুরের কাছে পড়তে যেতে চায় না কিন্তু তার বাপ-মা তাকে বাধ্য করছে। কথাটা তাদেরকে বলতেও পারছে না। কঠিন এক সমস্যায় পড়েছে ইরফান। বাবলুর কাছে সব খুলে বললে কিশোর বাবলু সহজ একটি সমাধান দিয়ে দেয় বন্ধুকে। চিন্তা করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে। ইরফান কিছুই বুঝতে পারে না। এইটুকু এক পিচ্চি কিভাবে এই সমস্যা সমাধান করে দেবে।

কিছুদিন পর জানা গেলো সেই হুজুর নিজের ঘরে মারা গেছে, সম্ভবত হার্ট অ্যাটাকে। অবশ্য ময়না তদন্ত করলে জানা যেতো লোকটাকে ঘুমের মধ্যে শ্বাসরোধ করা হয়েছে।

ইরফান বুঝতে পারে কাজটা তার বন্ধু বাবলু করেছে কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারে না। সাহস করে একদিন বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলে সে শুধু জানায়, হুজুর তার সাথে খারাপ কাজ করেছে তাই মরেছে, কিভাবে মরলো, কে তাকে মারলো এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ।

এসএসসি পরীক্ষার আগে দিয়ে ঘটলো আরেকটা ঘটনা। বাবলুর দুধমা অর্থাৎ পেয়ারির মা একটা সমস্যায় পড়লো। পাড়ার এক উঠতি মাস্তান বাড়ন্ত পেয়ারিকে পথেঘাটে বিরক্ত করে। ইদানিং তার সাহস আরো বেড়ে গেছে। ছেলেটার জ্বালায় অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছে তাদের পুরো পরিবার। বাবলু সব শুনে চুপচাপ চলে যায় নিজের বাড়িতে। মনে মনে একটা পরিকল্পনা করে সে। ছেলেটাকে কয়েক দিন ফলো করে জেনে নেয় কখন কোথায় থাকে, কী করে। তারপর এক সন্ধ্যায় তার বাবার পিস্তলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। আগে থেকেই জানতো তার বাবা কোথায় পিস্তলটা লুকিয়ে রাখে।

সন্ধ্যার দিকে ছেলেটা বস্তি থেকে একটু দূরে যে খেলার মাঠ আছে, সেখানে গিয়ে ফেন্সিডিল সেবন করে। তারপর কিছুক্ষণ বন্ধুবান্ধবদের সাথে চা-সিগারেট খেয়ে, চলে যায় নির্জন এক পথ দিয়ে।

প্রতিদিনকার মতো ছেলেটা সেই পথ দিয়ে যাবার সময় বাবলু তার পথরোধ করে। কোনো কথা না বলেই সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে গুলি করে দেয়। গুলি করেই স্বাভাবিক ছন্দে হেঁটে বাড়ি চলে আসে। কোনো দৌড়াদৌড়ি কিংবা পালানোর চেষ্টা করে নি। সে জানে ওরকম কিছু করলেই লোকজন সন্দেহ করতো।

তিন নাম্বার খুনটাও ধামাচাপা পড়ে যায়। সবাই বলাবলি করতে থাকে নিজেদের মধ্যে বখরা নিয়ে ভাগাভাগির জের ধরে এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, পত্রপত্রিকাগুলোও এরকম খবর ছাপে। কিশোর বাবলু বুঝে যায় মাথা ঠাণ্ডা রেখে, বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করলে অনেক কিছুই করা সম্ভব।

এরপর দীর্ঘ দিন আর কোনো খুনখারাবি করে নি। তারপরই এলো আরেকটি বিপর্যয়। বাবলু তখন সবে কলেজে ঢুকেছে। তার পেশাদার খুনি বাপ এক হত্যা মামলায় ফেসে গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যায়। মুহূর্তেই পাল্টে যায় বাবলুর জগৎটা। বুঝতে পারে এ পৃথিবীতে তার কেউ নেই। তার যে দুধমা ছিলো, ততোদিনে সেই মহিলাও চলে গেছে অন্য কোথাও। তার ঠিকানা পর্যন্ত জানে না সে। তিন-চার দিন কলেজ পড়ুয়া বাবলু নিজের ঘরে খেয়ে না খেয়ে পার করে দেয়। এরমধ্যে একদিন পুলিশ এসে পুরো ঘরটা তল্লাশী করে গেলেও কিছু পায় না, কারণ বাবলু তার বাবার পিস্তলটা অন্য জায়গায় লুকিয়ে রাখে।

বেঁচে থাকার জন্য যে টাকার দরকার সে টাকা সে কোথায় পাবে? তার বাবার দিক থেকে এমন কোনো আত্মীয়স্বজন নেই যে তাকে দেখভাল করবে। ঘরে যা ছিলো সেটা দিয়ে কোনোমতে তিন-চারদিন পার করার পর যখন দেখলো খাবার বলতে কিছু নেই তখনই একটা সিদ্ধান্ত নিলো সে। তার বাবা ঘরে কিছু না রেখে গেলেও একটা জিনিস রেখে গেছে। অনেক ক্ষমতা সেটার। যার হাতে থাকবে সে হয়ে উঠবে ক্ষমতাশালী।

পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ঘুরতে থাকে। কিন্তু কী করবে ভেবে পায় না। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামে। রাত হয় আরো গাঢ়। এদিকে খিদের চোটে চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে সে। এমন সময় নির্জন এক রাস্তায় দেখতে পায় এক লোক তার গাড়ির বনেট খুলে কী যেনো দেখছে। গাড়িটা বোধহয় নষ্ট হয়ে গেছে মাঝপথে।

গাড়িওয়ালা। নিশ্চয় অনেক টাকার মালিক। একদম একা নির্জন এক রাস্তায়। এরচেয়ে ভালো সুযোগ আর পাবে না। বাবলু সোজা লোকটার কাছে গিয়ে পিস্তল ধরে বলে মানিব্যাগটা যেনো তাকে দিয়ে দেয়।

আশ্চর্যের ব্যাপার ভদ্রলোক একটুও চমকায় না। আস্তে করে পেছন ফিরে দেখে নেয় তাকে। শীতল চোখে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বাবলু আবারো তাড়া দেয়, "মানিব্যাগটা দিয়ে দিন, প্লিজ!"

লোকটা নিষ্পলক চেয়ে থাকে। বুঝতে পারে ছেলেটা এ লাইনে নতুন। তার কথাবার্তায় এখনও মার্জিত একটা ভাব আছে। কোনো ছিনতাইকারী এভাবে কথা বলবে না। প্লিজ! মুচকি হেসে লোকটা জানতে চায়, "টাকা দিয়ে তুমি কি করবে, বাবা?"

অবাক হয় বাবলু। লোকটা তার সাথে এমন আচরণ করছে কেন? যেনো টাকা চেয়ে আবদার করেছে তার কাছে। অথচ গুলি ভর্তি একটি অত্যাধুনিক পিস্তল ধরে রেখেছে তার বুক বরাবর। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বাবলু বলে, "আমার কাছে কোনো টাকাপয়সা নেই...খিদে পেয়েছে।"

কথাটা শুনে লোকটা মাথা নেড়ে সায় দেয়, যেনো চট করেই সব বুঝতে পেরেছে। তারপর পুরো মনিব্যাগটা বাড়িয়ে দেবার আগে বলে, "পুরো মানিব্যাগটা চাও নাকি শুধু টাকাগুলো দিয়ে দিলেই চলবে?"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে বাবলু।

লোকটা যেনো তার অবস্থা বুঝতে পেরেছে এমন ভাব করে বলে, "মানিব্যাগে আমার জরুরি কিছু কাগজপত্র আর কার্ড রয়েছে, ওগুলো তোমার কোনো কাজে লাগবে না। তাছাড়া আমার স্বর্গীয় মায়ের একটা ছবিও আছে এখানে।" কথাটা বলে মানিব্যাগের ভেতরে

রখা ছবিটা দেখায় তাকে। "তোমাকে টাকাগুলো দিয়ে দিচ্ছি...ঠিক আছে?"

বাবলু কিছুই বলতে পারে নি। লোকটা কেন এমন আচরণ করছে বুঝতে পারে না। মানুষ না ফেরেস্তা? এমনভাবে কথা বলছে কেন?

টাকাগুলো বাড়িয়ে দিলে বাবলু দ্রুত পকেটে ভরে নেয়। চলে যেতে উদ্যত হবে তখন শোনে পেছন থেকে লোকটা শান্তকণ্ঠে তাকে বলছে, "আমি জানি তুমি এ লাইনের ছেলে নও।"

ফিরে তাকায় সে। কিছু বলতে পারে না। তার মনের একটা অংশ বলে দ্রুত চলে যেতে, কিন্তু অন্য একটা অংশ বলে, লোকটা তার কোনো ক্ষতি করবে না।

মাথা নেড়ে নিজের কথাটাকে নিজেই সমর্থন করে লোকটা আবার বলে, "মনে হচ্ছে তুমি লেখাপড়া জানা ছেলে," তারপর টাকাবিহীন মানিব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে বাড়িয়ে দেয় তার দিকে। "এটা নাও। আমার বিজনেস কার্ড। যদি দরকার মনে করো তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো।"

কার্ডটা নেবার কোনো ইচ্ছে ছিলো না তার কিন্তু লোকটার কথায় সম্মোহিত হয়ে কার্ডটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। তাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটা আবার বলে, "এভাবে পিস্তল হাতে এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। চলে যাও। পিস্তলটা কোমরে গুঁজে নাও। কেউ দেখে ফেললে সমস্যা হবে।"

সেদিন লোকটার কাছ থেকে যে টাকা পেয়েছিলো তা দিয়ে বেশ ভালোমতো কয়েকটা দিন চলে যায় তার। লোকটার কার্ড তার কাছে থাকলেও তার সাথে দেখা করার কোনো ইচ্ছে ছিলো না। কিন্তু লোকটাই একদিন তার বাড়িতে এসে হাজির হয়। অবাক হয় সে, কি করে তার বাড়ি খুঁজে পেলো এ লোক! বাবলু তার সব কথা বললে লোকটা জানায় তার নাম অমূল্য বাবু। সে যদি চায় তাহলে তার লেখাপড়ার সব দায়িত্ব সে তুলে নেবে নিজের কাঁধে। থাকাখাওয়ারও চিন্তা করতে হবে না।

লোকটার কাছ থেকে এরকম প্রস্তাব পাবার পর আর না করার মতো পরিস্থিতি ছিলো না তার পক্ষে। ইতিমধ্যে সে জেনে গেছে তার বাবার কমপক্ষে দশ-বারো বছরের জেল হবে। বেশ ভালোভাবেই ফেঁসে গেছে সে।

তো অকৃতদার অমূল্য বাবুর আশ্রয়ে চলে যায় বাবলু। তার কলেজের হোস্টেলে সিটের ব্যবস্থা করে দেয়া থেকে শুরু করে লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ চালিয়ে যেতে থাকে ভদ্রলোক। বছরে দুয়েক বার মাত্র দেখা হতো তাদের। লোকটা তাকে কোনো রকম নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতো না। সে যে তাকে সাহায্য করছে সেটাও প্রচার করে বেড়াতো না। অনেকটা নীরবে নিভৃতে চলতে থাকে এ ব্যাপারটি।

কিন্তু বাবলুর কলেজের এক ছাত্রনেতার সাথে ঘটনাচক্রে তার ঝগড়া লেগে গেলে ব্যাপারটা অনেক দূর গড়ায়। তার সহপাঠীরা মিটমাট করে দিলেও ঐ ছাত্রনেতা সন্তুষ্ট হতে পারে না। একদিন সে দলবল নিয়ে বাবলুর উপর চড়াও হয়। বেদম পিটুনি দিয়ে মারাত্মক আহত করে তাকে। ব্যাপারটা সে তার মেন্টর অমূল্য বাবুকে জানাতে পারতো, সে জানতো অমূল্য বাবু বেশ ক্ষমতাশালী একজন লোক, কিন্তু যে ছেলে কিশোর বয়সেই বেশ কয়েকটি হত্যা করেছে তারপক্ষে এভাবে মার খাওয়াটা হজম করা সম্ভব হয় নি। তার বাবার পিস্তলটাও তার কাছে ছিলো, সুতরাং অপমান আর মার খাওয়ার প্রতিশোধ নিতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে সে। ঐ ছাত্রনেতাকে কিছু দিনের মধ্যেই গুলি করে হত্যা করে বাবলু। যদিও কেউ এটা দেখে নি তারপরও সবাই বুঝতে পারে কাজটা করেছে সে-ই। এই ঘটনার পর ফেরারি হয়ে যায় সে। কলেজ থেকেও বহিষ্কার করা হয়। ছাত্রনেতার মূল দল তখন ক্ষমতায়। ফলে, তার জন্যে টিকে থাকাটা কঠিন হয়ে পড়ে।

কয়েক দিন পালিয়ে থাকলেও অবশেষে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে। অমূল্য বাবু তখন খবর পেয়ে তাকে জামিনে বের করে আনে কিন্তু খুনখারাবির মতো কাজে জড়িয়ে পড়ার জন্য তীব্র ভৎর্সনা করে তাকে। জানিয়ে দেয়, কোনো খুনির জন্য তার দরজা খোলা থাকবে

না।

জামিনে বের হয়ে বাবলু একেবারে একা হয়ে পড়ে। ফিরে যায় তার পুরনো ঠিকানায়। বস্তিতে ফিরে এসে অল্প দিনের মধ্যেই নানা রকম বেআইনী কাজকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়ে, কারণ তার কাছে একটা অত্যাধুনিক পিস্তল আছে। ধীরে ধীরে সে হয়ে ওঠে পেশাদার খুনি। অন্যদের চেয়ে একেবারে আলাদা আর শিক্ষাদীক্ষা থাকার কারণে খুব সহজেই এ পেশায় নিজের একটা অবস্থান তৈরি করে নিতে পারে। বস্তিতে সে পরিচিত হতে থাকে বাস্টার্ড বাবলু নামে, কারণ আরেকজন বাবলু ছিলো ওখানে, একেবারেই নিরীহগোছের একজন। তাই লোকজন তাকে আলাদা করে চেনানোর জন্য বাস্টার্ড শব্দটি জুড়ে দিতো। কালক্রমে আন্ডারওয়ার্ল্ডে সে শুধুই বাস্টার্ড নামে পরিচত হতে থাকে।

সামান্য সন্ত্রাসী আর চাঁদাবাজির পথে না গিয়ে ব্যয়বহুল পেশাদার কিলারে পরিণত হয়। এভাবে অনেক বছর অতিক্রম হবার পর একদিন পত্রিকা পড়ে জানতে পারে অমূল্য বাবু নামের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীকে কে বা কারা গুলি করেছে অফিস থেকে বের হবার সময়। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় হাসপাতালে। অমূল্য বাবু গুলিবিদ্ধ হলেও প্রাণে বেঁচে যায়। বাবলুকে দেখে খুব খুশি হয় ভদ্রলোক। কিন্তু বাবলু ততোদিনে ভয়ঙ্কর পেশাদার খুনি বাস্টার্ডে পরিণত হয়েছে, সে আর দেরি করে না, আন্ডারওয়ার্ল্ডে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে এক ব্যবসায়ীক প্রতিপক্ষ অমূল্য বাবুকে খুন করার জন্য আরেক পেশাদার খুনি মুরগী মিলনকে ভাড়া করেছিলো।

অমূল্য বাবুকে দেখে হাসপাতাল থেকে বের হবার মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা পরই মুরগী মিলন আর ঐ ব্যবসায়ী খুন হয় অজ্ঞাত এক খুনির হাতে। শয্যাশায়ী অমূল্য বাবু বুঝতে পারে কাজটা কে করেছে। বাবলু নামের ছেলেটা যে পেশাদার খুনি হয়ে উঠেছে সেটাও বুঝতে পারে ভদ্রলোক। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর অমূল্য বাবুর সাথে বাস্টার্ডের আবার যোগাযোগ হয়। মঝেমধ্যে ফোন করে খবর-টবর নিতো। তবে নিয়মিত যোগাযোগ কিংবা দেখা সাক্ষাত হতো না।

কিছু দিন আগে সেই অমূল্য বাবু তাকে ফোন করে দেখা করতে বলে। দেখা করার পর লেখক জায়েদ রেহমানের কাজটা দেয়। বাস্টার্ড একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে খুন করতে রাজি ছিলো না, কিন্তু সব খুলে বললে, বিশেষ করে ইরাম সিদ্দিকির সাথে জায়েদ রেহমান যা করেছে, সেটা জানার পর বাস্টার্ড রাজি হয়ে যায়। কাজটা করার পর থেকে অমূল্য বাবুর সাথে তার নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের পর দেশ ছাড়তে বাধ্য হয় সে, তবে তার আগে আগের বাসা ছেড়ে চলে আসে কলাবাগানের বর্তমান বাড়িটায়। এটার ব্যবস্থা অমূল্য বাবুই করেছে। কাগজপত্রে সে ভাড়াটিয়া হলেও কোনো রকম ভাড়া দেয়ার দরকার পড়ে না।

বছর তিনেক আগে, দীর্ঘ দশ বছর জেল খাটার পর মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে বের হয়ে আসে তার বাপ। নিজের বাবাকে দেখাশোনা করার জন্য তারই বাবার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় মজিদকে নিয়োগ দেয় সে। এখন সেই মজিদ তার বউ আর এক উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলেকে নিয়ে তাদের সাথেই বসবাস করে।

হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে মাকে দেখতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছে উমা। অবশ্য ওখানকার সাদা পোশাকের পুলিশ বলেছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেয়া হবে। তবে উমা জানে বেশ কয়েক দিনের জন্যে তাকে জেলেই থাকতে হবে, এরকম মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই সে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে যায়।

তার মা ঘুমিয়ে ছিলো, বিছানার পাশে বসে মায়ের কপালে হাত রেখেছে মাত্র অমনি সাদা পোশাকের দু'জন লোক এসে দাঁড়ায় তার সামনে। কোনো রকম তর্কাতর্কি না করে পুলিশের সাথে নীচে নেমে আসে। তারপর পুলিশের একটা জিপ চলে এলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় থানায়, সেখান থেকে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে।

এই ডিপার্টমেন্টের নাম সে খুব একটা শোনে নি। বুঝতে পারছে ডিবি, সিআইডি'র মতো কিছু হবে। তবে হোমিসাইডে ঢুকে, এর পরিবেশ দেখে তার কাছে মনে হলো কোনো অফিসে এসেছে। পুলিশের পোশাক পরা একটা লোককেও দেখতে পেলো না। সবাই স্বাভাবিক পোশাক পরে আছে।

দশ-পনেরো মিনিট বসিয়ে রেখে তাকে একটা রুমে নিয়ে যাওয়া হলো। এক মহিলা এসে তার শরীরে কিছু তার লাগিয়ে দিয়ে যাবার পরই ঘরে ঢুকলো সুদর্শন এক তরুণ। প্রথমে তাকে দেখে একটু ভড়কে গেলো সে। দেখতে অনেকটাই সেই অজ্ঞাত খুনির মতো! অমিল যে নেই তা নয়, তবে মিলই বেশি।

"কেমন আছেন?" সেই সুদর্শন তরুণ বেশ আন্তরিকভাবেই তাকে বললো।

"ভালো।"

"পুলিশ আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করে নি তো?"

অবাক হয়ে তাকালো সে। "না।"

"ভালো।" একটু থেমে আবার বললো সে, "আমার নাম জেফরি বেগ, আমি এখানকার একজন ইনভেস্টিগেটর। লেডি গিয়াস, মিনা আপা আর সুলতানের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছি।"

উমা বুঝতে পারলো না এই সুলতানটা আবার কে। লেডি গিয়াস আর মিনা আপার খুনের কথা তো সে জানেই।

"এখন বলুন, খুনি লোকটা কোথায়?" আয়েশ করে চেয়ারে হেলান দিলো জেফরি বেগ।

"আমি কিভাবে জানবো? আমি তো ঐ খুনির হাত থেকে পালিয়ে এসেছি," আস্তে করে বললো উমা।

জেফরি তার সামনে রাখা ল্যাপটপ থেকে মেয়েটির দিকে তাকালো।

মিথ্যে।

"তার সাথে আপনার পরিচয় কতো দিনের?"

"আমি তাকে চিনি না।"

সত্যি।

অবাক হলো জেফরি বেগ। "চেনেন না?"

"লেডি গিয়াসকে খুন করার পর আমাকে হোটেল থেকে পিস্তলের মুখে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো সে।"

সত্যি।

"কেন?"

"মিনা আপার বাড়ি চিনিয়ে দেবার জন্যে।"

সত্যি।

শুধু বাড়ি চিনিয়ে দেবার জন্যে আপনাকে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে গেলো?"

"হ্যাঁ।"

সত্যি।

"তারপর?"

“তারপর আমাকে একটা লেকের পাড়ে নিয়ে যায় খুন করার জন্য,” ঢোক গিলে বললো উমা।

জেফরি অবাক হয়ে গেলো, মেয়েটা বেশিরভাগ কথাই সত্যি বলছে। কিন্তু এতে করে খুশি না হয়ে বরং চিন্তায় পড়ে যাচ্ছে। তার কথা যদি মেনে নিতে হয় তাহলে তো গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়ছে সে।

“আপনাকে খুন করতে চেয়েছিলো কেন?”

“আমি কী করে বলবো। মনে হয় এসব খুনখারাবির কোনো সাক্ষী রাখতে চায় নি।”

“কিন্তু আপনাকে খুন করার আগেই পুলিশ এসে পড়ে, তাই না?”

উমা চেয়ে রইলো। তাকে আর কষ্ট করে কথাটা বলতে হলো না।

“তারপর সেখান থেকে কোথায় গেলেন?”

“অনেক জায়গায়, আমি সেইসব জায়গা চিনি না।”

“পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যাবার পর তো অনেক সময় পেলো খুনি, আপনাকে আর খুন করলো না কেন?”

“আমি অনেক কান্নাকাটি করেছি, হাতে-পায়ে ধরে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি...অবশেষে লোকটার বোধহয় আমার উপর মায়া হয়...সেজন্যে আর প্রাণে মারে নি।”

সত্যি!

জেফরি ভেবে পেলো না কী বলবে। “উমমম...খুনি আপনাকে নিয়ে গেস্টহাউজে কেন গেলো?”

“সেটা তো আমি বলতে পারবো না। তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার মতো সাহস আমার ছিলো না।”

সত্যি। উমা সত্যিই জানতো না বাস্টার্ড কেন গেস্টহাউজে গিয়েছিলো।

“আচ্ছা, একটু থেমে গুছিয়ে নিলো প্রশ্নগুলো। এবার আপনি কিভাবে পালিয়ে এলেন সেটা বলুন।”

“গেস্টহাউজ থেকে পালিয়ে যাবার পর লোকটা আমাকে নিয়ে ঢাকার বাইরে যেতে চেয়েছিলো...পথে ট্রাফিক-জ্যামে সিএনজি আটকে থাকে অনেকক্ষণ, লোকটা একটু ঘুমিয়ে পড়াতে আমি আস্তে করে সিএনজি থেকে নেমে পালিয়ে আসি।”

মিথ্যে!

চেয়ারে সোজা হয়ে বসলো জেফরি বেগ। সর্বনাশ! পলিগ্রাফ মেশিনটা কি নষ্ট হয়ে গেলো নাকি! “ঐ খুনি লোকটা কে সে সম্পর্কে কি আপনার কোনো ধারণাই আছে?”

“না। আমি শুধু আন্দাজ করতে পেরেছি তবে নিশ্চিত নই,” উমা বললো।

কি আন্দাজ করতে পেরেছেন?”

“লোকটা কোনো গোয়েন্দা সংস্থার কেউ হবে।”

“কি!” আরেকটু হলে জেফরি চেয়ার ছেড়ে উঠেই যাচ্ছিলো। “আপনি কিভাবে বুঝলেন?”

“মিনা আপা যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো আপনি কি পুলিশের লোক, লোকটা তখন বলেছিলো সে নাকি তারচেয়ে বড় কিছু। ডিবি, এসবি, এনএসআই এরকম কিছু কিনা জানতে চাইলে লোকটা হেসেছিলো...সেজন্যেই আন্দাজ করেছি লোকটা গোয়েন্দা সংস্থারই কেউ হবে।”

জেফরি বেগ উমার দিকে চেয়ে রইলো। সে জানে পলিগ্রাফ মেশিন আন্দাজের বিচার করতে পারে না। সুতরাং মেয়েটি যে আন্দাজ করেছে সেটা সত্যিও হতে পারে মিথ্যেও হতে পারে। তবে সে বুঝতে পারছে না এই মেয়ের কোন্ কথাটাকে সত্যি বলে ধরে নেবে। পলিগ্রাফ টেস্টকে মেনে নিলে পুরো ব্যাপারটাই তালগোল পাকিয়ে যাবে।

“আপনি মিনা আপার খপ্পরে পড়লেন কিভাবে?” প্রসঙ্গ পাল্টাতে বাধ্য হলো সে।

“অভাবে পড়ে...আমার মা-বাবা দুজনেই অসুস্থ।” মাথা নীচু করে ফেললো উমা।

“খুন করার আগে লেডি গিয়াসকে খুনি কি জিজ্ঞেস করেছিলো? মানে তাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছে?”

“আমি শুধু শুনেছি লোকটা লেডি গিয়াসকে জিজ্ঞেস করছে, ব্ল্যাক রঞ্জু কোলকাতার কোথায় থাকে। তারপর আমাকে বাথরুমে আটকে রাখে। আর কিছু শুনতে পাই নি।”

“গুলির আওয়াজ শোনেন নি?”

“না।”

“কিন্তু গুলি তো হয়েছে?”

“হ্যা, গুলি হয়েছে।”

মেয়েটা তো ঠিকই বলছে। জেফরি খেই হারিয়ে ফেললো। পলিগ্রাফ টেস্ট আর এই মেয়েটা কি আজ যুক্তি করেছে জেফরি বেগের মাথাটা খারাপ করেই ছাড়বে?

“আওয়াজ হয় নি কোনো?”

“না। একটা লম্বা নলওয়ালা পিস্তল দিয়ে গুলি করেছে।”

সাইলেন্সর।

“লেডি গিয়াসকে কিভাবে খুন করলো সে?”

“তারা মনে হয় অনেকক্ষণ মারামারি করেছে, তারপর বাথরুমের দরজায় নক করে লেডি গিয়াস, আমি দরজা খুলে দেখি সে দাঁড়িয়ে আছে। তার নাকমুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে...ঠিক তখনই লোকটা পেছন থেকে চাকু মারে তাকে।”

ওহ্। এই মেয়েটা তো সত্যিই বলছে। তার অনুমাণের সাথেও মিলে যাচ্ছে এর বর্ণনা।

“আর মিনা আপা? তাকে কিভাবে খুন করলো?”

“মিনা আপাকে লোকটা খুন করতে চায় নি, তার কাছ থেকে শুধু জানতে চেয়েছিলো ব্ল্যাক রঞ্জু কোথায় আছে। কিন্তু মিনা আপা ডায়রিতে ঠিকানা লেখা আছে বলে ড্রয়ার থেকে পিস্তল বের করে তাকে গুলি করে, গুলি খাওয়ার পরই লোকটা তাকে খুন করে ফেলে।”

সত্যি।

“খুনি গুলি খেয়েছে?” নড়েচড়ে উঠলো জেফরি বেগ।

“হ্যাঁ।”

“কোথায়?”

“কাঁধে...তবে তেমন গুরুতর নয়।”

“আপনি কিভাবে জানলেন?”

“আমি তার ক্ষতস্থান ড্রেসিং করে দিয়েছি।”

“তাই নাকি?”

“হ্যাঁ। অস্ত্রের মুখে বাধ্য করেছে।”

“খুনি কোনো ডাক্তারের কাছে যায় নি?”

“গিয়েছিলো কিন্তু জায়গাটা আমি চিনি না।”

“আপনি তো আজ সকালে আপনার বাড়িতে গেছিলেন, খুনি আবার সেখানে গেলো কেন?”

“জানি না। সে আমাকে অস্ত্রের মুখে জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়।”

“সে আপনার বাড়ির ঠিকানা জানলে কেমন করে?”

“পুলিশের কাছ থেকে নাকি জেনেছে।”

রীতিমতো ভিমরি খেলো জেফরি। “এটা কে বলেছে?”

“ঐ লোকটাই আমাকে বলেছে...সে নাকি শুনেছে আমার বাড়িতে পুলিশ আসছে।”

মাইগড! জেফরি বেগ বিশ্বাসই করতে পারছে না। জামান তাহলে ঠিকই ধরতে পেরেছিলো!

রাত দশটা থেকে পরদিন সকাল নটা পর্যন্ত একটানা এগারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে থাকলো বাস্টার্ড। গুলির আঘাতটা তাকে পর্যুদস্ত করতে পারে নি তবে শরীরটাকে অনেক দূর্বল করে ফেলেছে। তার বিশ্রামের প্রয়োজন ছিলো, প্রয়োজন ছিলো এক খণ্ড অবসরের যাতে করে পুরো পরিকল্পনাটা সাজিয়ে নিতে পারে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথম যে কাজটি করলো সেটা হলো পত্রিকা পড়া। ঘুমোতে যাবার আগেই মজিদকে বলে রেখেছিলো চার-পাঁচটা পত্রিকা জোগাড় করে রাখতে। মজিদ হলো এই বাড়ির সব কিছুর হর্তাকর্তা। তার অধীনেই শয্যাসায়ী বাপকে রেখেছে সে। তার বাপ দীর্ঘ দশ বছর জেল খেটে বের হবার পর থেকেই মজিদ এই বাড়িতে আছে। লোকটা তার বাপের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তার স্ত্রী আমেনাও থাকে এখানে। রিপন নামের বিশ বাইশ বছর বয়সী তাদের এক ছেলে আছে, খারাপ ছেলেপুলেদের সাথে মিশে বখে গেছে। নেশা-টেশাও করে। বছরখানেক ধরে সেই ছেলেটা মা-বাপকে ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় থাকে, কি করে কেউ জানে না। মাঝেমধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে মার কাছে আসে, দেখা করে আবার চলে যায়।

এই মজিদ আর আমেনা তার বাপ-ছেলের ছোট্ট সংসারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে এখন।

বিছানার পাশেই সাইড টেবিলের উপর পত্রিকাগুলো দেখতে পেলো। বুঝতে পারলো খুব সকালেই মজিদ এগুলো এখানে রেখে গেছে।

একটা পত্রিকা হাতে তুলে নিলো। প্রথম পৃষ্ঠায় মাঝারি আকারে সংবাদটি ছাপা হয়েছে। ভিকটিমের ছবি আর দু'কলামের একটি রিপোর্টিং। লেডি গিয়াসের রক্তাক্ত মুখমণ্ডল। খবরটা পড়ে দেখলো।

লেডি গিয়াস যে কুখ্যাত সন্ত্রাসী ব্ল্যাক রঞ্জুর অন্যতম সহচর সেটা বেশ ফলাও করে বলা হয়েছে। হোটেল পিং সিটির মালিকও নাকি ব্ল্যাক রঞ্জু নিজে, তবে কাগজে-কলমে তার বড় ভাইকে মালিক হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে। তার ভাইয়ের নাম মনোয়ার হোসেন মঞ্জু। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী। বর্তমানে গা ঢাকা দিয়ে আছে। এই তথ্যটা তার কাজে দেবে, মনে মনে ভাবলো সে।

বাস্টার্ডের চোখ আটকে গেলো খবরটার একেবারে শেষ দিকে এসে : বর্তমানে এই কেসটি তদন্ত করছে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট। ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ যে লন্ডন থেকে ফিরে এসে তদন্ত কাজটি করছেন সেটাও বলা আছে।

বাস্টার্ড এবার বুঝতে পারলো কেন এতো দ্রুত তাকে ট্র্যাকডাউন করা সম্ভব হলো। জেফরি বেগ তাহলে ফিরে এসেছে! তার কাছে খবর ছিলো ঐ ইনভেস্টিগেটর লন্ডনে আছে।

আরেকটা তথ্য তার মনোযোগ আকর্ষণ করলো : রিপোর্টার হোমিসাইডের বরাত দিয়ে বলেছে, ব্ল্যাক রঞ্জুর বর্তমান স্ত্রী এবং তার আরেক সহযোগী সুলতানও একই রাতে খুন হয়েছে। হোমিসাইড মনে করছে এই তিনটি খুন একই ব্যক্তি করেছে। খুনের মোটিভও অভিন্ন।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো সে। মিনা আপা নামের ঐ মহিলা তাহলে রঞ্জুর বর্তমান স্ত্রী?

এটা সে জানতো না। খুব সম্ভবতম উমা নামের মেয়েটিরও অজানা ছিলো। দ্বিতীয় পত্রিকাটি তুলে নিলো এবার।

প্রায় একই রকম খবর আছে তবে প্রথমটির তুলনায় কিছু তথ্য কম। যেমন হোমিসাইডের বরাত দিয়ে কোনো কথা লেখা নেই। হয়তো এই পত্রিকার রিপোর্টার হোমিসাইডের কারো কাছ থেকে কোনো মন্তব্য জোগাড় করতে পারে নি।

তৃতীয় পত্রিকাটি তুলে নিলো সে।

এরা তিনটি খুনের ঘটনাই আলাদা আলাদাভাবে ছেপেছে বেশ গুরুত্ব দিয়ে। বর্তমান সরকারের আমলে যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে সে কথা বেশ

কয়েকবার বলা হয়েছে। খুনের ঘটনার চেয়ে সরকারের ব্যর্থতাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে তারা। তবে একটা নতুন তথ্য দিয়েছে পত্রিকাটি : হোটেল পিং সিটির ম্যানেজারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সন্দেহ করছে লোকটা ব্ল্যাক রঞ্জুর দলেরই কেউ হবে। লোকটা নাকি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও দিয়েছে পুলিশকে।

চতুর্থ পত্রিকাটিতে মনগড়া তথ্য দিয়ে আজগুবি কাহিনী ছাপা হয়েছে।

ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণেই যে এই হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত হয়েছে সে ব্যাপারে তাদের কোনো সংশয় নেই। তারা এ আশংকাও করেছে, খুব শীঘ্রই আরো কিছু হত্যাকাণ্ড ঘটবে। ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের ভেতর বড়সড় ভাঙন শুরু হয়ে গেছে! তিনটি খুনই করা হয়েছে একই সময়ে, নিখুঁত দক্ষতায়, একাধিক লোকের সাহায্যে!

বাস্টার্ড পত্রিকাটা তাচ্ছিল্যভরে রেখে দিলো। টয়লেট পেপার।

উমার ব্যাপারে কোনো খবর নেই দেখে সে অবাক হলো না। তার কারণ মেয়েটা গ্রেফতার হয়েছে রাতে। পত্রিকাগুলো হয়তো আগামীকাল সেই সংবাদ ছাপাবে। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো মেয়েটার জন্য সে দুশ্চিন্তা করছে।

মেয়েটা যদি তার কথামতো কাজ করে তাহলে খুব জলদিই সে এইসব ঝামেলা থেকে বেঁচে যেতে পারবে-এরকম একটি ধারণা তার ছিলো কিন্তু এখন হোমিসাইডের জড়িত হবার খবরটা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লো। ঐ মেয়ের পক্ষে কি জেফরি বেগের মতো ইনভেস্টিগেটরকে বোকা বানানো সম্ভব হবে?

জোর করে বিছানা থেকে উঠে বাথরুমে চলে গেলো। ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে নিজের ভেতরে সমস্ত চাপ আর ভার লাঘব করে নেবে। তাকে খুব দ্রুত চলে যেতে হবে কোলকাতায়। তবে এটাও ঠিক, ব্ল্যাক রঞ্জুর অবস্থান খুঁজে বের করাটা যে সহজ কাজ হবে না সেটা সে জানে। রঞ্জুর স্ত্রী, মিনা নামের ঐ মহিলা তাকে যে ঠিকানাটা বলেছে সেটা নির্ঘাত ভুয়া। এই ভুয়া ঠিকানা নিয়ে কোলকাতায় যাওয়াটা ঠিক হবে না। তার চাই আরো নির্ভুল তথ্য। একেবারে নিশ্চিত ঠিকানা না জেনে কোলকাতায় চলে গেলে কানা গলিতে ঢুকে পড়বে। আবার এখানেও বেশিদিন থাকা ঠিক হবে না। যা করার দ্রুত করতে হবে।

জেফরির কাছ থেকে সব শুনে হোমিসাইডের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ চুপ মেরে গেলো।

"স্যার, উমা মেয়েটি খুনির সাথে দীর্ঘক্ষণ ছিলো...দুটো খুন তার সামনেই করা হয়েছে, মেয়েটার কথার গুরুত্ব দিতে হবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মহাপরিচালক। "চিন্তার বিষয়।" কথাটা বলেই আবার চুপ মেরে গেলো জেফরির বস।

"আপনি আর দেরি না করে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখুন,.. যদি সত্যি সত্যি এরকম কোনো গোপন অপারেশন চলতে থাকে তাহলে আমাদের সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা যাবে। খামোখা আমরা কেন এই ইঁদুর-বেড়াল খেলায় ব্যস্ত থাকবো?"

আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো ফারুক আহমেদ। "কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা..."

"কি কথা, স্যার?" উদগ্রীব হয়ে বললো জেফরি।

"এরকম গোপন অপারেশন যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা সে সম্পর্কে জানবো না সেটা মেনে নেয়া যায় কিন্তু ঘটনা ঘটার পর যখন আমরা তদন্তে নেমেছি তখন তো আমাদেরকে জানানো উচিত, নাকি?... মিছেমিছি আমাদের সময় নষ্ট করার তো কোনো মানে হয় না।"

"স্যার, তারা সেটা কেন করে নি বুঝতে পেরেছি।"

সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকালো হোমিসাইড প্রধান।

"অপারেশনটা এখনও শেষ হয় নি...আর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা চায় না এটা কেউ জেনে যাক। তারা হয়তো ভেবেছিলো তদন্ত কাজটি এতো দ্রুত এগোবে না। এখন যখন দেখছে কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে গেছে তখন অন্য কৌশল নিয়েছে।"

"কি কৌশল?"

"নিজেদের লোকদেরকে আমাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার কৌশল... তাদেরকে আমাদের নাগালের বাইরে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ফারুক আহমেদ। "সব শুনে আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

"স্যার, আপনি দ্রুত জেনে নিন ব্যাপারটা কি। সব কিছু না জেনে এই তদন্ত করাটা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই হবে না। আমি আপাতত তদন্ত কাজ বন্ধ রাখছি। দুয়েক দিনের মধ্যে আপনি জেনে নিন আসলে বিহাইন্ড দ্য সিনে কী হচ্ছে।"

"ওকে, মাইবয়।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফারুক সাহেব আবার বললো, "ঐ মেয়েটার কী করবে?"

"কী আর করবো...তাকে কাস্টডিতে রেখে তো কোনো লাভ নেই। ছেড়ে দেবো। তবে বলে দেবো আমাদের না জানিয়ে যেনো ঢাকার বাইরে না যায়। তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হবে। আর্টিস্টের সাথে মেয়েটার একটা সিটিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। খুনিকে ও-ই সবচেয়ে বেশি দেখেছে, একেবারে কাছ থেকে।"

"তা ঠিক।" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ফারুক সাহেব। জেফরিও উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে।

"আপনি কি এখনই বেরুচ্ছেন, স্যার?"

"হ্যা।" ডেস্ক থেকে উঠে এসে জেফরির কাঁধে হাত রেখে দরজার দিকে পা বাড়ালো মহাপরিচালক। "আমি আজকের মধ্যেই ব্যাপারটা জেনে নেবো। তুমি এ নিয়ে চিন্তা কোরো না।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।"

জেফরির পিঠে আলতো করে চাপড় মেরে নিজের রুম থেকে বের হয়ে গেলো হোমিসাইডের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ।

ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল করার সময়টাতেই তার মাথায় আইডিয়াটা আসে। সে ঠিক করে ব্ল্যাক রঞ্জু সম্পর্কে আরো নির্ভরযোগ্য তথ্য জেনে নেবে। এবার যার কাছ থেকে ঠিকানাটা আদায় করে নেবে সেটা তাৎক্ষণিকভাবেই খতিয়ে দেখবে সঠিক কিনা।

গোসলের পরও আরেক দফা বিশ্রাম নিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লো বাস্টার্ড। তবে সারা দিন কোনো কাজ করলো না শুধুমাত্র দু'কোটি টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দেয়া ছাড়া। সবগুলো টাকা একটি একাউন্টে না রেখে মোট চারটি একাউন্টে রাখলো। তার এই চারটি একাউন্ট বিদেশী ব্যাঙ্কের, ফলে খুব সহজেই টাকাগুলো যেকোনো জায়গায় নিরাপদে সরিয়ে ফেলা যাবে।

তার কাছে থাকা প্রায় সবগুলো মোবাইল ফোন বন্ধ করে রেখেছে। ভালো করেই জানে এগুলো তার অবস্থান চিহ্নিত করে ফেলবে। তবে কয়েক জায়গা ফোন করার দরকার বলে ব্যাঙ্ক থেকে ফেরার সময় সম্পূর্ণ নতুন একটি ফোনসেট আর সিম কিনে নিলো ভুয়া জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে।

কাজ শেষে ফিরে এলো কলাবাগানের বাড়িতে। আজ রাতটাও এখানে থাকবে তারপর শুরু করবে পরবর্তী কাজ। মাঝেমধ্যেই উমা নামের মেয়েটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তার। মেয়েটার কী অবস্থা জানতে উদগ্রীব হয়ে আছে কিন্তু ভালো করেই জানে এখন সেটা সম্ভব নয়। মেয়েটাকে আজ কোর্টে চালান দেয়া হয় নি। তার পরিচিত এক আইনজীবিকে বলে রেখেছিলো সে, লোকটাকে কিছুক্ষণ আগে ফোন করলে এ কথা জানা গেছে। তার মানে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের কাস্টডিতে আছে। যাইহোক না কেন, মেয়েটা যা ই বলুক না কেন, তার কোনো সমস্যা হবে না। মনে মনে চাইলো মেয়েটা যেনো সব সত্যি কথাই বলে। নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে অতিরিক্ত সতর্কতার কারণে মিথ্যে বললে বরং ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা আছে। সত্যি বললে কী আর সমস্যা হবে? মেয়েটা খুব কমই জানে। যতোটুকু জানে তা বললে তার কোনো সমস্যা হবে না। মেয়েটাও হয়তো বেঁচে যাবে।

সন্ধ্যা সাতটার দিকে কলাবাগানের বাড়িতে বসে একটা কাজ করলো সে। সদ্য কেনা অত্যাধুনিক মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট কানেকশান আছে, গুগল-এ 'হোটেল নিয়ার ঢাকা সার্চ করে উত্তরার পিং সিটি হোটেলের কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা জোগাড় করে ফেললো। কাজটা এতো সহজে করতে পারলো বলে একটু অবাকই হলো সে।

পিং সিটিতে ফোন করলো বাস্টার্ড।

"হ্যালো, হোটেল পিং সিটি থেকে বলছি," একটা নারীকণ্ঠ বললো।

"আমি কি আপনাদের ম্যানেজারের সাথে একটু কথা বলতে পারি?"

"আপনি কে বলছেন?" নারী কণ্ঠটা সন্দিগ্ধ হয়ে জানতে চাইলো।

"আমি উনার ইনকাম ট্যাক্স লইয়ার... আপনি আমাকে চিনবেন না। উনাকে একটু দেয়া যাবে? মোবাইলে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু সেটা তো বন্ধ।"

"স্যার, উনি তো এখন নেই..."

"আমি শুনেছি উনাকে নাকি পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, কথাটা বিশ্বাস করি নি... আসলেই কি ধরে নিয়ে গেছে?"

একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো মেয়েটাকে। "উমমম... জি, স্যার।"

"সো স্যাড... তাই তো বলি ফোন বন্ধ কেন। আচ্ছা, কেসটা কি, আপনি কিছু জানেন?"

"স্যার, আমাদের হোটেলে একটা খুন হয়েছে তো তাই উনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পুলিশ নিয়ে গেছে। আশা করছি আগামীকালই জামিন পেয়ে যাবেন।"

"ভালো কোনো উকিল ধরা হয়েছে তো?"

"জি, স্যার... আমাদের মালিক অনেক বড় উকিল ধরেছেন।"

"ভেরি গুড। তাহলে আপনি নিশ্চিত, কালকের মধ্যেই জামিন পাচ্ছেন?"

"আমাকে সেরকমই বলা হয়েছে।"

"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ... আপনার নামটা কি জানতে পারি?"

“জি, স্যার। আমার নাম সাগরিকা।”

“চমৎকার নাম, এ নামে উত্তম কুমারের একটা ছবি আছে, তাই না?”

“জি, স্যার, মেয়েটা হেসে বললো।

“নিশ্চয় আপনার বাবা-মা উত্তম কুমারের ভক্ত ছিলেন?”

“জি, স্যার। আমার মা উত্তম কুমারের অনেক বড় ভক্ত।”

“আমিও তার ভক্ত। কোন্ বাঙালি তার ভক্ত নয়, বলুন?”

“তাতো ঠিকই, স্যার।”

“ঠিক আছে, তাহলে কাল আপনাকে ফোন করে জেনে নেবো ম্যানেজার সাহেব জামিন পেয়েছেন কিনা। খুব জরুরি দরকার, বুঝলেন।”

“নো প্রবলেম, স্যার। আপনি দুপুরের পরে ফোন করলে আশা করি সুখবরটা দিতে পারবো।”

“কিন্তু একটা সমস্যা আছে যে।”

“কি সমস্যা, স্যার?” মেয়েটা বেশ সহযোগীতা পরায়ণ আচরণ করছে এখন।

“আমি তো পরশু চলে যাবো সিঙ্গাপুর... একটু থরো চেকআপ করাতে হবে:.. ধরুন ম্যানেজার সাহেব কাল জামিন পেলেন না, তাহলে তো একটা ঝামেলা হয়ে যাবে। আসলে কিছু ডকুমেন্ট তার কাছে দিয়ে না গেলেই নয়। আপনি কি তার বাসার ঠিকানাটা দিতে পারবেন? ইনকেস, কাল যদি উনার জামিন না হয় আমি ডকুমেন্টগুলো উনার বাসায় দিয়ে সিঙ্গাপুর চলে গেলাম...?”

“অবশ্যই দেয়া যাবে, স্যার। আপনি একটু হোল্ড করুন, আমি ঠিকানাটা দিচ্ছি।”

কয়েক সেকেন্ড পরই মেয়েটা আবার লাইনে ফিরে এলো। আমি বলছি আপনি লিখে রাখুন...”

বাস্টার্ড মেয়েটার কাছ থেকে ঠিকানাটা শুনে নিলো, তবে ভান করলো সে লিখে নিচ্ছে।

“ঠিক আছে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো। কাল তাহলে ফোন করে জেনে নেবো?”

“অফকোর্স, স্যার।”

“থ্যাঙ্ক ইউ এগেইন, সাগরিকা।”

পিং সিটির ম্যানেজারের বাড়ির ঠিকানা জেনে গেছে সে। আগামীকাল লোকটা জামিন পেলেই কাজে নেমে পড়বে। এই লোকটাই হবে তার আসল চাবিকাঠি।

বাস্টার্ড ফোনটা বন্ধ করে টিভি ছেড়ে দিলো। আজ রাতটাও বিশ্রাম নেবে। আশা করলো দুদিনের বিশ্রামের পর শরীরটা আবার আগে অবস্থায় ফিরে যাবে। কাঁধের ব্যাথাটাও অনেক কমে এসেছে। এখন শুধু অপেক্ষা ক্ষতটা সারতে কতো দিন লাগে।

জেফরি বেগ ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের তিনটি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত আপাতত বন্ধ রাখার কথা বললেও, পরদিন অফিসে এসে সহকারী জামানকে বলে দিলো ঢাকা শহরের সবগুলো থানায় একটা অনুরোধ জানানোর জন্য : বিগত এক মাসে ব্ল্যাক রঞ্জু সংক্রান্ত কোনো কেস, জিডি কিংবা কোনো তথ্য থাকলে তারা যেনো সেটা হোমিসাইডকে জানায়। নিজের বসকে তদন্ত কাজ বন্ধ রাখার কথা বললেও একেবারে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার লোক সে নয়। কাজ একটু এগিয়ে রাখলে ক্ষতি কি?

জামান তাকে আরেকটা তথ্য জানিয়ে গেছে : খুনি তার কাছে থাকা, পুরনো মোবাইল ফোনগুলো আর ব্যবহার করছে না। সম্ভবত সে টের পেয়ে গেছে মোবাইল ফোনগুলো তার অবস্থান জানিয়ে দিচ্ছে। জেফরি আগেই বুঝতে পেরেছিলো এটা। একটা সহজ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে বলে কিছুটা আফসোস তৈরি হলো তার মধ্যে।

পিং সিটির গেস্ট অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল সাহেব ফোনে জানিয়েছেন তিনি আগামীকাল সকাল দশটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত সময় দিতে পারবেন। জেফরি সেই মোতাবেক হোমিসাইডের আর্টিস্টকে জানিয়ে রাখলো আগামীকাল সকালে সে যেনো প্রস্তুত থাকে। এই কর্নেলের সাথে সিটিংয়ের পরই উমার কাছ থেকে বর্ণনা শুনে আর্টিস্টকে আরেকটা ছবি আঁকতে হবে। তারপর দুটো ছবি মিলিয়ে তৈরি করা হবে একটি ইমেজ। সে কাজটা অবশ্য কম্পিউটার করবে।

হাতে কোনো কাজ নেই তাই সময়টা ভালো কাটছে না। অফিসের ছোট্ট টিভিটা ছেড়ে দিলো সে। কিছুক্ষণ পরই তার ফোনটা বিপ করে উঠলে দেখতে পেলো একটা ইনকামিং মেসেজ এসেছে।

রেবা।

মুচকি হেসে মেসেজটা ওপেন করলো সে।

লাভ ইউ! ডু ইউ লাভ মি?

জেফরি যতোক্ষণ অফিসে থাকে রেবা তাকে খুব দরকার না পড়লে ফোন করে না, সে চায় না কাজের সময় জেফরির মনোযোগ বিঘ্নিত হোক। শুধু মাঝেমধ্যে এরকম মেসেজ পাঠিয়ে থাকে। এটা জেফরি বেশ পছন্দ করে।

সেও মেসেজটার রিপ্লাই দিলো :

নো, ম্যাডাম! আই ... ইউ!

মেসেজটা পাঠিয়ে হেসে ফেললো সে। এরপর রেবা কি জবাব দেবে সেটা সে জানে।

জায়েদ রেহমানের খুনি বাস্টার্ড আর সি ই এ সিদ্দিকীকে ধরার ব্যর্থতার ভার বেশি দিন তাকে বইতে হয় নি। রেবা যখন তার কাছে চলে এলো তার ঠিক দশ দিন পরই লন্ডন থেকে আমন্ত্রণটা আসে। অল্প দিনের নোটিশে তাকে এক মাসের জন্য চলে যেতে হয় লন্ডনে। আমন্ত্রণটা আসার পর একটা চিন্তা মাথায় ছিলো : রেবাকে কার কাছে রেখে যাবে। সে তো তার বাব-মা'র বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। সেখানে ফিরে যাবার কোনো ইচ্ছে তার নেই।

এ রকম সময়ে এক দিন রেবার বাবা জেফরির সাথে দেখা করে একটা মীমাংসা করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু জেফরি খুব একটা পাত্তা দেয় নি ভদ্রলোককে। অনেকটা এড়িয়ে যায়। এরপরই রেবার বাবা তার স্ত্রীকে পাঠায় জেফরির কাছে। মহিলা জেফরি আর রেবাকে বোঝাতে সক্ষম হয় যা হবার হয়ে গেছে, এখন ভালোয় ভালোয় তাদের বিয়েটা দিতে চায় তারা। তাদের আর কোনো আপত্তি নেই। মহিলার কান্নাকাটিতে রেবা কিছুটা নরম হয়। সিদ্ধান্ত হয়, জেফরি লন্ডন থেকে ফিরে আসার পরই তাদের বিয়ের দিন ঠিক করা হবে। আর জেফরি যতোদিন লন্ডনে থাকবে রেবা যেনো তার বাবার বাড়িতেই থাকে। জেফরির কাছেও ব্যাপারটা ভালো সমাধান বলে মনে হওয়াতে রেবা আর না করে নি।

এখন সে দেশে ফিরে এসেছে চার-পাঁচ দিন হলো। আশা করা যাচ্ছে সামনের মাসে একটা ভালো দিন দেখে তাদের বিয়ের তারিখ ঠিক করা হবে।

রেবার সাথে তার প্রায় প্রতিদিনই অল্প সময়ের জন্যে হলেও দেখা হয়। প্রতিদিন অন্তত

এক কাপ চা কিংবা কফি তারা একসাথে বসে খায়, গল্পগুজব করে তারপর রেবাকে তাদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে চলে আসে নিজের শূন্য ঘরে।

"আসতে পারি?"

একটা নারী কণ্ঠ শুনে জেফরি চেয়ে দেখলো এডলিন ডি কস্টা তার দরজার সামনে। একা পেলে এই মেয়ে জেফরিকে স্যার সম্বোধন করে না। এখনও তাই করলো।

"আসুন।"

ঘরের ভেতর ঢুকেই তার সামনের চেয়ারে বসে পড়লো সে।

"কি ব্যাপার বলুন?" জেফরি জানতে চাইলো।

একটা লেটার বাড়িয়ে দিলো জেফরির দিকে। "আমার কয়েক দিনের ছুটি লাগবে," জেফরির চোখে চোখ রেখে বললো মেয়েটি।

অবাক হলো সে। "ছুটির দরকার তো আমার কাছে কেন এসেছেন?" হোমিসাইডের চিফ ইনভেস্টিগেটর হিসেবে জেফরি কোনো প্রশাসনিক কাজকর্ম করে না। জুনিয়রদের ছুটির দরখাস্ত অনুমোদন করার এখতিয়ারও তার নয়। তাহলে এই মেয়ে তার কাছে এসেছে কেন?

"ডিজি স্যার বলেছেন আপনার কাছ থেকে অনুমতি নিতে, মানে আমাকে আপনার দরকার হবে কিনা সেজন্যে," একটু থেমে রহস্য করে বললো সে, "আমাকে কি আপনার দরকার?"

মেয়েটার চোখ দুটো কেমন জানি করছে। জেফরি অস্বস্তিতে পড়ে গেলো। পুরো ঘরটা এডলিনের পারফিউমের গন্ধে মৌ মৌ করছে এখন।

"আমি অনুমতি দেবো?" আরো অবাক হলো সে। "ফারুক স্যার বলেছেন?"

"হ্যাঁ।" এবারও স্যার বললো না।

"কিন্তু আমি তো কারোর ছুটির দরখাস্তে সই করি না... মানে এটা করার এখতিয়ার আমার নেই।"

"সেটা আমিও জানি কিন্তু ডিজি স্যার বললেন আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে তিনি ছুটি মঞ্জুর করবেন।"

একটু ভেবে জেফরি বললো, "ঠিক আছে, দিলাম।" সে চাচ্ছে এই মেয়েটা যতো দ্রুত ঘর থেকে চলে যাক। তার চোখের চাহুনি এখন আরো বেশি অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে।

"তাহলে লেটারের এক কোণে নোট লিখে সই করে দিন," নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে ডেস্কের দিকে ঝুঁকে লেটারটার একটা জায়গা দেখিয়ে বললো এডলিন ডি কস্টা।

জেফরি লেটারটা হাতে নিয়ে পড়ে দেখলো না, সঙ্গে সঙ্গে একটা নোট লিখে সই করে দিয়ে লেটারটা এডলিনের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

"পড়ে দেখলেন না কেন ছুটি নিচ্ছি?" চোখেমুখে আরো রহস্যময়ী ভাব করে বললো এডলিন।

একটু বিষম খেলো জেফরি। "কেন?"

"আমার এনগেজমেন্ট!" বলেই মুখ টিপে হেসে চলে গেলো দরজার কাছে।

একটু অবাক হলো জেফরি তবে বুঝতে পারলো না এনগেজমেন্টের কথা বলতে গিয়ে এমন রহস্যময় হাসি হাসার কারণটা কি। মেয়েটা কি ঠাট্টা করছে?

মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলতে চাইলো। হাফ ছেড়ে বাঁচলো জেফরি। এই মেয়েটার উপস্থিতি তাকে কেমন যেনো বিব্রত করে। এটা হয় মেয়েটার অস্বাভাবিক চাহনির কারণে।

আবারো তার ফোনটা বেজে উঠলে জেফরি কলটা রিসিভ করলো।

"স্যার," জামানের কণ্ঠটা বললো। "ডিসি প্রসিকিউশন থেকে এইমাত্র জানালো পিং সিটি হোটেলের ম্যানেজার জামিন পেয়ে গেছে।"

"তাই নাকি," জেফরি অবশ্য অবাক হলো না। যদিও ডিসি প্রসিউঁকিশনকে বলে দেয়া হয়েছিলো লোকটার জামিনের আবেদনের ব্যাপারে যেনো তীব্রভাবে বিরোধীতা করা হয় সরকার পক্ষ থেকে।

“জি, স্যার। ম্যানেজারকে কি ফলো করা হবে? তার পেছনে কি তোক লাগিয়ে দেবো?”

একটু ভেবে নিলো জেফরি। এ মুহূর্তে এটার কোনো দরকার নেই। খামোখা সময় নষ্ট। “না। আপাতত দরকার নেই।”

“ঠিক আছে, স্যার।”

ফোনটা রেখে দিলো জেফরি বেগ।

পিং সিটির ম্যানেজার জামিন পেয়েই সোজা চলে গেলে নিজের বাড়িতে। ভদ্রলোক থাকে উত্তরার ৬ নাম্বার সেক্টরে। জীবনে এই প্রথম পুলিশে ধরা খেয়ে কাস্টডিতে ছিলো, রিমান্ডে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে, তাই একটু ভড়কে গেছিলো। অবশ্য তার মলিক মনোয়ার হোসেন সাহেব বেশ জাঁদরেল উকিল নিয়োগ দিয়ে কোর্ট থেকে জামিন করিয়েছে। মালিকের কাছে সে কৃতজ্ঞ, যদিও তার মালিক নিজেও সমস্যায় আছে এখন। গা ঢাকা দিয়ে আছে বেচারা। কোথায় আছে সেটা এমন কি সে নিজেও জানে না। তবে তার মালিক যে খুব জলদিই তার সাথে যোগাযোগ করবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত।

মালিকের অবস্থান না জানা থাকার কারণে ভালোই হয়েছে, যদি জানতো তাহলে নির্ঘাত পুলিশ আর ঐ হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টকে বলে দিতো। ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের সাথে দীর্ঘদিন ধরে থাকলেও সে নরম স্বভাবের মানুষ। এটা রঞ্জু নিজেও জানে। একজন বিশ্বস্ত মানুষ হিসেবে তার সুনাম আছে।

বাড়িতে ফিরতেই তার তিন মেয়ে আর বউ একসাথে তাকে জড়িয়ে ধরলো। এক আবেগঘন দৃশ্য। তার চোখে পানি এসে গেলো মুহূর্তে। বুঝতে পারলো তার মেয়েরা তাকে অনেক ভালোবাসে। তার চিন্তায় মেয়ে তিনটি অস্থির হয়েছিলো।

গোসল করে ভাত খেয়ে ঘুম দিলো ম্যানেজার। হোটেল পিং সিটিতে যেতে চেয়েছিলো কিন্তু বড় মেয়ে আর বউ রীতিমতো ধমক দিয়ে বলেছে, আজ আর যেতে হবে না। এখন তার দরকার বিশ্রাম নেবার। সে আর কথা বাড়ায় নি। বউ আর মেয়েদের শাসন বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছে।

সন্ধ্যার একটু আগে তার বড় মেয়ে তাকে ডেকে তুললে ঘুম ভাঙলো। এক লোক এসেছে তার সাথে দেখা করার জন্য। মঞ্জু ভায়ের লোক!

সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে উঠে বসলো ম্যানেজার। সে জানতো লোক মারফতই তার সাথে যোগাযোগ করা হবে। অপারেশন ক্লিনহার্টের সময়ও এরকম হয়েছিলো, সেই সময়টা ছিলো এখনকার মতোই সংকটপূর্ণ। না। ঠিক এখনকার মতো নয়। তখন স্বয়ং রঞ্জুই বিপদে ছিলো। এখন তো রঞ্জু ধরাছোঁয়ার বাইরে। বিপদ একটা হয়েছে, কিন্তু সবটাই গেছে রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ লোকদের উপর দিয়ে।

ড্রইংরুমে ঢুকতেই দেখতে পেলো মাঝবয়সী এক লোক বসে আছে সোফায়। চিনতে পারলো ম্যানেজার। মঞ্জু ভায়ের সবচাইতে ঘনিষ্ঠ লোক আবুল কালাম।

"ভাই, কেমন আছেন?" আবুল কালাম নামের লোকটা বললো।

"ভালো," সোফায় লোকটার পাশে বসে পড়লো সে। "ভায়ের কি খবর?"

"উনি নিরাপদেই আছেন। তবে একটু চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ম্যানেজার।

"ভাই আপনার সাথে কথা বলবে। এক্ষুণি আসতে হবে আমার সাথে।"

"এক্ষুণি?"

আবুল কালাম মাথা নেড়ে সায় দিলো। "ভাই খুব কাছেই আছেন।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি একটু বসেন, আমি জামাকাপড় পাল্টে আসছি"।

"তার দরকার নেই, লোকটা তাকে বিরত করলো। "যেভাবে আছেন সেভাবেই চলে আসুন। বেশিক্ষণ লাগবে না।"

ম্যানেজার আর কিছু বললো না। বউ আর মেয়েদের বলে বের হয়ে গেলো আবুল কালামের সাথে।

বাড়ির সামনে একটা রিক্সা দাঁড় করানো আছে, তাতেই উঠে বসলো তারা। এই রিক্সা দিয়েই আবুল কালাম তার বাড়িতে এসেছে, বুঝতে পারলো ম্যানেজার। আরো বুঝতে পারলো মঞ্জু ভাই খুব কাছেই কোথাও আছে।

তবে ম্যানেজার যেটা বুঝতে পারলো না, তার বাড়ির খুব কাছেই, একটা মুদি দোকানের সামনে এক লোক গভীর আগ্রহের সাথে তাদেরকে দেখে যাচ্ছে। রিক্সাটা একটু সামনে

এগোতেই লোকটা দ্রুত রাস্তায় নেমে পড়লো। একটা খালি রিক্সা পেয়ে গেলে সেটাতে উঠে বসলো সে।

বাস্টার্ড দুপুরের পরেই ফোন করেছিলো পিং সিটি হোটেলে। সাগরিকা নামের মেয়েটি আনন্দের সাথেই তাকে জানায় হোটেল ম্যানেজার জামিন পেয়েছেন, তবে আজ তিনি বাসায় বিশ্রাম নিচ্ছেন, হোটেলে আসবেন না।

শিকারীর ধৈর্য নিয়ে বিকেল থেকে লোকটার বাড়ির সামনে ওৎ পেতে ছিলো সে। জানতো কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাবে। তাই হতে যাচ্ছে এখন।

ম্যানেজারকে নিয়ে রিক্সাটা চলে গেলো ৪ নাম্বার সেক্টরের একেবারে শেষ মাথায় নিরিবিলি একটি জায়গায়। চারপাশে যতোগুলো বিল্ডিং আছে তার প্রায় সবগুলোই আন্ডার কন্সট্রাকশনে। ম্যানেজারের রিক্সাটা যে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে থামলো সেটাই এই এলাকার একমাত্র ফিনিশড অ্যাপার্টমেন্ট।

কিছুটা দূর থেকেই বাস্টার্ড তার রিক্সা ছেড়ে দিলো। আবারো অপেক্ষা করতে হবে তাকে। অপেক্ষা করতে তার খারাপ লাগে না যদি সে নিশ্চিত থাকে। অনিশ্চিত কোনো কিছুর জন্যে সে অপেক্ষা করতে পারে না।

মাত্র বিশ মিনিট পরই পিং সিটি হোটেলের ম্যানেজার সেই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে এলো, সঙ্গে সেই লোকটা, যে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। গেটের একটু বাইরে এসে ম্যানেজারের সাথে কিছু কথা বলেই লোকটা চলে গেলো কাছের একটা মুদি দোকানে।

বাস্টার্ড দেখলো ম্যানেজার রিক্সার জন্যে অপেক্ষা না করে হাঁটতে শুরু করেছে।

মুদি দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে লোকটা যে-ই না অ্যাপার্টমেন্টের দিকে পা বাড়াবে তার পথরোধ করে দাঁড়ালো সে।

লোকটা একটু চমকে গেলো।

"ভাই, আপনি কি এখানেই থাকেন?" বিনীতভাবে জানতে চাইলো সে।

লোকটা ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো।

"১৭/২ বাড়িটা কোথায় বলতে পারবেন?"

যেনো হাফ ছেড়ে বাঁচলো লোকটা। "১৭/২?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাস্টার্ড। বাড়ির নাম্বারটা সে আগে থেকেই দেখে রেখেছে। পাশের বিল্ডিংয়ের এক নিমার্ণ শ্রমিকের কাছ থেকে এটাও জেনে নিয়েছে এই বিল্ডিংটাতে কোনো লোকজন থাকে না। এখানে শুধু নাটক আর সিনেমার শুটিং হয়। গতকাল রাতেও শুটিং হয়েছে। এখনও সেখানে ইউনিটের লোকজন আছে। সারাদিনই নাকি এখানে শুটিং হয়।

"কার কাছে যাবেন?"

"শুটিং হচ্ছে যেখানে..." বললো সে।

"কোন্ ফ্লোরে?"

এই অল্প সময়ে যেটুকু তথ্য জোগাড় করেছে তাতে সে এটা জানে না কোন্ ফ্লোরে শুটিং হচ্ছে।

"পাঁচ নাম্বার ফ্লোর বললো নাকি পাঁচ তলা বললো সেটা তো বলতে পারবো না," গাল চুলকে বললো সে। এমন একটা চালাকি করেছে ধরা খাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এই লোকটা রঞ্জুর ভায়ের সাথে কোন ফ্লোরে থাকে সেটা সে জানে না। আন্দাজে একটা ফ্লোরের কথা বললে যদি কাকতালীয়ভাবে মিলে যায় তাহলে ধরা খেয়ে যাবে তাই ফ্লোর আর তলার মধ্যে যে কনফিউশন আছে সেটা কাজে লাগালো।

"পাঁচ তলায় তো আমরা থাকি, মনে হয় ছয় তলার কথা বলেছে...ওখানে কাল থেকে শুটিং হচ্ছে।"

"তাহলে তাই হবে...আসলে ফ্লোর আর তলা গুলিয়ে ফেলেছি মনে হয়, বলেই বোকার মতো হাসি দিলো সে।

লোকটা অ্যাপার্টমেন্টের দিকে পা বাড়ালে সেও তার সাথে সাথে এগোলো। "আপনিও তাহলে এই বিল্ডিংয়ে থাকেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো লোকটা।

তারা দুজন একসাথেই অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করলো ফলে গেটের দারোয়ান তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

লিফটে আর কেউ নেই শুধু তারা দু'জন। লিফটটা চলতে শুরু করলে বাস্টার্ড ঠিক করে ফেললো কি করবে। এই লোক নেমে যাবে পাঁচ তলায়। লোকটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো। তার দিকে লক্ষ্যই করছে না। গুনগুন করে একটা সুর আওড়াচ্ছে।

"মঞ্জু ভাই খুব টেনশনে আছে, না?"

লোকটা মনে হলো বৈদ্যুতিক শক খেলো। চমকে তার দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো তার বুক বরাবর একটা বড় নলওয়ালা পিস্তল তাক করে রেখেছে আগন্তুক।

"আ-আপনি...কে?" কোনোমতে বলতে পারলো সে।

বাম হাতের তর্জনী মুখের কাছে এনে চুপ থাকতে বললো বাস্টার্ড। "একটু এদিক ওদিক করবি তো মরবি!"।

লোকটা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তার দিকে।

চকিতে দেখে নিলো লিফটটা এখন চার তলায় আছে। বাম হাত দিয়ে লোকটার কাঁধ জড়িয়ে ধরলো, যেনো বহুদিনের পুরনো দোস্ত-বন্ধু। লোকটার পেটে অস্ত্রটা ঠেকিয়ে রাখলো সে। "চল।" লিফটটা থেমে গেলো পাঁচ তলায়। দরজা খুলতেই তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো বাস্টার্ড।

পাঁচ তলার ডান দিকের একটা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো তারা। লোকটা পকেট থেকে চাবি বের করে কিহোলে ঢোকালো। লোকটার কাছে চাবি আছে দেখে খুশি হলো বাস্টার্ড। তাকে আর বাড়তি কাজ করতে হবে না, সোজা ঢুকে যাবে অ্যাপার্টমেন্টে।

তাই হলো। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো তারা।

মনোয়ার হোসেন মঞ্জু খুব আপসেট হয়ে আছে। আজ দু'তিন দিন ধরে আত্মগোপন করে আছে সে। নিরাপদ জায়গাতেই আছে কিন্তু যা ঘটছে তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। একটু আগে পিং সিটির ম্যানেজারের সাথে কথা বলেছে, আগামীকালই যে সে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে সেটা জানিয়ে দিয়েছে তাকে, তার অবর্তমানে কি করতে হবে না হবে সবই বলে দিয়েছে লোকটাকে। খুবই সতর্ক থাকতে হবে। ভয়াবহ এক বিপদে নাজেহাল হয়েছে। চোখকান খোলা রাখতে হবে। তার উপর এখন অনেক দায়িত্ব। এই সংকটের সময় একটু শক্তও হতে হবে তাকে। ঘাবড়ে গেলে চলবে না। আগামীকাল সকালে এসে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কাগজপত্রে অগ্রীম সই করে নিয়ে যাবে, কারণ কিছুদিন তাকে দেশের বাইরে থাকতে হবে।

ম্যানেজার লোকটা তাদের খুব পুরনো আর বিশ্বস্ত, তবে সমস্যা একটাই, লোকটা ভীতুর ডিম। তাকে একটু আশ্বস্ত করার দরকার ছিলো। এটা বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিলো যে, এই সমস্যাটা খুব সহজেই কেটে যাবে।

সামনের কফি টেবিল থেকে মদের গ্লাসটা আবার তুলে নিলো। এ নিয়ে কয় পেগ হলো? সেই বিকেল থেকেই তো গিলে যাচ্ছে। রঞ্জুর সাথে ফোন কথা বলার পর থেকে পান করেই যাচ্ছে। তার ছোটো ভাইকে একটু আগেই জানানো হয়েছে সব ঘটনা। রঞ্জু তো বিশ্বাসই করতে পারে নি। তার দলের তিন তিনজন ঘনিষ্ঠ লোককে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে খুন করা হয়েছে! কে করেছে?

মঞ্জুরও তো একই প্রশ্ন - কে করেছে?

অবশ্য কিছুক্ষণ পর তার ছোটো ভাই নিজেই এর ব্যাখ্যা দিয়েছে। মঞ্জুকে সে জিজ্ঞেস করে লেডি গিয়াসের কাছে বিপুল পরিমাণের টাকা ছিলো, সেগুলো কোথায়। মঞ্জু অবশ্য টাকার ব্যাপারে কিছু জানতো না। খুন হবার পর তার হোটেলের ম্যানেজার চেষ্টা করেছিলো

পুলিশ যেনো খবরটা না জানে কিন্তু এক হারামজাদা রিটায়ার্ড কর্নেলের কারণে সেটা আর সম্ভব হয় নি। তারপরও পুলিশ আসার আগে লেডি গিয়াসের ঘর থেকে কিছু কাগজপত্র আর তার পাসপোর্টটা সরিয়ে ফেলে ম্যানেজার। কিন্তু কোনো টাকাপয়সা পাওয়া যায় নি ঘর থেকে। সম্ভবত খুনিই টাকাগুলো নিয়ে সটকে পড়েছে।

সব শুনে রঞ্জু জানায়, সে নিশ্চিত, তার দলের মধ্যে কেউ এ কাজ করেছে। কারণ গিয়াসের কাছে বিপুল পরিমাণ টাকা থাকার কথাটা জানতো যে দু'জন, তারাও খুন হয়েছে। হয়তো সুলতানই বেঈমানি করেছে। অন্য কাউকে নিয়ে লেডি গিয়াসকে খুন করে টাকাগুলো হাতিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু সে নিজেও বেঈমানির শিকার হয়। প্রচুর টাকা, সুতরাং এরকমটি হতেই পারে।

কিন্তু মঞ্জু যখন জানালো সুলতানই সবার আগে খুন হয়েছে, তারপর গিয়াস, সবশেষে মিনা তখন ফোনের অপরপ্রান্তে নীরবতা নেমে আসে কিছুক্ষণের জন্য।

"তুমি কালই ঢাকা ছেড়ে আমার এখানে চলে আসো।" অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর বলে রঞ্জু।

"কাল? ভিসা নিতেই তো দু'দিন লাগবে?"

"ভিসার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই...তুমি কালই চলে আসো।"

"ভিসা ছাড়া?" অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলো মঞ্জু।

"হ্যাঁ। লিটন নামের একজন তোমাকে নিয়ে বর্ডার ক্রশ করবে। আমি তাকে এখনই বলে দিচ্ছি। সব গোছগাছ করে রেডি হয়ে যাও। আমি চাই না তুমি এখন ঢাকায় থাকো।"

"কোন লিটন?"

"তুমি চিনবে না, আমাদের দলে নতুন যোগ দিয়েছে। তার কাছে তোমার ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, কাল খুব সকালে তোমার সাথে যোগাযোগ করবে সে। লিটনের জন্য সুগন্ধা আর তোমর জন্য রঙধনু। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।" একটু চুপ থেকে আবার বললো মঞ্জু। "ঘটনাটা কি ধরতে পেরেছিস?"

বড় ভাইয়ের এ কথার কোনো জবাব রঞ্জুর কাছেও নেই। "না। কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি চলে আসো...তারপর দেখা যাবে।"

রঞ্জুর সাথে ফোনে কথা বলার পর থেকেই এক অজানা ভয় জেঁকে বসেছে তার মধ্যে। তাহলে কি সেও খুনির টার্গেট? এজন্যেই কি রঞ্জু তড়িঘড়ি করে তাকে কোলকাতায় চলে আসতে বলছে?

আরো এক ঢোক মদ পান করলো সে। এই অ্যাপার্টমেন্টটা খুব নিরাপদ। ঘুণাক্ষরেও পুলিশ এটাকে সন্দেহের চোখে দেখবে না। এটা বানানোই হয়েছে নাটক আর সিনেমার শুটিংয়ের জন্য ভাড়া দেবার উদ্দেশ্যে। চলচ্চিত্র ব্যবসার সাথে জড়িত হবার পরই এই চিন্তাটা তার মাথায় আসে। না, তার মাথায় নয়, তার ছোটো ভায়ের মাথায়। যা কিছুই সে করে ছোটো ভায়ের নির্দেশেই করে।

তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী আবুল কালাম ছাড়া এই ফ্ল্যাটে আর কেউ থাকে না। এ কয় দিনেই হাফিয়ে উঠেছে সে। তো কোলকাতায় চলে যেতে পারলে তার ভালো লাগারই কথা কিন্তু খুশি হতে পারছে না। তার কাছে মনে হচ্ছে রাত কাটতে না কাটতেই একটা বিপদ এসে হাজির হবে। ভয়ঙ্কর এক খুনি পিছু নিয়েছে তাদের। সে হয়তো আজরাইলের মতো হাজির হবে এই গোপন আস্তানায়। এই নিরাপদ জায়গাটার কথা এখন আরো একজন জেনে গেছে- তার হোটেলের ম্যানেজার। যদিও লোকটা তার খুব বিশ্বস্ত কিন্তু তার সাথে এখানে দেখা করাটা ঠিক হয় নি। মনে মনে আফসোস করতে লাগলো

সে। রঞ্জুর দলে যদি কেউ বেঈমানি করে থাকে তাহলে সে নিশ্চয় একা নয়। কে কে জড়িত আছে এই বিশ্বাসঘাতকতায় সেটা তাদের অজানা। লেডি গিয়াসের সাথে নাকি অনেক টাকা ছিলো। এটা সে নিজেও জানতো না। ম্যানেজার কি জানতো? না। মনে হয় না।

মাথাটা দু'পাশে দুলিয়ে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো।

কাউকে যেমন সন্দেহ করতে পারছে না তেমনি ঠিক বিশ্বাস করতেও ভয় হচ্ছে। ভালোয় ভালো আজ রাতটা পার করতে পারলেই বেঁচে যায়। রঞ্জুর বড় ভাই হিসেবে সে নিজেও বড় একটা টার্গেটে পরিণত হয়েছে হয়তো। রঞ্জু সেটা আন্দাজ করতে পেরেই ঢাকা ছাড়তে বলেছে।

ঠিক তখনই দরজা খোলার শব্দ পেলো সে। "কে?...কালাম?"

"জি, ভাই।" কালাম জবাব দিলো দরজার কাছ থেকে।

একটু পরই দেখতে পেলো তার ঘরের দরজার সামনে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ঢুলু ঢুলু চোখে তাকালো তাদের দিকে। কালামের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অচেনা এক লোক, তার অন্য হাতে একটা পিস্তল। কালামের অভিব্যক্তি বলছে লোকটা মোটেও তার ইয়ার-দোস্ত নয়।

একটা ঢেকুর উঠে এলো বুকের ভেতর থেকে।

আজরাইল!

পাশের ঘর থেকে যে শব্দটা আসছে সেটা রীতিমতো অসহ্য ঠেকছে তার কাছে। তার সামনে বসে আছে অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে। সিগারেট টেনে যাচ্ছে মেয়েটি কিন্তু কিছু বলছে না। কয়েক মিনিট আগে একটা ফোন কল আসার পর থেকেই মেজাজ বিগড়ে আছে লোকটার, সেই থেকে মেয়েটিও চুপ মেরে আছে। তাদের সামনে মদের বোতল, গ্লাস, চানাচুরের প্লেট আর সিগারেটের প্যাকেট।

"শূয়োরের বাচ্চার এতোক্ষণেও হয় না?" অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর পাশের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বললো মেজাজ খারাপ হয়ে থাকা লোকটা।

অ্যাস্ট্রেতে সিগারেট রেখে মেয়েটা তার কাঁধে হাত রাখলো। "আহ্, তোমার কী হয়েছে গো?"

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো সে। পাশ ফিরে তাকালো মেয়েটার দিকে। এখনও ব্লাউজ পরে নি। কোনো রকমে শাড়িটা পেঁচিয়ে রেখেছে গায়ে। একটু আগে তারা অন্য রকম এক আবেশে ছিলো। দুজন দুজনকে আদর করতে করতে অস্থির করে ফেলছিলো, ঠিক তখনই ফোন কলটা আসে। ঢাকা থেকে তার ভাই যা জানালো তা তো বিশ্বাস করার মতো নয়। কিন্তু ঘটনা সবই সত্যি। বুঝতে পারছে তাদের ঘনিষ্ঠ কেউই এ কাজ করছে। কয়েক বছর আগে যখন তারা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়, এখানে চলে আসে, সেই অপারেশন ক্লিনহার্টের সময়টাতেও নিজেদেরকে এতোটা বিপদগ্রস্ত বলে মনে করে নি।

তার সবচাইতে ঘনিষ্ঠ তিনজন লোককে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে হত্যা করা হয়েছে। বেহাত হয়ে গেছে দু'কোটি টাকা। সবটাই অপূরণীয় ক্ষতি সন্দেহ নেই কিন্তু এসব কিছু না, সে চিন্তায় পড়ে গেছে অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে, কারা এ কাজ করলো সে সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্রও ধারণা নেই।

পাশের ঘর থেকে আবারো একটা আওয়াজ তার মেজাজ খারাপ করে দিলো। একজোড়া নারী-পুরুষের শিৎকার আর গোঙানি।

"শূয়োরের বাচ্চা কি সাউন্ড ছাড়া করতে পারে না!" মেয়েটাকে বললো সে।

মুখ টিপে হাসলো মেয়েটি। "মুখের কি ছিরি গো তোমার, মাইরি!"

"ব্লাউজ পরে নাও..." কথাটা বললো মেয়েটার উন্মুক্ত স্তনের দিকে তাকিয়ে।

"কেন,..ভাল্লাগছে না বুঝি?"

মুখ সরিয়ে নিলো সে।

"একটু আগে তো ওগুলো নিয়ে এমনভাবে আদর করছিলে মনে হচ্ছিলো আজ বুঝি অন্য কিছুতে আর যাবে না।" বলেই মেয়েটা ব্লাউজ খুঁজতে লাগলো।

যার উদ্দেশ্যে কথাটা বলা হলো সে এখন অন্য চিন্তায় ডুবে আছে।

আর কিছু দিন পরই ঢাকায় যাবার কথা, সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে আসার প্রস্তুতি চলছে যখন তখনই কিনা এরকম একটা আঘাত করা হলো তাদের দলের বিরুদ্ধে! সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। তাদের সাথে এমন কাজ করার দুঃসাহস দেখাতে পারে কারা?

তাদের শত্রুর কথা বললে সেটা গুনে শেষ করা যাবে না। যদিও অসংখ্য প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করেছে বিগত বছরগুলোতে, তারপরও সে জানে তাদের অগোচরে তৈরি হচ্ছে প্রতিপক্ষ। তাদের সবচাইতে বড় ভয় ছিলো নিজের দলের ভেতরে কোনো বেঈমান পয়দা হচ্ছে কিনা। এখন মনে হচ্ছে সেই আশংকাই সত্যি হতে যাচ্ছে। তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না। এটা তাদের কোনো প্রতিপক্ষেরও কাজ হতে পারে। কোটি কোটি টাকার ব্যাপার যেখানে সেখানে প্রতিপক্ষ আর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবেই। এর আগে তাদের বিরুদ্ধে কেউ এমন আঘাত করে নি বরং মাথা তুলে দাঁড়ানোর আগেই শেষ করে দেয়া হয়েছে অনেককে।

তিলে তিলে তারা গড়ে তুলেছে এই দলটি। একেবারে নিখুঁত সিস্টেমে চলে সেটা। আর এ কারণেই শত শত সন্ত্রাসীর এই দলটি এতো দিন ধরে টিকে আছে। নিরাপত্তার কথা যদি বলা হয় সেটাও প্রায় নিচ্ছিদ্র। কারো পক্ষে তাদের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়, তাই হয়তো প্রতিপক্ষ তাদের লোকজনের উপর আঘাত হেনেছে। কিন্তু যে-ই কাজটা করে থাকুক না

কেন, কতো ভয়ঙ্কর পাল্টা আঘাত হানা হবে সে সম্পর্কে কারোর কোনো ধারণাই নেই। প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ে ছাড়খার করে দেয়া হবে। এমন হাল করা হবে যে, এরপর থেকে তাদের দলের বিরুদ্ধে কিছু করার আগে দশ বার ভাবতে হবে।

তাদের দরকার প্রচুর তথ্য। এভাবে অন্ধকারে থেকে কিছু করা যাবে না। আর তথ্য পেতে হলে তাকে এক্ষুণি কাজে নেমে পড়তে হবে। সবচাইতে ভালো তথ্য দিতে পারবে পুলিশ। তাদের কেনা গোলাম হয়ে থাকা পুলিশের সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে দ্রুত। মউজ ফুর্তি করার সময় এখন নয়।

মেয়েটার দিকে তাকালো। ব্লাউজ খুঁজে পেয়েছে, এখন শাড়িটা পরে নিচ্ছে সে। অ্যাস্ট্রে থেকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট তুলে নিয়ে লম্বা টান দিলো।

"সুষমা, আজ এখানে থাকার দরকার নেই," মেয়েটাকে বললো সে।

শাড়ির কুচি করছিলো সে, কথাটা শুনে তার দিকে চেয়ে রইলো। "কি হয়েছে গো... আমায় বলা যায় না?"

পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে টেবিলের উপর রাখলো। "তোমার বান্ধবীকে নিয়ে চলে যাও। আজ আমাদের জরুরি কিছু কাজ করতে হবে।"

"ওমা! আমি কিভাবে তাকে ডাকবো?...তোমার বন্ধুকে বলো ওকে ছেড়ে দিতে...ওতো কার্তিকের কুত্তা হয়ে গেছে গো!"

পাশের ঘরে যাবার একমাত্র দরজার দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকালো সে। "শালার মাথায় মাল উঠে গেছে!" আবারো লম্বা একটা টান দিলো সিগারেটে।

"বুঝলাম না বাপু...এতো বলে কয়ে ডেকে এনে এখন আবার তাড়িয়ে দিচ্ছো!" শাড়ির কুচি ঠিক করতে করতে বললো সুষমা।

পাশের ঘর থেকে আবারো শিৎকার ভেসে আসছে। সিগারেটটা রেখে। সেদিকে ছুটে যাবে অমনি সুষমা তার একটা হাত ধরে ফেললো।

"রাখো তো...আমি ডাকচি।"

সোফায় বসে পড়লো সে। সুষমা দরজার কাছে গিয়ে কান পেতে হেসে ফেললো। "ওমা, আবার শুরু করেছে দেকচি!" মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে তার কাছে এসে বললো, "মেয়েটাকে মেরে ফেলবে গো।"

রেগেমেগে তাকালো সুষমার দিকে।

"আহা, অমন করে তাকাবে না আমার দিকে...খুব ভয় করে!" বলেই তার গলা ধরে গালে একটা চুমু খেলো।

"উফ!" মেয়েটাকে ছাড়িয়ে নিলো সে। "তোমার বান্ধবীকে ডাকো।"

"ডাকচি বাবা, ডাকচি। ডাকাতের মতো চোখ রাঙাবে না।" বলেই কপট, অভিমান দেখিয়ে দরজার কাছে আবার ফিরে গেলো সুষমা।

"অ্যাই, তোদের হলো রে?...তাড়াতাড়ি কর, আমাদের যেতে হবে।" এর জবাবে ভেতর থেকে অট্টহাসি শোনা গেলো।

"অ্যাই, শিমকি...তাড়াতাড়ি কর। তোর নাগরকে বল, আজ তোকে ছেড়ে দিতে...সব মজা একদিনেই লুটে নেবে নাকি!"

আবারো হাসির রোল পড়ে গেলো। হতোদ্যম হয়ে সুষমা তার দিকে ফিরে কাঁধ তুললো।

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলো না, সোফা থেকে উঠে সজোরে লাথি মেরে বসলো বন্ধ দরজায়।

"দরজা খোলো, রঞ্জু!"

মনোয়ার হোসেন মঞ্জু বরফের মতো জমে আছে। তার পাশে, সোফায় বসে আছে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী আবুল কালাম, আর দেবদূতের মতো দেখতে আজরাইলটা বসে আছে তাদের বিপরীতে, একটা চেয়ারে। মাঝখানে একটা কফি টেবিল।

মঞ্জুর মুখ দিয়ে কিছু বের হচ্ছে না। তার নার্ভ ভেঙে পড়েছে। নিজের হৃদস্পন্দনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট। ছোটো ভাই রঞ্জুর মতো সে সাহসী নয়। একটু নরম মনের মানুষ। খুনখারাবির সাথে কোনো কালেই তার সম্পর্ক ছিলো না। কথা যা বলার বলছে আবুল কালাম।

"আপনি কে?...কি চান?"

"তুই কে, সেটা আগে বল," পিস্তলটা কালামের দিকে তাক করে বললো বাস্টার্ড।

"আমি মঞ্জু ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ লোক।"

"তার মানে রঞ্জুর লোক।"

আবুল কালাম স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো, কথাটার কোনো প্রতিবাদ করলো না।

"ব্ল্যাক রঞ্জু কোলকাতার কোথায় আছে, বল?"

বাস্টার্ডের এ কথায় সোফায় বসে থাকা দুজনেই চমকে উঠলো একটু।

"বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, রঞ্জু ভাই কোথায় আছে সেটা আমরা কেউই জানি না।" আবুল কালাম বেশ শান্ত কণ্ঠেই বললো।

পিস্তলটা এবার মঞ্জুর দিকে তাক করলো বাস্টার্ড। "কিরে, তুইও কি একই কথা বলবি?"

প্রথমে দু'পাশে মাথা দোলালো, তারপর সেটা বাতিল করে দিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো ব্ল্যাক রঞ্জুর আপন বড় ভাই মঞ্জু।

"তোর বস কি বোবা নাকি..কথা বলে না কেন?"

মঞ্জুর দিকে তাকালো আবুল কালাম। "উনি একটু ভীতুটাইপের মানুষ...খুব ভয় পেয়ে গেছেন।"

"তুই ভয় পাস নি?" বাস্টার্ড পিস্তলটা কালামের দিকে ঘোরালো।

কিছুই বললো না সে। তার চোখের দৃষ্টি দেখে বাস্টার্ড সতর্ক হয়ে গেলো। এর আগে ব্ল্যাক রঞ্জুর লোকজনকে খাটো করে দেখার পরিণাম ভোগ করেছে, এখন আর কাউকে সে খাটো করে দেখে না। কড়া নজর রাখছে আবুল কালামের উপর।

"ভাই, আমি একজন ব্যবসায়ী... রর কাজকর্মের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক—"

হাত তুলে মঞ্জুকে থামিয়ে দিলো সে। "আমি এসব কথা শুনতে চাই নি। রঞ্জু কোলকাতার কোথায় আছে সেটা জানতে চাইছি।"

"এ প্রশ্নের উত্তর তো আমি একটু আগেই দিয়েছি," আবুল কালাম বললো।

"হ্যাঁ, দিয়েছিস, কিন্তু জানি না এ কথাটা আর বলবি না। হয় ঠিকানা দিবি নয়তো মরবি।"

মুচকি হাসলো আবুল কালাম। "ইচ্ছে করলে আমরা আপনাকে ভুল একটা ঠিকানার কথা বলতে পারি, আপনি সেটা ধরতেও পারবেন না। কিন্তু সত্যি বলছি, তার ঠিকানা আমরা জানি না।"

লোকটার দিকে স্থির চোখে চেয়ে রইলো বাস্টার্ড। এখনও মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথা বলে যাচ্ছে। "তুই অনেক বেশি স্মার্ট। আমি কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা পর্যন্ত চুপ করে থাকবি, বানচোত!" ধমকের সুরে বললো সে।

দু'হাত তুলে আত্মসমপর্নের ভঙ্গি করলো আবুল কালাম।

"তুই রঞ্জুর আপন ভাই, তুইও জানিস না রঞ্জু কোথায় থাকে?"

মঞ্জু জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করলো। "ভাই...কেউ বিশ্বাস করবে না... রঞ্জু কাউকে তার ঠিকানা দেয় না।"

মাথা দোলালো বাস্টার্ড। "তুই কখনও কোলকাতায় রঞ্জুর সাথে দেখা করতে যাস নি?"

"গেছি," ঢোক গিলে বললো মঞ্জু। "কিন্তু হোটেলে দেখা করেছে...কোনো বাসা বাড়িতে না।"

"কোন হোটেলে? জায়গাটা কোথায় ছিলো?"

কপাল চুলকে বললো মঞ্জু, "পার্ক স্ট্রীটের একটা হোটেলে...নামটা যেনো কী?" পাশে বসে থাকা আবুল কালামের দিকে তাকালো সে।

বাস্টার্ড কালামের দিকে পিস্তলটা উঁচিয়ে ইশারা করলো কথা বলার জন্য।

"প্যারামাউন্ট হোটেল।"

দু'পাশে আবারো মাথা নাড়লো সে। "মনে হচ্ছে তোরা এতো সহজে বলবি না..."

"আমি একটা কথা বলবো?" আবুল কালাম আস্তে করে বললো।

তার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো বাস্টার্ড।

"আপনারা তো সুলতান, গিয়াস ভাই আর মিনা ভাবিকেও খুন করেছেন, তারা কি আপনাকে রঞ্জু ভায়ের ঠিকানা দিতে পেরেছে...পারে নি। আমরাও পারবো না। চাইলে আপনি আমাদেরও খুন করতে পারেন...কিন্তু আসলেই আমরা জানি না। হোটেলের ম্যানেজার যদি আপনাদেরকে বলে থাকে আমরা রঞ্জু ভায়ের ঠিকানা জানি তাহলে সে মিথ্যে বলেছে।"

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো এই আবুল কালাম লোকটা মনে করছে পিং সিটি হোটেলের ম্যানেজার বেঈমানি করেছে তাদের সাথে। এরকম মনে করতেই পারে। একটু আগেই ম্যানেজার এখান থেকে বেরিয়ে গেছে। তারা হয়তো ভাবছে ম্যানেজার সঙ্গে করে তাকে নিয়ে এসেছে। বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েছে।

"তোদের ম্যানেজার লোকটা কোনো কাজের না। নিজের মালিকের সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমাদেরকেই খেটেখুটে সেটা জেনে নিতে হচ্ছে।" ঢিলটা ছুঁড়ে দিলো সে। দেখা যাক কী প্রতিক্রিয়া হয়।

কথাটা শুনে মনোয়ার হোসেন মঞ্জু নড়েচড়ে বসলো। একবার বাস্টার্ডের দিকে তাকায় তো আরেকবার আবুল কালামের দিকে। অস্থির হয়ে উঠলো সে। "যা ভেবেছিলাম, কালাম..." বিড়বিড় করে পাশের জনকে বললো মঞ্জু।

বাস্টার্ড তার হাতঘড়ির দিকে তাকালো। "আমি তোদেরকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম... ভেবে দেখ, আমার কাছে রঞ্জুর ঠিকানা বলবি কিনা।"

"পাঁচ মিনিট কেন, পাঁচ ঘণ্টা সময় দিলেও আমরা তার ঠিকানা বলতে পারবো না," বেশ শান্ত কণ্ঠে বললো আবুল কালাম।

বাস্টার্ড লোকটার দিকে কটমট চোখে তাকালো। "পাঁচ মিনিট। তারপর—"

"তারপর কি?" তার কথা শেষ করতে দিলো না কালাম। "খুন করবেন?...করুন!"

বাস্টার্ড খুব অবাক হলো। লেডি গিয়াসের মতো আচরণ করছে এই লোকটা। সতর্ক হয়ে উঠলো সে। দ্বিতীয়বার ভুল করা যাবে না। একটু এদিক ওদিক হলেই গুলি চালাবে।

মঞ্জু তার সহযোগীর কথা শুনে রীতিমতো কাঁপতে লাগলো। "কালাম! তুমি এসব কী বলছো?... প্লিজ! ... কা-কা..."

বাস্টার্ড অবাক হয়ে দেখতে পেলো রঞ্জুর ভাই মঞ্জু খিচুনি দিচ্ছে। দাঁতে দাঁত পিষে খিচতে খিচতে সোফায় এলিয়ে পড়ছে লোকটা। তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো কালাম। "মঞ্জু ভাই মৃগীরোগী...খুব বেশি টেনশন সহ্য করতে পারেন না!"

মৃগীরোগী!

বাস্টার্ড উঠে দাঁড়ালো। "তাকে শুইয়ে দে!" আদেশের সুরে বললো কালামকে।

কিন্তু মঞ্জু প্রচণ্ড জোরে কাঁপুনি দিয়ে শরীরটা বাঁকিয়ে সোফা থেকে নীচে পড়ে গেলো। কালাম তাকে ধরে রাখতে পারলো না। সেও সোফা থেকে ঝুঁকে উপুড় হয়ে গেলো।

কফি টেবিল আর সোফার মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় পড়ে গেছে মঞ্জু। তার গোঙানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে এখন। বাস্টার্ড আরেকটু ঝুঁকে যে-ই না দেখতে যাবে অমনি টেবিলটা শূন্যে ভেসে উঠলো যেনো।

এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময় মাত্র।

তবে তার রিফ্লেক্স ভালো হওয়াতে পিস্তল ধরা হাতটার কনুই দিয়ে টেবিলটা ব্লক করতে পারলো। সঙ্গে সঙ্গে টের পেলো তার কোমর জড়িয়ে ধরে আবুল কালাম ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভারসাম্য রাখতে পারলো না আর। হুরমুর করে চিৎ হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো সে। টেবিলটা ছিটকে পড়ে গেলো তার ডান পাশে। টেবিলে থাকা মদের বোতল আর গ্লাস ভাঙার শব্দ পেলো। মুহূর্তেই সারা ঘর ভরে গেলো অ্যালকোহলের কটু গন্ধে।

বাস্টার্ডের উপর চড়ে বসলো আবুল কালাম নামের লোকটা, তার লক্ষ্য পিস্তল ধরা হাতটা। সেই হাত লক্ষ্য করে ছোঁ মারতেই বিদ্যুৎ গতিতে হাতটা সরিয়ে ফেলতে পারলো সে। স্বতঃফুর্ত প্রতিক্রিয়ায় গুলি করে বসলো তখনই।

আবুল কালামের পেটে লাগলো গুলিটা। গুলির আঘাতে তার উপর থেকে একটু ছিটকে পাশে হুমরি খেয়ে পড়ে গেলো সে।

এক ঝটকায় সরে গিয়ে উঠে দাঁড়ালো বাস্টার্ড। পেট ধরে মেঝেতে কুকড়ে পড়ে রইলো কালাম। এখনও বেঁচে আছে।

দু'পা পিছিয়ে গেলো বাস্টার্ড। সোফার নীচে মঞ্জু পড়ে আছে, তবে এখন আর অতোটা খিচুনি দিচ্ছে না। মুখ দিয়ে লালা বের হচ্ছে। চোখ দুটো যেনো উল্টে আছে।

কালামের দিকে ফিরলো। পর পর কয়েকবার কাঁপুনি দিয়ে নিস্তেজ হয়ে গেলো ব্ল্যাক রঞ্জুর আরেক সহযোগী।

মঞ্জু যখন খিচুনি দিয়ে সোফার নীচে পড়ে যায় তখন তাকে ধরে কালামও মেঝেতে পড়ে যেতে উদ্যত হয়। চকিতে হয়তো সে দেখে নিয়েছিলো বাস্টার্ড কফি টেবিলের ওপাশ থেকে ঝুঁকে আছে তাদের দিকে। সেই সুযোগে টেবিলটা একটু উপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়েই কাঁধ দিয়ে বাস্টার্ডের তলপেটে আঘাত করে তার কোমর ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বুদ্ধিটা ভালোই ছিলো, কিন্তু তার কপাল খারাপ, বাস্টার্ড আগে থেকেই তাকে চোখে চোখে রেখেছিলো। ইতিমধ্যে তার একটা শিক্ষা হয়ে গেছে : ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের কাউকে খাটো করে দেখা যাবে না।

বড়সড় অপারেশন করার পর রোগীর জ্ঞান ফিরে আসলে যেমন হয় মনোয়ার হোসেন মঞ্জুর অবস্থা ঠিক সেরকম।

সোফায় শুয়ে আছে। মেঝেতে পড়ে আছে আবুল কালামের নিথর দেহ। কফি টেবিলটা এখনও উল্টে পড়ে আছে মৃতদেহের পাশেই। মদের বোতল আর গ্লাস ভেঙে একাকার। অ্যালকোহলের ঝাঁঝালো গন্ধটা অসহ্য ঠেকছে।

বাস্টার্ড তার চেয়ারে বসে আছে চুপচাপ। অপেক্ষা করছে মৃগীরোগী কখন স্বাভাবিক হয়। আবুল কালাম যখন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন তার মনে হয়েছিলো মঞ্জু হয়তো ভান করেছে। তবে এখন সে জানে, লোকটা আসলেই মৃগীরোগী।

আধ ঘণ্টা পর মঞ্জু কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলে বাস্টার্ড হাফ ছেড়ে বাঁচলো।

"এই লোকটা, আবুল কালামের নিথর দেহটার দিকে ইঙ্গিত করে সে বললো, "উল্টাপাল্টা কিছু না করে যদি আমাকে রঞ্জুর ঠিকানাটা দিয়ে দিতে আমি তাকে খুন করতাম না।"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো মঞ্জু।

"এখন তাড়াতাড়ি রঞ্জুর ঠিকানাটা দিয়ে দে, আমি চলে যাই।"

"ভাই, বিশ্বাস করেন, রঞ্জুর ঠিকানা আমার কাছে নাই..." দূর্বল কণ্ঠে বললো রঞ্জুর ভাই। "ওর কাছেও ছিলো না।" পড়ে থাকা লাশটার দিকে ইঙ্গিত করলো।

"তাহলে কার কাছে আছে?" পিস্তলটা তুলে ধরলো সে।

দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করে কাঁপতে লাগলো মৃগীরোগী। "আমাকে মারবেন না...ভাই...মারবেন না...প্লিজ!" করুণ আর্তি জানালো সে।– "আমি তো বলেছি, রঞ্জুর ঠিকানা দিয়ে দিলে আমি কিছু করবো না। এক্ষুণি চলে যাবো।" আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো লোকটাকে।

মঞ্জু অসহায়ের মতো চেয়ে রইলো। তার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠলো আবার। কয়েক

মুহূর্তের জন্য বাস্টার্ডের মনে হলো লোকটা আসলেই তার ছোটো ভায়ের ঠিকানা জানে না। তবে আরেকটু চেষ্টা করে দেখতে চাইলো সে।

"আমি জানি না...জানলে অবশ্যই দিয়ে দিতাম!" মঞ্জুর কণ্ঠটা আরো দুর্বল শোনালো।

"তাহলে কে জানে?"

মনে হলো একটু ভেবে নিচ্ছে, হাত দিয়ে কপালের একপাশটা চুলকাতে লাগলো। "লিটন নামের একজন হয়তো জানে..."

"লিটনটা কে?" বাস্টার্ড স্থির চোখে চেয়ে জানতে চাইলো।

"আমি তাকে চিনি না...রঞ্জু আমাকে বলেছে লিটন নামের একজন আমার সাথে যোগাযোগ করবে, আমাকে কোলকাতায় নিয়ে যাবে কাল...লিটনই বলতে পারবে রঞ্জু কোথায় থাকে।"

কথাটা একটু বিবেচনা করলো সে। "লিটন কোথায় থাকে? তার কোনো ফোন নাম্বার আছে তোর কাছে?"

"আমি তো তাকে চিনি না, তার কোনো ফোন নাম্বারও নেই আমার কাছে। রঞ্জু বলছে সে-ই আমাকে ফোন করবে।"

"কখন করবে?"

"কাল সকালে।"

একটু ভেবে নিলো বাস্টার্ড। তাকে কোনো ফাঁদে ফেলতে চাইছে না তো? অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আটকে রাখার কৌশল? এই ফাঁকে হয়তো তার লোকজন এসে যাবে এখানে।

না। এটা তার গোপন আস্তানা। এমন কি নিজের ম্যানেজারও জানতো না। তাকে কালাম নামের লোকটা নিয়ে এসেছে। অথচ লোকটা থাকে খুব কাছেই। এখানকার খবর নিশ্চয় কেউ জানে না। ব্ল্যাক রঞ্জুর দল এখন সতর্ক হয়ে উঠেছে। খুব সহজে কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে। উঠে এসে পিস্তলটা তাক করলো মঞ্জুর কপাল বরাবর। "একদম কথা বলবি না। একটুও নড়বি না, নইলে তোর অবস্থা হবে ওর মতো।" কালামের মৃতদেহের দিকে ইঙ্গিত করলো বাস্টার্ড।

দু'চোখ বন্ধ করে ফেললো মঞ্জু। তার সমস্ত শরীর আবারো কাঁপতে শুরু করলো। মুখ দিয়ে শুধু একটা শব্দই বের হতে লাগলো।

"আল্লাহ...! আল্লাহ...!"

অনেক আগেই মেয়ে দুটো চলে গেছে। এখন চুপচাপ বসে আছে। দু'জনের ঠোঁটেই সিগারেট। চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

"পুলিশ কি বললো," খালি গা আর লুঙ্গি পরা লোকটা জানতে চাইলো।

"তিনটা খুনই নাকি একজন করেছে। কে করেছে সেটা পুলিশ এখনও জানতে পারে নি, তবে খুনিকে ধরার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। গতকাল নাকি আরেকটু হলে ধরেই ফেলেছিলো।"

"তোমার কি কোনো আইডিয়া আছে?" খালি গায়ের লোকটা বললো।

মাথা দোলালো অন্য লোকটা। "এখনও বুঝতে পারছি না। তবে পুলিশ জানতে পারলেই আমাকে জানাবে।"

সিগারেটটা অ্যাস্ট্রে'তে গুঁজে রাখলো। "তুমি নিশ্চিত, আমাদের দলের ভেতরে কেউ এটা করেছে?"

"এ পর্যন্ত যা জানি তাতে তো মনে হচ্ছে আমাদের মধ্যেই কেউ করেছে।" সিগারেটে টান দিলো সে। "তবে কেন করেছে সেটা বুঝতে পারছি না।"

"টাকার জন্য?"

আবারো মাথা দোলালো সে। "গিয়াসকে খুন করার পর তো টাকাগুলো পেয়েই গেছিলো...মিনাকে তাহলে মারতে গেলো কেন?"

খালি গায়ের লোকটা চিন্তিত মুখে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"পুলিশ বলছে গিয়াসের সাথে নাকি এক মেয়ে ছিলো...গিয়াসকে খুন করে খুনি ঐ. মেয়েটাকে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ে। খুনির সাথে ঐ মেয়েটাকে কয়েক জায়গাও দেখা গেছে।"

"মেয়েটা কে হতে পারে?"

"মনে হচ্ছে মিনার কোনো মেয়ে..."

"আমি নিশ্চিত ঐ মেয়েটা এসবের সাথে জড়িত, খালি গা বললো। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে। "মিনা বেঁচে থাকলে জানা যেতো মেয়েটা কে।"

"হয়তো তাকে ব্যবহার করেই কাজটা করা হয়েছে।"

"তাহলে এখন কি করবে?"

একটু চুপ করে থাকলো সে। "আমি ঢাকায় যাবো। আমার তো কোনো সমস্যা নেই। তুমি এখানেই থাকো। আমি গিয়ে দেখি ঘটনাটা কি। দূর থেকে বসে বসে সব খবর পাবো না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো অন্যজন। "সেটাই ভালো।"

ঢাকা ক্লাবের এক কোণে বসে আছে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদ, তার হোস্ট তানভির আকবর একদৃষ্টে চেয়ে আছে বন্ধুর দিকে। ফারুক আহমেদ ক্লাব কালচারে অভ্যস্ত নয়, ঢাকা ক্লাবে এলেই তার অস্বস্তি লাগে।

তানভির আকবর স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান। চাকরি জীবনের শুরুতে দু'জনেই পুলিশ বিভাগে কাজ করেছে। তারা শুধু একে অন্যের ব্যাচমেটই ছিলো না, বিশ্ববিদ্যালয়েও একসাথে পড়াশোনা করেছে। একসাথেই বিসিএস দিয়ে সরকারী চকরিতে ঢুকেছে।

"তোমার ডিপার্টমেন্টটা তো বেশ ভালোই কাজ করছে," বললো তানভির আকবর। "পত্রিকায় প্রায়ই তোমাদের নাম দেখি।"

"যে হারে খুনখারাবি হয় আমাদের নাম প্রতিদিন দেখাটাই স্বাভাবিক," ফারুক আহমেদ বিনয় দেখিয়ে বললো।

"না, না," মাথা দোলালো তার বন্ধু। "তোমাদের কাজকর্ম বেশ ভালো হচ্ছে। এরকম একটা ডিপার্টমেন্টের দরকার ছিলো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো হোমিসাইড প্রধান।

"তবে লোকবল কম, তাই না?... লজিস্টিক সাপোর্ট কেমন?"

"নতুন তো, সময় লাগবে। লোকবল বাড়ানো হচ্ছে আস্তে আস্তে... আর লজিস্টিক সাপোর্ট এখন পর্যন্ত যা আছে খারাপ না। বলতে পারো মোটামুটি।"

"হুম," মাথা দোলালো তানভির আকবর। "ভালো।"

"তবে একটা বিরাট ঘাটতি আছে আমাদের।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান আকবর সাহেব।

"ইন্টেলিজেন্স উইংটা এখনও গড়ে তুলতে পারি নি...সময় লাগবে মনে হচ্ছে।"

"যেকোনো ইনভেস্টিগেশনে ইন্টেলিজেন্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ," একটু থেমে তানভির আকবর বললো, "তবে তোমাদের ইন্টেলিজেন্স উইং বিল্ডআপ হবার আগ পর্যন্ত অন্যদের হেল্প নেবার সুবিধা তো আছেই, তাই না?"

"তা আছে, কিন্তু কথায় আছে না, পরের ধনে পোদ্দারি...ব্যাপারটা সেরকম হয়ে যায় আর কি।"

হা হা করে হেসে ফেললো আকবর সাহেব। "কেন, তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে নাকি?"

"তাতো রয়েছেই," একটু সামনে ঝুঁকে এলো ফারুক আহমেদ। "সবচাইতে বেশি তোমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকেই পেয়েছি।"

ভুরু কুচকে তাকালো তানভির আকবর। "আমার আগের জনের কথা বলছো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো হোমিসাইড প্রধান। "তবে তোমার কাছ থেকে এখনও সেরকম কিছু পাই নি। ভবিষ্যতে পাবো কিনা জানি না।"

"তুমি তো এখন পর্যন্ত আমার কাছ থেকে কোনো সাহায্য চাও নি...চেয়েই দেখো না।" কণ্ঠটা একটু নীচে নামিয়ে বললো, "জলদি চেয়ো, আর কিছুদিন পর কেয়ারটেকার চলে এলে এ পদে নাও থাকতে পারি।"

ফারুক আহমেদ এই অপেক্ষাই ছিলো। "তাহলে তো দেরি করা ঠিক হবে না।" ঠাট্টারছলে বললো ফারুক আহমেদ, তারপর একটু থেমে আবার বললো, "কয়েক দিন আগে তিনটি খুনের ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে একটা সমস্যায় পড়ে গেছি, মনে হয় এ ব্যাপারে তুমি সাহায্য করতে পারবে।"

"কোন্ খুনের কথা বলছো?"

"ব্ল্যাক রঞ্জুর তিনজন ঘনিষ্ঠ লোকের হত্যাকাণ্ডের কথা বলছি। তুমি নিশ্চয় শুনেছো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান। "তদন্ত তো মাত্র শুরু করলে...কতো দূর এগিয়েছো?"

"তদন্ত ভালোমতোই এগোচ্ছে কিন্তু অন্যদিক থেকে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।"

"কেমন?"

“আমার ডিপার্টমেন্টের চিফ ইনভেস্টিগেটর জেফরিকে তো তুমি চেনো?”

“ও তো সেলিব্রেটি হয়ে গেছে, প্রায়ই পত্রিকায় নাম দেখি, ওকে চিনবো না…কী যে বলো।”

“জেফরি মনে করছে ব্ল্যাক রঞ্জুর তিনজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করাটা সময়ের অপচয়।”

ভুরু কপালে তুললো তানভির আকবর। “কেন?”

“তার ধারণা এই খুনগুলো আসলে গভর্মেন্টের কোনো এজেন্সি করাচ্ছে।”

একটু অবাক হলো স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান। তার এ রকম মনে করার কারণ?”

“খুনিকে সে খুব দ্রুতই ট্র্যাকডাউন করতে পেরেছিলো… কিন্তু বার বার এলেভেন্থ আওয়ারে খুনি টের পেয়ে সটকে পড়েছে। এজন্যেই সে মনে করছে গভর্মেন্টের কোনো এজেন্সি হয়তো আগেভাগে খুনিকে জানিয়ে দিচ্ছে…হয়তো গোপন কোনো অপারেশনের অংশ হিসেবেই খুনগুলো করা হয়েছে।”

“তোমার ঐ ইনভেস্টিগেটরকে আশ্বস্ত করতে পারো, এরকম কিছু হচ্ছে না।” তানভির আকবর জোর দিয়ে বললো।

“তুমি শিউর?”

“হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিউর।”

“আমারও সেরকম ধারণা,” একটু থেমে আবার বললো, “কিন্তু জেফরি চাচ্ছে নিশ্চিত হতে।”

“বললাম তো এরকম কিছু হচ্ছে না, তানভির আকবর বললো। “সে কিভাবে নিশ্চিত হতে চাচ্ছে?”

মনে মনে গুছিয়ে নিলো ফারুক সাহেব। “ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে সাম্প্রতিক সময়ে ব্ল্যাক রঞ্জু সম্পর্কে কোনো ইন্টেল আছে কিনা সেটা জানতে চাচ্ছে। তার ধারণা এরকম অপারেশন যদি আদৌ হয়ে থাকে তাহলে এ সংক্রান্ত প্রচুর ইন্টেল আছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে।”

একটু চুপ মেরে গেলো তানভির আকবর। “সাম্প্রতিক বলতে কতো দিন বোঝাচ্ছো?”

“এই ধরো বিগত এক মাসের মতো…?”

“প্রচুর রিপোর্ট জমা পড়ে…খুঁজে বের করাটা কঠিন কাজ। আমরা তো এখনও পুরোপুরি কম্পিউটারে চলে যাই নি। ঠিক আছে, আমি দেখবো কি করা যায়। কিন্তু…”

“পলিটিক্যাল রিলেটেড রিপোর্টগুলো শেয়ার করা যাবে না… বোঝোই তো, ওগুলো খুব রেস্ট্রিক্টেড।”

তানভির আকবরের এ কথায় ফারুক আহমেদ খুশি হতে পারলো না। “তাহলে তো খুব বেশি সাহায্য পাওয়া যাবে না।”

“কিছু করার নেই। পলিটিক্যাল রিপোর্টগুলো সেনসেটিভ হয়ে থাকে, ইউ নো দ্যাট।”

“কিন্তু আমি তো অফিশিয়ালি কোনো রিকোয়েস্ট করছি না… শুধু জানতে চাইছি এরকম কোনো রিপোর্ট আছে কিনা। পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পাওয়ার জন্যেই জানতে চাইছি।”

তানভির আকবর একটু ভেবে নিলো। “রিপোর্টের কোনো কপি পাবে না, শুধু একনজর দেখতে পাবে… ইস দ্যাট ওকে উইথ ইউ?”

“দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্টেড, ফ্রেন্ড,” কথাটা বলেই ফারুক সাহেব হাত বাড়িয়ে দিলো তার বন্ধুর দিকে।

মনোয়ার হোসেন মঞ্জু সারা রাত ধরে পড়ে আছে বিছানায়। একটুও নড়া চড়া করছে না। শুধু যে ভয়ে এটা করছে তা নয়, হাত-মুখ শক্ত করে বেঁধে রাখার কারণে তার পক্ষে মরার মতো পড়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই। খুনি যখন তার কপালে পিস্তল ঠেকালো তখন ভেবেছিলো সব শেষ। এ দুনিয়া থেকে বিদায় জানানোর সময় হয়ে গেছে। কিন্তু খুনি তাকে গুলি করে নি। শুধু হাত-পা-মুখ বেধে ফেলে রাখে।

আজরাইলটা এখনও তার ঘরে আছে। আবুল কালামের লাশটা সরিয়ে ফেলেছে সে। কোথায় রেখেছে বুঝতে পারছে না। এক ভয়ঙ্কর খুনির সাথে সারা রাত কাটিয়ে দেয়া, তাও আবার হাত-মুখ বাধা অবস্থায় তার সমগ্র জীবনের ভয় জড়ো করলেও বর্তমান ভীতির কাছে সেগুলো কিছুই না।

মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘন্টা অতিক্রান্ত হচ্ছে আর সুতীব্র এক ভীতি তাকে অবশ করে দিচ্ছে। এরচেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। নিজেকে তার কোরবানীর বলি হতে যাওয়া পশুর মতো মনে হচ্ছে। যেকোনো সময় জবাই হয়ে যাবে।

নিজের পরিণতি সম্পর্কে তার মনে কোনো বিভ্রান্তি নেই। একটাই নিয়তি তার জন্যে অপেক্ষা করছে : মৃত্যু।

তবে হতাশার গাঢ় অন্ধকারে ক্ষীণ আলো যে নেই তা নয়। একটাই আশা, আগামীকাল সকালে লিটন নামে যে লোকটা আসবে সে যদি আগেভাগে বুঝতে পারে তো কিছুটা সম্ভাবনা থাকবে। আজরাইলটা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারছে না, ব্ল্যাক রঞ্জুর দলটি কতো সুরক্ষিত সিস্টেমে পরিচালিত হয়। সকালে লিটন এলেই সে বুঝতে পারবে সেটা। সশরীরে দেখা করার আগে তারা সতর্ক থাকে সব সময়। তবে লিটন কতোটা দ্রুত ধরতে পারে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে তার উপরেই সব নির্ভর করছে। মনে মনে শুধু একটা দোয়াই করলো, লিটন যেনো দ্রুত বুঝে ফেলতে পারে।

এখন কটা বাজে বুঝতে পারলো না। তবে রাত শেষ হয়ে যে ভোরের আলো ফুটছে সেটা বুঝতে পারলো। জানালার ভারি পর্দা ভেদ করে মৃদু আলো দেখা যাচ্ছে। লিটন আসবে আটটা বাজে, এখন তাহলে ক'টা বাজে?

সারা রাত না ঘুমানোর কারণে ক্লান্তি থেকে চোখের পাতা বুজে এসেছিলো, কতোটা সময় পেরিয়ে গেছে বুঝতে পারলো না। আজরাইলটার শক্ত দু'হাতে ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে উঠলো সে।

"ওঠ!" আজরাইলটা বললো। তার মুখের বাঁধনটা খুলে দিলো সে। "লিটনের সাথে কি বলতে হবে মনে আছে তো?"

তার হাত-মুখ বাঁধার আগেই বলে দিয়েছিলো সকালে লিটন চলে এলে কি বলতে হবে। মাথা নেড়ে সায় দিলে মঞ্জু। জোর করে সাহস সঞ্চয় করলো সে। এখন একটু সাহসের দরকার আছে।

আটটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে একটা ফোন এলে বাস্টার্ড মোবাইল ফোনটা লাউডস্পিকার মোড়ে দিয়ে রঞ্জুর বড় ভায়ের কানের কাছে ধরলো।

"হ্যালো?" মঞ্জু বললো।

"সুগন্ধা, মঞ্জু ভাই।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ...উপরে চলে আসো, লিটন," মঞ্জু তড়িঘড়ি করে বললো বাস্টার্ডের দিকে চেয়ে।

ওপাশ থেকে নীরবতা নেমে এলো কিছুক্ষণের জন্য।

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো না। ইশারা করলো মঞ্জুকে। ব্যাপার কি?

"পাঁচ তলায় ডান দিকের ফ্ল্যাটটা। কোনো সমস্যা নেই, চলে আসো।"

লিটন নামের লোকটা আর কিছু না বলেই লাইনটা কেটে দিলো। মঞ্জুর দিকে ভালো করে তাকালো বাস্টার্ড। তার চোখের দিকে তাকাচ্ছে

সে। কিছু একটা তার মনে খচখচ করতে শুরু করলো। ধরতে পারছে না, কিন্তু টের

পাচ্ছে অস্বাভাবিক কিছু আছে এর মধ্যে। কয়েক সেকেন্ড পরই কথাটা তার মনে পড়ে গেলো।

সুগন্ধা! নাকি শুভ সকাল বলেছে?

এর মানে কি?

সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলটা তা করলো মঞ্জুর কপালে। "লিটন তোকে সুগন্ধা বললো কেন?"

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো মঞ্জু। "সুগন্ধা?" বিস্মিত হবার ভান করলো সে। "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

কিন্তু বাস্টার্ড স্পষ্ট শুনেছে কথাটা। একেবারেই খাপ ছাড়া একটি কথা। বলা নেই কওয়া নেই সুগন্ধা! "শূয়োরের বাচ্চা, চালাকি করবি না!"

"ভাই, আপনি এসব কী বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!" কাঁদো কাঁদো গলায় বললো মঞ্জু।

ধন্দে পড়ে গেলো বাস্টার্ড। সে কি ঠিকমতো শুনেছে?

"লিটন তোকে বললো না, সুগন্ধা মঞ্জু ভাই?"

ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইলো মঞ্জু। "বলছে মনে হয়, কিন্তু কেন বলেছে। বুঝতে পারছি না!"

আবারো ধন্দে পড়ে গেলো সে। কথাটা আসলেই বেখাপ্পা। কিন্তু রঞ্জুর দলের একজন এমনি এমনি এটা বলবে না। কারণটা কি?

"বানচোত, যদি চালাকি করিস-"

ঠিক এমন সময় কলিংবেলটা বেজে উঠলে বাস্টার্ড চুপ মেরে গেলো। বুঝতে পারলো দ্রুত কাজ করতে হবে। একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছে সে।

মঞ্জুকে পিস্তলের মুখে পাশের ঘরের অ্যাটাচড বাথরুমে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। এই একই বাথরুমে আরো একজন আছে-একটা লাশ।

নিঃশব্দে অথচ দ্রুত ফিরে এলো মেইন দরজার সামনে, তবে পিপহোলে চোখ রাখলো না। দরজার কাছে এসে কান পাতলো। বোঝার চেষ্টা করলো দরজার ওপাশে কয়জন আছে। সে জানে না লিটনের সাথে আরো কেউ আছে কিনা।

কলিংবেলটা আবারো বাজতে শুরু করলো কিন্তু বাস্টার্ড দরজা খুলে দিলো না। চট করে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। দরজার সামনে যে রুমটা আছে সেটাতে ঢুকে একটা জিনিস খুঁজতে লাগলো।

বৈদ্যুতিক তার।

ওয়ার্ডরোবের উপর একটা আয়রন দেখতে পেলো, সেটার কয়েল করা তারটা খুলে ফেললো এক ঝটকায়। তারপর তারটা টেনে ছিঁড়ে ফেললো আয়রন থেকে। দৌড়ে গেলো দরজার কাছে। তারের যে মাথাটা ছিঁড়ে ফেলেছে সেটা দরজার নবে পেচিয়ে দিলো, আর অন্য মাথায় যে প্লগিং সকেটটা আছে সেটা ঢুকিয়ে দিলো পাশের দেয়ালে সুইচবোর্ডের প্লাগে।

কলিংবেলটা তৃতীয়বারের মতো বেজে উঠলো। বাস্টার্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সুইচবোর্ডের সামনে। তার বাম হাত সুইচবোর্ডের প্লাগের সুইচটার কাছে, ডান হাতে সাইলেন্সর পিস্তল। দরজার নবের দিকে স্থির হয়ে আছে তার চোখ।

দরজার ওপাশে যে-ই থাকুক না কেন এতোক্ষণে অধৈর্য হয়ে পড়েছে, সে সম্পর্কে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই। দরজার নবটা একটু নড়তেই সুইচ টিপে দিলো বাস্টার্ড।

একটা চিৎকার শোনা গেলো। প্রায় আর্তনাদের মতো। সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছ থেকে সরে গেলো সে। এখনও দরজার নবে ইলেক্ট্রিক প্রবাহ আছে। তার ধারণা দরজার ওপাশ থেকে গুলি করা হবে এখন। কয়েক সেকেন্ড চলে গেলো কিন্তু কিছুই হলো না। দরজার ওপাশ থেকে কোনো আওয়াজও পাচ্ছে না। কী যেনো একটু ভেবে ছুটে গেলো পাশের ঘরে অ্যাটাচড বাথরুমে। দরজা খুলে মঞ্জুকে বের করে আনলো। লোকটা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে

আছে। কিছু বলতে চেয়েছিলো কিন্তু বাস্টার্ড পিস্তল ঠেকিয়ে চুপ থাকতে বাধ্য করলো তাকে।

দরজার কাছে সুইচবোর্ডে প্লাগের সুইচটা বন্ধ করে মঞ্জুকে পিস্তলের মুখে মেইন দরজাটার দিকে ঠেলে দিয়ে দরজা খুলে দিতে বললো। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলো মঞ্জু। তার পেছনে বাস্টার্ড। দরজার নবে হাত রেখে পেছনে ফিরে তাকালে বাস্টার্ড বাম হাতের তর্জনী ঠোঁটের কাছে এনে চুপ থাকতে বললো তাকে, তারপর ইশারা করলো দরজা খোলার জন্য।

মঞ্জু দরজাটা যে-ই না খুললো সঙ্গে সঙ্গে গুলি।

পর পর তিনটি। কানে তালা লাগার জোগাড় হলো।

তিনটি গুলিই ব্ল্যাক রঞ্জুর বড় ভাই মঞ্জুর বুক আর গলায় বিদ্ধ হলো। পেছনে হুমরি খেয়ে পড়ে গেলো সে। তারপরই পর পর দুটো থুতু ফেলার শব্দ আর ঘোৎ করে একটা আওয়াজ।

মঞ্জু দরজা খোলার ঠিক আগ মুহূর্তে বাস্টার্ড হাটু গেড়ে বসে গিয়েছিলো, তবে হাতের পিস্তলটা রেখেছিলো সামনের দিকে তাক করে। মঞ্জু গুলি খেয়ে পড়ে যেতেই দরজার সামনে অস্ত্র হাতে এক যুবককে দেখা যায়। সে আর দেরি করে নি, দ্রুত পর পর দুটো গুলি করে বসে।

যুবকটি দরজা থেকে ছিটকে মুখ থুবরে পড়ে গেলো। বাস্টার্ড জানে মৃত্যু যন্ত্রণা খুব একটা ভোগ করতে হয় নি তাকে, কারণ প্রথম গুলিটা লেগেছে ঠিক কপালে, আর দ্বিতীয় গুলিটা গলার কাছে। স্থির ছিলো, আগে থেকে প্রস্তুত ছিলো, তাই নিশানা একেবারে অব্যর্থ হয়েছে।

বাস্টার্ড উঠে দাঁড়ালো, মঞ্জুর নিথর দেহটা টপকে দরজা দিয়ে যে-ই না বাইরে উঁকি মেরে দেখতে যাবে অমনি গুলি।

কয়টা গুলি করা হয়েছে বুঝতে পারলো না, শুধু বুঝতে পারলো তার পেটে আর বুকে দুটো লেগেছে।

গুলির অভিঘাতে দু'পা পিছিয়ে দরজার ভেতরে চিৎ হয়ে পড়ে গেলো সে, ঠিক মঞ্জুর মৃতদেহের বাম দিকে। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায় আরেকটু বাম দিকে গড়িয়ে গেলো দ্রুত। সে জানে বাম দিকেই একটা ঘরের দরজা আছে। একটু আগে যেখান থেকে আয়রনটা নিয়ে এসেছিলো।

গড়িয়ে যাবার সময়ই আরো দুটো গুলি। দুটোই মেঝেতে আঘাত হেনে ছিটকে গেলো এদিক ওদিক।

পেটে আর বুকে গুলির আঘাতটা তার দম বন্ধ করে দিলো কিছু সময়ের জন্য। টের পেলো কেউ আসছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি করলো সে। থুতু ফেলার শব্দ। নিশ্চিত হতে পারলো না, এই শব্দ শুনে অস্ত্রধারী লোকটা পিছু হটবে কিনা। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলো বাস্টার্ড।

লিটনের সাথে তাহলে আরো লোক আছে! কতোজন আছে?

সে জানে না। শিকার ধরতে গিয়ে কি সে নিজেই শিকার বনে যাচ্ছে?

দরজার পাশে, দেয়ালের কাছে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বুক আর পেটে প্রচণ্ড ব্যাথা করছে। কিন্তু সে জানে এইসব যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করতে হবে। ভাবতে হবে দ্রুত আর কাজ করতে হবে তারচেয়েও ক্ষিপ্র গতিতে।

অস্ত্রধারী যে-ই হোক না কেন, সে ধারণা করছে তার গুলি লেগেছে। দুটো গুলি খেয়ে ছিটকে পড়ে যেতে দেখেছে তাকে। এটা একটা সুবিধা। তাকে আহত বলে মনে করছে লোকটা।

কিন্তু তার অসুবিধা কোনটা?

ভেবে নিলো একটু। লিটনের সাথে কয়জন লোক এসেছে সেটা সে জানে না। যদি জানতে পারে তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে অনেক সহজ হয়ে যাবে। মাথাটা একটু খাটাও!

"ভাই, আমাকে মারবেন না...আপনার পায়ে পড়ি..." নিখুঁত অভিনয় করে বললো সে।

যেনো গুলিবিদ্ধ, মৃত্যুপথযাত্রি একজন। নিজের অভিনয় প্রতিভায় নিজেই মুগ্ধ হলো। যন্ত্রণাকাতর আওয়াজ তুলতে লাগলো সেইসাথে।

"দরজা খোল, শূয়োরের বাচ্চা!" একটা ক্রুদ্ধকণ্ঠ গর্জে উঠলো।

একজন! কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

যন্ত্রণাকাতর আওয়াজ অব্যাহত রাখলো বাস্টার্ড। বুকে আর পেটে যার দুটো গুলি লেগেছে সে তো এমনভাবেই কোঁকাবে! কাশতে শুরু করলো এবার। নিজের বাঁচিক অভিনয়েও মুগ্ধ সে। চালিয়ে যাও!

ঘরের দিকে ভালো করে তাকালো। দরজার ঠিক বিপরীতে যে দেয়ালটা আছে সেখানে একটা বড় সাইজের ফ্রিজ। দ্রুত ভেবে নিলো। মাথাটা এখনও দারুণ কাজ করছে।

"শূয়োরের বাচ্চা, দরজা খুলবি না!?" অস্ত্রধারীর গর্জনটা আরো তীব্র হলো এবার।

বাস্টার্ড ফ্রিজের কাছে ছুটে গেলো। দেয়াল থেকে এক ফুট দূরত্ব রেখে ওটা রাখা হয়েছে। খুব সহজেই নিজেকে ফ্রিজের আড়ালে নিয়ে যেতে পারলো-ডান হাত আর মাথাটা বাদে। হাতের অস্ত্রটা তাক করে রাখলো দরজার দিকে।

চারপাশ কাঁপিয়ে আবারো গুলি হলো। বাস্টার্ড দেখতে পেলো দরজাটার নব গুঁড়িয়ে গেলো সেই গুলির আঘাতে। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেলো দরজার ভারি পাল্লা। ঠিক এই সময়টার অপেক্ষাই ছিলো সে।

খোলা দরজা দিয়ে একটা অবয়ব দেখা যেতেই পর পর দুটো ফায়ার করলো সে। শব্দ দুটো ভোতা হলেও মানুষের আর্তনাদটা হলো জোড়ালো আর জান্তব!

দরজার সামনে থাকা অবয়বটা হুমরি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেও জায়গা থেকে নড়লো না সে। ফ্রিজের দরজার আড়াল থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। পঁচিশ-ত্রিশ বছরের এক যুবক গুলি খেয়ে কাতরাচ্ছে। শরীরটা কমার মতো বেঁকে খিচুনি দিচ্ছে সে। হাতের পিস্তলটা ছিটকে পড়ে আছে সামনেই। ডান কাঁধে আর বাম পেটে গুলি দুটো লেগেছে।

তারপরও দক্ষ শিকারীর মতো জায়গা থেকে নড়লো না। আরেকটু অপেক্ষা করতে চাইছে। একদম নিশ্চিত হতে চাইছে আর কেউ নেই।

উঠে এলো সে। অস্ত্রধারীর পিস্তলটা তুলে নিলো হাতে। দরজার দিকে। তাকিয়ে দেখলো দরজার বাইরে একজন পড়ে আছে। তার প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেছে নিশ্চিত। তবে বুঝতে পারলো না কোন লিটন।

বাইরে নিশ্চয় লোকজন জড়ো হতে শুরু করেছে। বেশ কয়েকটি গুলির আওয়াজ শুনেছে তারা। বেশি দেরি করা ঠিক হবে না।

তার ঘরের দরজার সামনে পড়ে থাকা লোকটা এখনও মরে নি। ভালো করে দেখে নিলো। ডান কাঁধের গুলিটায় সে কাবু হয় নি, তবে পেটের বাম দিকে যে গুলিটা লেগেছে সেটাই প্রাণঘাতি হয়ে উঠবে। সে জানে, পেটে গুলি লাগলে কঠিন যন্ত্রণা হয়। কমপক্ষে বিশ-পঁচিশ মিনিট বেঁচে থাকবে আর সুকঠিন যন্ত্রণা ভোগ করবে। যন্ত্রণাটা এতোটাই তীব্র যে এরচেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করবে।

লোকটার দিকে তাকালো সে। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে রেখেছে। পিস্তলটা তাক করলো কপাল বরাবর।

"ব্ল্যাক রঞ্জু কোলকাতায় কোথায় থাকে?" শান্ত কণ্ঠে বললো সে।

"গুলি কর, শুয়োর!" ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে বললো আহত লোকটা।

মাথা দোলালো সে। "আমি চাই তুই যন্ত্রণা ভোগ করে মরবি।"

তার মুখে থুতু দেবার চেষ্টা করলো মৃত্যুপথযাত্রি, কিন্তু থুতু ছুঁড়ে মারার শক্তিটুকুও তার নেই। ঠোঁটের কাছে গড়িয়ে পড়লো সেটা। মাথা নেড়ে আফসোস করার ভঙ্গি করলো সে। মুচকি হেসে লোকটার পকেট থেকে মানিব্যাগ আর মোবাইলফোনটা বের করে নিলো। মানিব্যাগটা খুলে দেখতে পেলো ভেতরে একটা ছবি। আহত লোকটা এক বাচ্চাছেলেকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পাশে খুব সম্ভবত তার স্ত্রী, পেছনে বড় একটা ব্যানারে লেখা :

জিসানের শুভজন্মদিন।

“তোর ছেলে?”

আহত লোকটা জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে এখন। কিছু বললো না তবে চোখেমুখে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে।

“রঞ্জু কোথায় থাকে, বল?” শান্তকণ্ঠে বললো আবার। “অন্তত তোর ছেলে আর বউয়ের কথা ভেবে...”

বাস্টার্ড খেয়াল করলো লোকটার দু'চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

“রঞ্জুর জন্যে আজ তোর এ অবস্থা...মারা যাচ্ছিস...তোর ছেলেটা এতিম হয়ে যাবে... তুই কি এখনও রঞ্জুকে বাঁচাতে চাস, নাকি তোর বউ-ছেলেকে? “

“আ-আপনি..কে?” কষ্ট করে বলতে পারলো লোকটা। “রঞ্জুকে চাচ্ছেন কেন?”

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে বললো, “রঞ্জু কোলকাতার কোথায় থাকে?” কথাটা বলেই মানিব্যাগটা পকেটে ভরে নিলো। “তুই না বললেও আমি সেটা জেনে নিতে পারবো। রঞ্জুকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবি না। তবে নিজের ছেলেটাকে বাঁচাতে পারিস ইচ্ছে করলে।”

“আমার ছেলের কোনো ক্ষতি করবেন না, আল্লাহর দোহাই লাগে...!”

“অবশ্যই করবো না, যদি তার বাপ আমার কথামতো কাজ করে,” একটু থেমে আবার বললো, “আমি যা চাই তা পেয়ে গেলে তোর ছেলের ক্ষতি করতে যাবো কোন্ দুঃখে? ছোটো বাচ্চাদের খুন করাটা সহজ কাজ না। খুব খারাপ লাগে।” কথাটা বলেই মাথা দুলিয়ে আফসোস করার ভঙ্গি করলো সে। “তবে আমাকে উল্টাপাল্টা ঠিকানা দিবি না। যদি দিস, খুব খারাপ লাগলেও একটা কাজ করবো।” স্থির চোখে চেয়ে আবার বললো, “তোর বউ আর ছেলেকে খুঁজে বের করাটা কঠিন হবে না।” আহত লোকটার মোবাইল ফোনটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো সে।

লোকটা আরো জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্যে দু'চোখ বন্ধ করে একটা সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করলো।

“চায়না টাউন... মাউন্ট অলিম্পাস...”

.

ঢাকা শহরের সবগুলো থানা থেকে ব্ল্যাক রঞ্জুর ব্যাপারে সাম্প্রতিক কিছু তথ্য জোগাড় করতে পেরেছে জামান। তার সম্পর্কে থানায় যেসব অভিযোগ করা হয় তার বেশিরভাগই চাঁদাবাজি সংক্রান্ত। ফোনে চাঁদা দাবি করা হয়েছে, নির্দিষ্ট দিনে চাঁদা না দিলে প্রাণনাশের হুমকি, এইসব।

ব্ল্যাক রঞ্জুর দলটি প্রতি মাসে কি পরিমাণ চাঁদা দাবি করে সে সম্পর্কে জেফরির কোনো ধারণা ছিলো না, তথ্যগুলো হাতে পেয়ে বিস্মিত হলো সে।

এরকম একজন ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী দিনের পর দিন চাঁদাবাজি করে যাচ্ছে, খুনখারাবি করে যাচ্ছে অথচ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিছুই করতে পারছে না!

পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী ব্ল্যাক রঞ্জুর বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত মোট ৩৭টি হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ আনা হয়েছে। আর চাঁদাবাজির ঘটনার সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। প্রতি মাসে গড়ে দশ থেকে বারোটি বড়সড় চাঁদাবাজির অভিযোগ থাকে তার দলের বিরুদ্ধে। তার মানে সত্যিকারের সংখ্যাটি আরো বেশি। অনেকেই পুলিশের দ্বারস্থ হয় না, চুপচাপ চাঁদা দিয়ে নিজের জীবন বাঁচায়।

তবে অদ্ভুত বিষয় হলো বিগত পনেরো-বিশ দিনে তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ হঠাৎ করেই কমে গেছে : মাত্র দুটো!

চাঁদাবাজি এক লাফে কমে আসতেই তার দলের বিরুদ্ধে মারাত্মক আঘাত হানা শুরু হলো! ব্যাপারটা জেফরির কাছে শুধু রহস্যজনকই নয়, জটিল বলেও মনে হচ্ছে।

হাতে একটা ফুলস্কেপ কাগজ নিয়ে জামান ঢুকলো তার রুমে।

“স্যার, কর্নেল সাহেবের বর্ণনা থেকে আর্টিস্ট এই স্কেচটা করেছে, কাগজটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো জামান।

স্কেচটা হাতে নিয়ে দেখলো জেফরি বেগ।

দেখতে সুদর্শনই বলা চলে। মাথার চুল বেশ ছোটো করে ছাটা। চেহারার মধ্যে খুনির কোনো লক্ষণই নেই। তবে তার কাছে কেমন জানি চেনা চেনা মনে হলো। অবশ্য এটাও ঠিক, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা শুনে যে স্কেচ তৈরি করা হয় তা আসল চেহারার সাথে অনেক সময়েই মেলে না। এটা অংশত নির্ভর করে প্রত্যক্ষদর্শী আর আর্টিস্টের উপর।

এমন সময় জেফরির ডেস্কের ফোনটা বেজে উঠলো।

“স্লামালেকুম, স্যার,” বললো সে। তারপর অপরপ্রান্তের কথা শুনে গেলো কিছুক্ষণ। “কখন?...আচ্ছা...ঠিক আছে, স্যার।” ফোনটা রেখে দিলো সে।

জামান তার দিকে চেয়ে আছে।

“ফারুক স্যার ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট জোগাড় করতে পেরেছে।”

“এটা তো ভালো খবর, স্যার।”

“হুম।”

“আমি কিন্তু নিশ্চিত, এটা গোপন কোনো অপারেশন,” জামান বললো।

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। “দেখা যাক রিপোর্টে কী আছে।”

নিজের ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়ালো জেফরি বেগ। “স্যার আমাকে এক্ষুণি দেখা করতে বলেছেন।”

উত্তরার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে আসাটা মোটেও কষ্টকর কাজ ছিলো না। একটা নিরিবিলি জায়গায় ছয় তলার অ্যাপার্টমেন্টে শুটিং হচ্ছে। গুলির যেটুকু শব্দ বাইরে থেকে শোনা গেছে তাতে কেউ সন্দেহ করে নি। লোকজনও তেমন ছিলো না। মঞ্জুর অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে যে লাশটা পড়ে ছিলো সেটা লিটনের সহযোগী কাম ড্রাইভারের। লাশটা অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর ঢুকিয়ে দরজা লাগানোর সময়ই ছয় তলা থেকে শুটিং ইউনিটের এক ছোকরা এসে, হাজির হয় তার সামনে। একটা সানক্যাপ উল্টো করে পরা।

“কি ভাই, এতো ঠুসঠাস আওয়াজ হইতাছে ক্যান? আজব!”

বাস্টার্ড ছেলেটার দিকে কটমট চোখে তাকালেও কিছু বলে নি।

“শালার এই আওয়াজের কারণে তিন তিনবার আমাগো শুটিং কাট করতে হইছে...বসে তো ক্ষেইপা আগুন।”

বাস্টার্ড ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, “এখানেও শুটিং হয়েছে, তবে সত্যিকারের শুটিং।”

ছেলেটা অবাক চোখে চেয়ে থাকে তার দিকে। বাস্টার্ড আর দেরি করে নি সোজা লিফটের কাছে চলে যায়।

গেটের দারোয়ান তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করে নি। গুলির শব্দগুলোকে সেও ধরে নিয়েছে শুটিংয়ের অংশ হিসেবে। এখানে নিয়মিতই শুটিং হয়, আর দুয়েকবার যে গোলাগুলির শব্দ হয় নি তাতো নয়। বিশেষ করে সিনেমার শুটিং যখন হয় তখন এটা বেশি ঘটে।

অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে একটা প্রাইভেট কার পার্ক করা ছিলো, সে জানে এই গাড়িতে করেই লিটন এসেছিলো। প্রথমে যাকে ইলেক্ট্রিক শক দিয়েছিলো, তারপর গুলি করে মেরেছিলো দরজার বাইরে তার পকেট থেকে গাড়ির চাবিটা পায়।

এখন সে লিটনের গাড়িটা চালাচ্ছে। উত্তরার শুটিং হাউজ থেকে বের হয়েছে প্রায় দু'ঘণ্টা আগে। পথে এক জায়গায় থেমে নাস্তা করে নিয়েছে। নাস্তা করার সময়ই লিটনের মোবাইল ফোন থেকে কতগুলো নাম্বার দেখে নিয়েছে। এরমধ্যে একটা নাম্বার রঞ্জু নামে সেভ করা, এটা যে ব্ল্যাক রঞ্জুর নাম্বার সেটা বুঝতে পারলো। নাম্বারটা ইন্ডিয়ার। তবে এই নাম্বার দিয়ে ব্ল্যাক রঞ্জুকে খুঁজে বের করা না গেলেও অন্য একটা কাজ ঠিকই করা যাবে।

ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের বাইরে গাড়িটা পার্ক করে রাখলো। লিটনের ফোনটা বের করে ব্ল্যাক রঞ্জুর নাম্বারে ডায়াল করলো সে।

রিং হচ্ছে। একবার, দু'বার, তিনবার...

"হ্যালো?" অপরপ্রান্ত থেকে একটা কণ্ঠ বললো। রঞ্জু?

"হ্যালো, আমি ডাক্তার সাজ্জাদ করিম বলছি, ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল থেকে," বাস্টার্ড নিখুঁত দক্ষতায় বলে গেলো।

"ডাক্তার...??" বিস্মিত হলো ফোনের অপর প্রান্তের লোকটা।

"কিছুক্ষণ আগে আমাদের হাসপাতালে দু'জন অ্যাকসিডেন্টের রোগী। এসেছে, তাদেরই একজনের মোবাইল ফোন থেকে আমি কলটা করছি। রোগীর অবস্থা বেশ খারাপ বলতে পারেন, সে বার বার রঞ্জু ভাই রঞ্জু ভাই বলছিলো তাই তার ফোন নাম্বার থেকে আপনার নাম্বারটা খুঁজে ফোন করেছি..."

"অ্যাকসিডেন্ট! এটা তো লিটনের নাম্বার! কি হয়েছে লিটনের?" উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো লোকটা।

"খুব মারাত্মক অ্যাকসিডেন্ট করেছে...এখন অবস্থা গুরুতর। আপনি তার কে হন?"

"আমি, আমি ওর খুব ঘনিষ্ঠ..." লোকটা একটু থেমে আবার বললো, "কিভাবে অ্যাকসিডেন্ট করলো?"

"গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট...প্রাইভেটকারে ছিলো। ড্রাইভার আর আরেক সঙ্গী ঘটনাস্থলেই মারা গেছে।"

ওপাশ থেকে সুকঠিন নীরবতা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

"আপনি কি রঞ্জু বলছেন?" আস্তে করে বললো সে।

"উমমম...হ্যাঁ।" একটু থেমে নিজেকে ধাতস্থ করে বললো রঞ্জু, "অ্যাকসিডেন্টটা কোথায় করেছে?...কখন?"

"খুব সম্ভবত দেড় ঘণ্টা আগে...উত্তরায়।"

ওপাশ থেকে আবারো নীরবতা নেমে এলো কিছুক্ষণের জন্য।

"হ্যালো?"

"হুম, বলেন?" কণ্ঠটা বেশ বিষণ্ণ।

"আপনি কি একটু হাসপাতালে আসতে পারবেন?"

"আমি?" আৎকে উঠলো যেনো। "আমি অনেক দূরে আছি..."

"তাহলে তো সমস্যা হয়ে গেলো...এ সময় তার ঘনিষ্ঠ লোকজন থাকা জরুরি।" একেবারে দায়িত্বশীল ডাক্তারের মতো বললো সে।

"আমি...আমি সেরকম একজনকে পাঠাচ্ছি হাসপাতালে। চিন্তা করবেন না। লিটনকে বাঁচিয়ে তুলতে যা দরকার তাই করুন, ডাক্তার। এক্ষুণি আপনার কাছে একজনকে পাঠাচ্ছি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।" একটু থেমে আবার বললো, "যাকে পাঠাবেন তাকে এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলবেন, আপাতত এই ফোনটা আমার কাছেই আছে, ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে, ডাক্তার।"

লাইনটা কেটে দিলো বাস্টার্ড। রঞ্জুর নাগাল না পেলেও অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছে বলা যায়। ফোনে কথা বলতে পেরেছে!

হোমিসাইডের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদের কাছ থেকে সব শুনে চুপ মেরে গেলো জেফরি বেগ। মহাপরিচালক বুঝতে পারছে না তার এই প্রিয়পাত্র খুশি হয়েছে নাকি অখুশি।

"কী, খুশি তো?"

"জি, স্যার," বললো সে। "আমাদের তো লিখিত কিছুর দরকার নেই, অনুরোধটাও আনঅফিশিয়াল, সুতরাং ঠিকই আছে।"

"তানভির সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে, আমি জানি।"

"স্যার, উনি কি এটা আমাকে দেখতে দেবেন, নাকি আপনাকে...?"

এবার ফারুক আহমেদ বুঝতে পারলো জেফরির মনোভাব। সে মনে করছে ইন্টেল রিপোর্টটা শুধুমাত্র হোমিসাইডের মহাপরিচালকই দেখতে পাবে।

"অবশ্যই তোমাকে দেখতে দেবে," দাঁত বের করে হেসে বললো। "তদন্তটা তুমি করছো সুতরাং তোমারই তো দেখা উচিত।"

এবার জেফরির মুখে স্মিত হাসি দেখা গেলো। "ধন্যবাদ, স্যার।"

"তানভিরের জায়গায় অন্য কেউ হলে কিন্তু রাজি হতো না, ওর আগে যে ছিলো সে তো আমাদেরকে উৎপাত বলে মনে করতো। যেনো গোয়েন্দা রিপোর্টগুলো ওর বাপের সম্পত্তি ছিলো।"

"স্যার, একটা কথা বলি?" জেফরি বললো।

"বলো।"

"যদি দেখা যায় এটা গভর্মেন্টেরই কোনো গোপন অপারেশন তাহলে আমাদের তদন্ত কাজের কী অবস্থা হবে?"

"তানভির জোর দিয়ে বলেছে, এরকম কোনো কিছু হচ্ছে না। তারপরও তুমি যখন বলছো তাহলে বলি... সেরকম কিছু হলে তদন্ত কাজটি আমরা করবো না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি বেগ।

"একটা কথা কি জানো?" ফারুক সাহেব বললো। "স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিন্তু আমাদেরকে এইসব হত্যাকাণ্ড তদন্ত করার ব্যাপারে কোনো রকম বাধা দেয় নি।"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, স্যার?"

"মানে, পুরো ব্যাপারটা গভর্মেন্টের গোপন অপারেশন হলে তারা নিশ্চয় আমাদেরকে তদন্ত করার ব্যাপারে অনীহা দেখাতো।"

মাথা দোলালো জেফরি। "স্যার, তারা এটা করলে তো আমরা বুঝে যেতাম গভর্মেন্ট এরকম কিছু করছে। ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্যেই তারা এটা করে নি।"

জেফরির সাথে একমত পোষণ করতে বাধ্য হলো মহাপরিচালক। "তাও অবশ্য ঠিক।"

ঠিক এমন সময় জেফরির সহকারী মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলে সে তার বসের কাছ থেকে এক্সকিউজ চেয়ে কলটা রিসিভ করলো। অনেকক্ষণ ধরে ওপাশের কথা শুনে গেলো চুপচাপ, তারপর ফোনটা রেখে তাকালো হোমিসাইডের মহাপরিচালকের দিকে।

"স্যার, উত্তরার এক শুটিংহাউজে চারটি খুন হয়েছে," বললো জেফরি।

"কি?" আৎকে উঠলো ফারুক আহমেদ।

"রঞ্জুর ভাই মঞ্জু, যাকে আমরা খুঁজছি, সেই মঞ্জুসহ ব্ল্যাক রঞ্জুর আরো দু'জন সহযোগী।

"মাই গড!" চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়ে গেলো মহাপরিচালকের। এর অর্থ বুঝতে পারছো?"

জেফরি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো তার বসের দিকে। "আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি গেলো গেলো রব উঠে যাবে। আর মাত্র এক সপ্তাহ পর তত্ত্ববধায়ক সরকার টেকওভার করবে, নির্বাচনী হাওয়া বইছে দেশে, এরকম সময় এতোগুলো খুন! ভাবাই যায় না।" তারপর মাথা দোলাতে দোলাতে আবার বললো, "না, না। এটা কোনো গভর্মেন্টের গোপন অপারেশন নয়। ক্ষমতাসীন সরকার ইলেকশনের আগে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এমন অবনতি করার ঝুঁকি নেবে না।"

"কিন্তু স্যার, ব্যাপারটা তো বরং উল্টো হচ্ছে।" অবাক হয়ে তাকালো মহাপরিচালক। "এইসব সন্ত্রাসীর খুন হওয়াতে পাবলিক খুব খুশি। ক্রশ ফায়ার শুরু হলো যখন তখনও এরকম হয়েছিলো। এখন পর্যন্ত এসব খুনখারাবির কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে না।" মাথা নেড়ে এ কথার সাথেও সম্মতি জানালো জেফরির বস। "বরং কৃতিত্ব চলে যাচ্ছে বর্তমান সরকারের কাছে।"

"আসলে পলিটিশিয়ানদের মতিগতি আমি কখনই বুঝতে পারি না। দেই আর সো

ডিফিকাল্ট। হতে পারে, ইলেকশনে বাড়তি সুবিধা পাবার জন্যেও এরকম কিছু করছে। কিন্তু...”।

“কি, স্যার?”

“শুধুমাত্র ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের বিরুদ্ধে হবে কেন?...আরো অনেকেই তো আছে?”

এবার জেফরির কাছে তার বসের কথাটা খুবই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো। ঠিকই তো, শুধুমাত্র ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের বিরুদ্ধে হবে কেন?

ব্ল্যাক রঞ্জুর সাথে ফোনে কথা বলার পনেরো মিনিটের মধ্যেই লিটনের ফোনটা আবার বেজে উঠলো। কলটা রিসিভ করলো বাস্টার্ড।

“হ্যালো, ডাক্তার সাজ্জাদ কবির?” অস্থির একটা কণ্ঠ বললো।

“সাজ্জাদ করিম,” শুধরে দিলো সে।

“ওহ্, সরি, ডাক্তার সাহেব...আমি লিটন নামের এক রোগী র বন্ধু, আপনি একটু আগে তার এক আত্মীয়ের সাথে কথা বলেছিলেন?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনারা এখন কোথায়?” ইচ্ছে করেই এটা বললো। সে জানতে চাইছে কয়জন এসেছে।

“আমি তো এখন মেডিকেল হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে আছি...”

তার মানে একজন এসেছে। “আপনাদের রোগী আছে ওটিতে...কেন্টিনের পাশে একটা অফিস আছে, আপনি সেখানে চলে আসুন।”

“নীচতলার ক্যান্টিনে?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, একজন ব্যস্ত ডাক্তার সে। “আচ্ছা ভালো কথা, সাথে করে লোকজন নিয়ে এসেছেন?”

“না,” বললো ওপাশ থেকে। “কেন, ডাক্তার সাহেব?”

“রক্ত লাগতে পারে...সেজন্যে বলছিলাম আর কি। ঠিক আছে আপনি জলদি চলে আসুন।”

নীচ তলার ক্যান্টিনের পাশে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী সমিতির একটি অফিস আছে। দিনের এ সময়টায় অফিসটা বন্ধ থাকে। জায়গাটা হাসপাতালের সবচাইতে নিরিবিলি অংশ। রঞ্জুর লোক আসার আগেই, অপেক্ষা করার সময়টাতে লিটনের গাড়িটা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারিদের অফিসের কাছে এনে রেখেছে সে।

তার একটা সুবিধা হলো রঞ্জু যাকেই পাঠাক না কেন সে তাকে চিনবে না। কিন্তু বাস্টার্ড ঠিকই চিনে ফেলবে-এরকম নিরিবিলি জায়গায় অস্থির একজন মানুষ-দেখলেই বুঝতে পারবে এ হলো অ্যাকসিডেন্টের রোগী র জন্যে এসেছে।

ফোনে কথা বলার ঠিক পাঁচ-ছয় মিনিট পর দেখা গেলো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের এক লোক হন্তদন্ত হয়ে ক্যান্টিনের কাছে এসে চারপাশে অস্থিরভাবে তাকাচ্ছে।

ঠিক আছে, তাহলে তুমিই সেই লোক।

লিটনের ফোনটা সাইলেন্ট মুডে দিয়ে রেখেছে। সে জানে লোকটা আবার ফোন করতে পারে। সব কিছু দেখে নিশ্চিত হবার আগে লোকটার কাছে সে ধরা দেবে না।

ঠিক তাই হলো। লোকটা আবার ফোন দিচ্ছে।

বাস্টার্ড ফোনটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটার কাছাকাছি কিন্তু কতোগুলো রিক্সাভ্যানের আড়ালে। ভ্যানগুলোতে স্তূপ করে রাখা সেলাইনের খালি টিউব। সে জানে, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারি ইউনিয়নের নেতারা প্রতিদিন এরকম প্লাস্টিকের খালি টিউব বিক্রি করেই পাঁচ-ছয় হাজার টাকা কামায়। সরকারী হাসপাতালের দুর্নীতির একেবারে সর্বব্যাপী রূপ।

ফোনটা রিসিভ করলো সে।

“আমি তো এসে গেছি,” মৃত্যুপথযাত্রি রোগী র উদ্বিগ্ন আত্মীয়ের কণ্ঠস্বর।

“হ্যাঁ, আপনি এখন কোথায়?”

“ক্যান্টিনের সামনে।”

“ক্যান্টিনের পাশে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারিদের সমিতির অফিসটা দেখতে পাচ্ছেন?”

“হ্যাঁ।”

“ওটার ডান পাশ দিয়ে যে গলিটা গেছে সেখান দিয়ে সোজা চলে আসুন। ওটি’তে, আমি ওখানেই আছি।”

লোকটা পকেটে ফোন রেখে দ্রুত চলে গেলো সমিতির ডান পাশের গলিতে। এই গলি দিয়ে আদৌ কোনো অপারেশন থিয়েটারে যাওয়া যায় না।

বাস্টার্ড আস্তে করে ভ্যানগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বাম দিকে সরু একটা গলিতে ঢুকে পড়লো।

সেই সরু গলিতে মুখোমুখি হলো তারা।

রঞ্জুর লোকটা কিছুই বুঝতে পারলো না। বাস্টার্ডকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলো সে। ঠিক তখনই ঘুরে পেছন থেকে লোকটার গলা পেচিয়ে ধরেলা বাম হাতে, আর ডান হাতের অস্ত্রটা ঠেকিয়ে রাখলো লোকটার ডান কিডনি বরাবর।

“একদম নড়বি না!” ফিসফিসিয়ে বললো সে।

“কে” আৎকে উঠে বললো রঞ্জুর সহযোগী।

বাস্টার্ড তার গলাটা শক্ত করে চেপে ধরলো যেনো কোনো শব্দ করতে না পারে। “একটা কথা বলবি তো শেষ করে দেবো। আমার পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো আছে।”

লোকটা কিছু বললো না। তবে বাস্টার্ডের হাত থেকে ছোটার জন্যে হাসফাস করতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের বাট দিয়ে লোকটার ডান কানের কাছে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে বসলো সে।

পিস্তলটা পকেটে রেখে অচেতন লোকটাকে পাঁজাকোলা করে গলি থেকে বের হয়ে কাছেই পার্ক করে রাখা লিটনের গাড়ির দিকে চলে গেলো সে। দুয়েকজন লোক দৃশ্যটা দেখলেও তাদের কাছে এটাকে অস্বাভাবিক বলে মনে হলো না। হাসপাতালে এটা খুবই পরিচিত দৃশ্য।

যতোটা ভেবেছিলো তারচেয়ে অনেক দ্রুত আর সহজে কাজ হয়ে গেলো বলে মনে মনে খুব খুশি হলো বাস্টার্ড। রঞ্জুর এই লোকের কাছ থেকেই আসল ঠিকানাটা জানতে পারবে বলে মনে করছে।

বুঝতে পারছে রঞ্জুর খুব কাছে চলে এসেছে সে।

শত শত মাইল দূরে, কোলকাতার এক গোপন আর নিরাপদ আস্তানায় বসে স্বজন হারানোর যন্ত্রণার চেয়েও অনেক বেশি ক্রোধে ফুঁসছে দু'জন লোক।

তারা প্রায় সমবয়সী। দেখতেও অনেকটা একই রকম। মনে হবে আপন দুভাই। একজন গালে হাত দিয়ে চিন্তিত মুখে বার বার তাকাচ্ছে ক্রোধে ফুঁসতে থাকা লোকটার দিকে। গায়ের রঙ যদি ফর্সা হতো তাহলে রাগে তার মুখটা লাল টকেটকে দেখাতো, কিন্তু কালো কুচকুচে হওয়ার দরুণ শুধুমাত্র চোখ দুটো দেখে বোঝা যাচ্ছে লোকটার মাথায় খুন চেপে গেছে।

"এটা অ্যাকসিডেন্ট না," এই নিয়ে কথাটা তিনবার বললো সে। মাথা দোলাতে লাগলো দু'পাশে।

গালে হাত দিয়ে বসে থাকা লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "কে করছে এসব? কারা করছে? আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না।"

ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো কালো কুচকুচে লোকটা। "আমরা যখন বিরাট একটা কাজ করতে যাচ্ছি তখনই কিনা এরকম আঘাতের পর আঘাত হানা হচ্ছে?"

"তুমি শিউর, মঞ্জু ভাই...?"

লাল টকটকে চোখে তাকালো সে। "ঝন্টুকে পাঠিয়েছি হাসপাতালে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবো সব।"

"ঢাকায় আমাদের দলের সবাইকে অ্যালার্ট করে দাও না?"

কালো লোকটি চেয়ে রইলো তার সঙ্গীর দিকে। তারপর আক্ষেপে মাথা দোলালো। "সামনে আমাদের বিরাট একটা কাজ...এ মুহূর্তে সবাইকে ঘাবড়ে দেবো?"

গাল চুলকাতে লাগলো তার সঙ্গী। "কিন্তু এভাবে আমাদের লোকজন খুন হতে থাকলে তো দলের সবাই ভয় পেয়ে যাবে।"

"সমস্যা তো ওখানেই," উঠে দাঁড়ালো কালোমতো লোকটা। "এভাবে খুন হতে থাকলে সবাই ভয় পেয়ে যাবে...আবার অ্যালার্ট করে দিলেও ঘাবড়ে যাবে। আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।"

"আমি একটা কথা বলি?"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো কালো লোকটা।

"আমাদের দলের যেসব লোক খুন হচ্ছে তাদের ব্যাপারে আমরা খুব একটা উদ্বিগ্নতা দেখাবো না। এতে করে দলের নীচু লেভেলে যারা আছে তারা মনে করবে এটা নিয়ে তাদের ভাবার দরকার নেই।"

হাতঘড়ির দিকে তাকালো কালোমতো লোকটা। মেডিকেল হাসপাতাল থেকে ঝন্টু এখনও ফোন করছে না কেন? হাসপাতাল থেকে ঝন্টুর মহল্লা খুব কাছেই, এতোক্ষণে ওখানে পৌঁছে রিপোর্ট করার কথা। কী যেনো একটু ভেবে নিয়ে নিজেই ফোনটা তুলে ডায়াল করলো ঝন্টুকে।

রিং হচ্ছে...

পর পর দু'বার রিং হলেও কলটা রিসিভ করা হলো না।

কালো লোকটার চোখমুখ আতঙ্কে ভরে উঠলো। তার সামনে বসে থাকা সঙ্গীর চেহারায়ও ফুটে উঠলো একই রকম অভিব্যক্তি।

"ফোন ধরছে না?"

মাথা নাড়লো কালো লোকটা।

"ঘটনাটা কি...এসব কী হচ্ছে!?"

কালো লোকটা একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললো, "মনে হচ্ছে ঝন্টুও শেষ!"

ঘুটঘুঁটে অন্ধকারে শুধু নিজের নিঃশ্বাসটা শুনতে পাচ্ছে, বুঝতে পারছে এখনও বেঁচে আছে, তবে কোথায় আছে সেটা বুঝতে পারছে না। তার হাত-পা-মুখ শক্ত করে বাধা। জ্ঞান ফিরে আসার পর থেকেই গাঢ় অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সবচাইতে আতঙ্কের ব্যাপার হলো কোনো রকম আওয়াজও শুনতে পাচ্ছে না। তার কাছে মনে হচ্ছে জ্যান্ত কবর দেয়া হয়েছে। তাকে। একটা গুমোট আর ভ্যাপসা গন্ধ, নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। মাথার ডান পাশটা চিন চিন করে ব্যাথা করছে। শো শো শব্দও হচ্ছে ডান কানে। ঘরটা কতো বড় কিংবা ছোটো সেটাও ঠাওর করতে পারছে না।

খুট করে একটা শব্দ হতেই মৃদু আলো দেখতে পেলো, সেই আলোটা আরে বেড়ে গেলে বুঝতে পারলো দরজা খুলে কেউ ঘরে ঢুকছে। দরজাটা আবার বন্ধ করলে নেমে এলো গাঢ় অন্ধকার।

একটা আলো জ্বলে উঠলো।

চার্জার লাইট। এইমাত্র ঘরে ঢোকা লোকটার হাতে। কিন্তু লোকটাকে চিনতে পারলো না। জ্ঞান হারানোর ঠিক আগ মুহূর্তের কথা এখনও মনে করতে পারছে না।

চার্জারটা তার মাথার কাছে রেখে দিয়ে লোকটা তার মুখের বাধন খুলে দিলো। আগন্তুকের চেহারা দেখতে পেলো এবার কিন্তু এখনও চিনতে পারলো না।

"কে?" মুখের বাধন খুলে ফেলতেই বললো লোকটা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো সে। বুঝতে পারলো মুখ বেধে রাখার কারণেই নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো এতোক্ষণ।

"তুই কে?" বললো বাস্টার্ড।

"আমি...আমি...ঝন্টু।"

"ব্ল্যাক রঞ্জুর খুব ঘনিষ্ঠ, না?"

ঝন্টু কিছু বললো না।

"রঞ্জু তো তোর চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছে মনে হয়। একটু আগে ফোন দিয়েছিলো। আমি অবশ্য ফোনটা ধরি নি।"

ঝন্টু চোখ পিটপিট করে তাকালো শুধু।

"যদিও রঞ্জুর সাথে আমার জরুরি একটা দরকার আছে।" বাস্টার্ড কথাটা এমনভাবে বললো শুনে মনে হলো না সত্যি জরুরি।

"কেন?" ঝন্টুর গলা একটু কাঁপা কাঁপা শোনালো।

"লম্বা ইতিহাস।"

"মঞ্জু ভাই...লিটন, তারা কোথায়?" ভয়ে ভয়ে বললো সে।

"তারা সবাই রঞ্জুকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেরাই মরে গেছে।"

ঝন্টু কিছু বললো না।

"তুইও তাই করবি, জানি," খুব শান্ত কণ্ঠে বললো বাস্টার্ড।

"আপনি কি চান?"

"রঞ্জুকে চাই।"

"বুঝলাম না।"

"আমি রঞ্জুকে চাই।"

"সে তো দেশে থাকে না।"

"কোথায় থাকে?"

"কোলকাতায়।"

"কোলকাতার কোথায়?"

"আমি তো–"

ঝন্টুর ঠোঁটে আলতো করে হাত রেখে বাস্টার্ড বললো, "এ কথা বলে অনেকেই মারা গেছে। তুইও মারা যাবি। আরেকটু ভেবে বল।"

ঢোক গিললো ঝন্টু। "কিন্তু আমি বললেও আপনি আমাকে মেরে ফেলবেন। আমি জানি..."

মুচকি হাসলো বাস্টার্ড। "না। তুই বললে বেঁচে থাকবি।" ঝন্টুর ঠোঁটে তর্জনী দিয়ে টোকা মেরে বললো, "এই পচা মুখটা দিয়ে সত্যি বলেছিস কিনা সেটা যাচাই করে দেখতে হবে তো, নাকি?"

ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইলো ঝন্টু।

"তুই রঞ্জুর ঠিকানাটা বললে কোলকাতায় আমার লোকজন সেটা যাচাই করে দেখবে। তারা যদি দেখে তুই সত্যি কথা বলেছিস তাহলে আমি তোকে পুলিশের হাতে তুলে দেবো। কয়েক বছর জেল খেটে বের হয়ে আসতে পারবি। আর যদি মিথ্যে বলিস, সোজা ক্রশফায়ার!"

ঝন্টু কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো তার দিকে। "আপনি কি পুলিশের লোক?"

"তারচেয়েও বড় কিছু।"

একটু ভেবে নিলো ঝন্টু। "যাদেরকে মেরেছেন তারা আপনাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছিলো?"

"না।"

"তাহলে?"

"ওরা ঠিকানা দেবার আগেই মরে গেছে!"

"কিভাবে?"

"আমাকে মারতে চেয়েছিলো...আমার হাত থেকে পালাতে চেয়েছিলো। কিছু করার ছিলো না। মারতে বাধ্য হয়েছি।"

"মঞ্জু ভাইও?"।

"না। তোর মঞ্জু ভাইকে আমি মারি নি...হারামজাদা আমার আর লিটনের মাঝখানে পড়ে গুলি খেয়েছে।" কথাগুলো এমনভাবে বললো যেনো কতোগুলো মানুষের মৃত্যু নিছক ভুলভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু না।

"আমাকে খুন করবেন না তার কি গ্যারান্টি আছে?"

ঠোঁট উল্টে মাথা দোলালো সে। "কোনো গ্যারান্টি নেই। মিথ্যে বললে মরবি, আর সত্যি বললে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আছে। তোর সাহায্যে রঞ্জুকে যদি ধরতে পারি তাহলে তোকে পুরস্কার হিসেবে প্রাণে বাঁচিয়ে দেবো। আমাদের তো একজন সাক্ষীও লাগবে, নাকি?" একটু হেসে আবার বললো, "তবে জেলটেল খাটতে হবে। একেবারে ছেড়ে দেয়া যাবে না। তুই সাক্ষী হবি। রঞ্জুর বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হলে তোকে জেলটেল দিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে।"

ঝন্টু চুপ মেরে রইলো।

"এখন ভেবে দ্যাখ, রঞ্জুর জন্য তুই কতটা ত্যাগ স্বীকার করবি।" বাস্টার্ড ভালো করে তাকালো ঝন্টুর দিকে। লোকটা ভেবে যাচ্ছে। সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করছে। কঠিন এক সিদ্ধান্ত। "তোদের দলের একজনকে কিভাবে মেরেছি জানিস?"

ঝন্টু শুধু চেয়ে রইলো, কিছু বললো না।

"ভাট্টিখানায় লোহা গলানোর চুলায় ফেলে দিয়েছি...কঠিন মৃত্যু!"

আৎকে উঠলো ঝন্টু।

"তবে আমি ভাবছি তোর বেলায় অন্য কিছু করবো।"

ঝন্টু এবারও কিছু বললো না।

"তুই যদি রঞ্জুর ঠিকানা না বলিস, তাহলে ধারালো চাপাতি দিয়ে তোর পা থেকে একটু একটু করে কাটতে শুরু করবো..." চোখেমুখে যতোটা হিংস্রতা ফুটিয়ে তোলা যায় ফুটিয়ে তুললো সে। "আমার ধারণা, হাটু পর্যন্ত আসার আগেই তুই সব বলে দিবি। মাঝখান থেকে চিরজীবনের জন্যে পা দুটো হারাবি, শূয়োরের বাচ্চা!"

পাঁচ মিনিট পর ঝন্টু মুখ খুলতে শুরু করলো।

“রঞ্জু কখনও এক ঠিকানায় বেশি দিন থাকে না। কিছু দিন পর পর ঠিকানা বদলায়।”

“এখন কোথায় আছে?”

“চায়না টাউনে।”

চায়না টাউন? লিটনও এ কথা বলেছিলো, মনে মনে ভাবলো বাস্টার্ড। “চায়না টাউনের কোথায়?”

“মাউন্ট অলিম্পাসে।” একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো, “একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্ট। যতোটুকু জানি, ওটার চার তলায় রঞ্জু থাকে।”

বাস্টার্ডের কাছে মনে হলো ঝন্টু সত্যি কথাই বলছে। তবে আরো নিশ্চিত হবার দরকার আছে।

“তুই বুঝতে পারছিস, মিথ্যে বললে কী হবে?”

মাথা নেড়ে সায় দিলো ঝন্টু।

“আমি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জেনে যেতে পারবো তুই সত্যি বলেছিস কিনা।”

“কিন্তু রঞ্জু যদি এইফাঁকে জায়গা বদল করে ফেলে তাহলে তো সেটা আমার দোষ না।”

দুপাশে মাথা দোলাতে দোলাতে মুচকি হাসলো বাস্টার্ড। “চালাকি করবি না। চালাকি করে তুই বাঁচতে পারবি না। আমি কি চাই সেটা তো তুই বুঝতেই পারছিস। আমি রঞ্জুকে চাই। কিভাবে তার নাগাল পাবো সেটা বল?”

“আমি যা জানি তাই বললাম। কোলকাতায় রঞ্জু আমাদের সাথে থাকে না। ফোনে কথা হয়, দরকার পড়লে সে নিজেই আমাদের সাথে দেখা করে। তবে রঞ্জু যদি জায়গা বদল করেও থাকে সেটা জানবে শুধুমাত্র বাবু।”

“বাবু কে?”

“বাবু বিনয় কৃষ্ণ।”

“কোথায় থাকে সে?”

“তাতীবাজার...পুরনো ঢাকায়।”

ভুরু কুচকে তাকালো ঝন্টুর দিকে। “তোর চেয়ে ঐ বাবু বিনয় কৃষ্ণ কি রঞ্জুর বেশি ঘনিষ্ঠ নাকি?”

“রঞ্জু যেখানেই থাকুক না কেন, বাবু জানবেই। কোলকাতায় রঞ্জুর থাকার ব্যবস্থা বাবুই করে দিয়েছেন।”

“লোকটা করে কি?”

“স্বর্ণ ব্যবসা...তবে তার আসল ব্যবসা হুন্ডি।” বাস্টার্ড বুঝতে পারছে এই ঝন্টু নামের লোকটা সত্যি কথাই বলছে। “রর সমস্ত টাকা-পয়সা এই বাবুই কোলকাতায় পাঠায়? হুন্ডি করে?”

মাথা নেড়ে সায় দিলো ঝন্টু। “দেশে একমাত্র বাবু ছাড়া আর কেউ জানে না রঞ্জু কোথায় আছে।”

“মনে হচ্ছে তুই বেঁচে যাবি।” মুচকি হেসে বললো বাস্টার্ড। “আজ বিকেলের মধ্যেই বুঝতে পারবো তুই ঠিক বলেছিস কিনা।”

“আমি সত্যি বলেছি। আপনি খোঁজ নিলেই বুঝতে পারবেন।”

“এবার বাবু বিনয় কৃষ্ণ সম্পর্কে বল। ওকে কোথায় কিভাবে ধরা যাবে?”

পরবর্তী পাঁচ মিনিট বাবু সম্পর্কে বলে গেলো ঝন্টু। এখানে এভাবে দু'তিন দিন পড়ে থাকলে কেউ মারা যাবে না, বাস্টার্ড সেটা জানে। ঝন্টুকে মারার দরকার নেই। তাকে দিয়ে ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগকে বিভ্রান্ত করা যাবে।

তারপর অন্ধকার ঘরে আবারো হাত-মুখ বেধে ফেলে রেখে বের হয়ে এলো বাস্টার্ড। একটা পরিত্যাক্ত পাটকল। ঢাকা শহরের মাঝখানে। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে।

উত্তরার ৪ নাম্বারে, নতুন গড়ে ওটা একটি এলাকায় একমাত্র কমপ্লিট অ্যাপার্টমেন্টে চার চারটি খুন হয়েছে। নিহতেরা সবাই ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের সদস্য। সবচাইতে বড় কথা, তাদের মধ্যে একজন মনোয়ার হোসেন মঞ্জু ব্ল্যাক রঞ্জুর আপন বড় ভাই।

একজন মানুষের পক্ষে এভাবে, এতোগুলো খুন করা কি সম্ভব? জেফরি বেগের কাছে মনে হচ্ছে তার সহকারী জামানের কথাই সত্যি হতে চলেছে।

সুলতান, লেডি গিয়াস, রঞ্জুর স্ত্রী মিনা। আর এখন আবারো চারটি খুন!

সবচাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো ব্ল্যাক রঞ্জুর দল পাল্টা কোনো আঘাত হানছে না। জেফরি এবং তার সহকারী জামান ভেবেছিলো খুব শীঘ্রই রঞ্জুর দল পাল্টা আঘাত করে বসবে। শহরে আরো খুনখারাবি বেড়ে যাবে। কিন্তু তা হচ্ছে না। একতরফাভাবে খুন হয়ে যাচ্ছে কুখ্যাত সন্ত্রাসী ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের ঘনিষ্ঠরা। কেন?

জেফরির কাছে এর জবাব নেই।

ঘটনাস্থল থেকে ফিরে এসে নিজের ডেস্কে বসে বসে ভেবে যাচ্ছে সে। এমন সময় সাবের কামাল এসে হাজির হলো।

"স্যার, ঐ অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তিন ধরণের বুলেটের খোসা পাওয়া গেছে," বললো সাবের কামাল।

"তার মানে ব্যাপক গোলাগুলি হয়েছে।"

"তাই তো মনে হচ্ছে, স্যার।"

"আর কিছু?" জানতে চাইলো জেফরি।

"মনোয়ার হোসেন মঞ্জু কিন্তু সাইলেন্সর পিস্তলের গুলিতে মারা যায় নি। আমাদের সম্ভাব্য খুনি সাইলেন্সারসহ সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ রাউন্ডের গুলি ব্যবহার করে, কিন্তু মঞ্জুর শরীর থেকে যে তিনটি গুলি বের করা হয়েছে সেগুলো নাইন এম এম-এর।"

নতুন জটিলতা, মনে মনে বললো জেফরি।

"মনে হয়, খুনি এখনও একই অস্ত্র ব্যবহার করে যাচ্ছে, স্যার।"

"মঞ্জু ছাড়া বাকি নিহতদের পরিচয় বের করা গেছে?" জানতে চাইলো জেফরি।

"একজনের পরিচয় জানা গেছে। আবুল কালাম। পিং সিটির ম্যানেজার চিহ্নিত করেছে তাকে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি বেগ। এই হোটেল ম্যানেজারই খুনের ঘটনাটা উদঘাটন করেছে। লোকটা সকাল দশটার পর অ্যাপার্টমেন্টে গেলে দেখতে পায় চার চারটি লাশ পড়ে আছে।

পুলিশের কাছে হতভম্ব ম্যানেজার বলেছে, তার বস্ মনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সাথে দেখা করতে গেছিলো সে। তার মানে লোকটা জানতো তার বস কোথায় আত্মগোপন করেছিলো। জেফরি সিদ্ধান্ত নিলো লোকটাকে আবারো জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ম্যানেজার লোকটা এমন ভয় পেয়েছে, পারলে নিজেই জেলে ঢুকে বসে থাকে। তার ধারণা তাকেও হত্যা করা হবে। তার এরকম মনে করার সঙ্গত কারণ আছে, কিন্তু কে তাকে হত্যা করবে? কেন করবে?

এ প্রশ্নের জবাবে লোকটা কিছুই বলতে পারে নি।

শুধুমাত্র হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টই নয়, রঞ্জুর দলের লোকজনও জানে না। কে বা কারা এসব হত্যা করছে। জেফরি এবার বুঝতে পারলো কেন রঞ্জুর দলের লোকজন পাল্টা আঘাত হানছে না শত্রু কে তারাও চিহ্নিত করতে পারে নি এখন পর্যন্ত।

কিন্তু এটা তো আরও অসম্ভব। জেফরি বেশ ভালো করেই জানে, ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের সাথে পুলিশের উচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে যেমন নিম্ন পর্যায়ের সখ্যতা আছে, তেমনি আছে রাজনীতিকদের সাথে। গুজব আছে, এম.পি, মন্ত্রীসহ অনেক জাঁদরেল রাজনৈতিক নেতাদের সাথেই রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট না হয় এখনও ধরতে পারছে না এসবের পেছনে কে বা কারা আছে, কিন্তু আঘাতটা যাদের উপর করা হচ্ছে তাদের তো জানার কথা। এ কয়দিনে ব্ল্যাক

রঞ্জু নিশ্চয় অনেক জায়গায় যোগাযোগ করে জেনে নিতে পেরেছে কারা এসব ঘটনার পেছনে রয়েছে। তারপরও পাল্টা আঘাত হানছে না খুনখারাবি করতে দক্ষ ব্ল্যাক রঞ্জুর দলটি!

আরেকটা ব্যাপার, উমা নামের মেয়েটি বলেছে খুনি লেডি গিয়াসের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলো রঞ্জু কোলকাতার কোথায় থাকে। একই প্রশ্ন সে করেছিলো মিনা অর্থাৎ রঞ্জুর স্ত্রীকে। রঞ্জুর দলে অন্য কারো কথা জানতে চায় নি। শুধু রঞ্জু কোথায় থাকে সেটাই জানতে চেয়েছে। কেন?

সুলতানকে খুন করার পর খুনি তার মোবাইল ফোন নিয়ে গেছে সাথে করে। তারপরই লেডি গিয়াস খুন হলো। সেই রাতেই খুনি চলে গেলো রঞ্জুর স্ত্রী মিনার ফ্ল্যাটে। মিনাও খুন হলো। তারপর একটা বিরতি। জেফরি জানে খুনি গুলিবিদ্ধ হয়েছে। উমা নামের মেয়েটি এ কথা বলেছে তাদেরকে। তাহলে এই বিরতিটা গুলিবিদ্ধ হবার জন্যেই হয়েছে।

না। উমা বলেছে গুলির আঘাতটা তেমন গুরুতর ছিলো না। তাহলে খুনি সে কারণে অপেক্ষা করে নি। পিং সিটির ম্যানেজার জামিনে মুক্তি পাবার জন্যে অপেক্ষা করেছে। ম্যানেজার মুক্ত হতেই তার পিছু নিয়েছে, তারপর মঞ্জুর গোপন ঠিকানায় চলে যায়। সেখানেই খুন করে চারজনকে। হয়তো মঞ্জুর ওখানে ব্ল্যাক রঞ্জুর বাকি দু'জন লোককে খুনিই ডেকে এনে ফাঁদে ফেলেছে, কিংবা ওরা হঠাৎ করে চলে আসাতে একটা গোলাগুলির ঘটনা ঘটে গেছে। দুটোই হতে পারে।

তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে?

খুনি একটা বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ব্ল্যাক রঞ্জুর পুরো দলের পেছনে লাগে নি সে, তার আসল টার্গেট রঞ্জু।

জেফরি বেগ জবাবটা পেয়ে গেলো।

খুনি ব্ল্যাক রঞ্জুর কাছে পৌঁছাতে চাচ্ছে।

কিন্তু পরক্ষণেই আরেকটা প্রশ্ন উঁকি মারলো তার মনে, যার জবাব এখনও সে জানে না।

খুনিটা কে?!

বাবু বিনয় কৃষ্ণের ঠিকানা, ফোন নাম্বার ছাড়াও ঝন্টুর কাছ থেকে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জেনে নিয়েছে বাস্টার্ড। তার ধারণা লোকটাকে কাবু করার জন্যে এটাই হবে সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

বাবু বিনয় কৃষ্ণ থাকে তাতীবাজারে, বাস্টার্ড সেখান থেকে সোজা চলে এসেছে ওয়ারি নামের পুরনো ঢাকার সবচাইতে অভিজাত এলাকায়। বিনয় কৃষ্ণ বাবু নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নেই। বাস্টার্ড বুঝতে পারলো লোকটা এখন কোথায় আছে। এটাই চেয়েছিলো সে।

খুঁজে খুঁজে একটা ঠিকানা বের করলো। আট তলার একটি অ্যাপার্টমেন্ট। এখানেই, পাঁচ তলার একটি ফ্ল্যাট তার গন্তব্য। সোজা ঢুকে গেলো অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে। দারোয়ান তার দিকে তাকালো কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলো না। লোকটার মনে হয় খিদে পেয়েছে, ডিউটিতে আর মন বসছে না।

পাঁচ তলার বি-৫ ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। কলিংবেল বাজিয়ে অপেক্ষা করলো, কিছুক্ষণ পরই গেট খুলে দাঁড়ালো এক অল্পবয়সী তরুণী।

"কাকে চাই?"

"আমি রোজ ভিউ সোসাইটির মেম্বার, বাবুর সাথে একটু কথা বলতে চাই।"

প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টেই একটি করে সোসাইটি থাকে, অ্যালোটিদের কাছে এটি পরিচিত একটি নাম। বাস্টার্ড সেটাই ব্যবহার করলো। এই অ্যাপার্টমেন্টটির নাম যে রোজ ভিউ সেটা ঢোকার আগেই দেখে নিয়েছে। তরুণী ঠোঁট উল্টে তাকে অপেক্ষা করার ইশারা করে ভেতরে চলে গেলো।

একটু পরই লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা পঞ্চাশোর্ধ ভুড়িওয়ালা এক লোক হন্তদন্ত হয়ে দরজা খুলে দিলো।

“কাকে চাই...আপনি কে?”

“আমি রোজ ভিউ সোসাইটির মেম্বার, আমার নাম আহম্মদ,” বলেই হাতটা বাড়িয়ে দিলো সে। “আপনি বাবু বিনয় কৃষ্ণ?”

বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে বাবু বললো, “হ্যাঁ।” তারপর ভুরু কুচকে জানতে চাইলো, “আপনাকে তো চিনলাম না?”

“আপনি তো এখানে নিয়মিত থাকেন না, থাকলে অবশ্যই চিনতে পারতেন।”

মনে হলো বাবু একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। আমার কাছে কি জন্যে এসেছেন?”

“আরে ভাই, আপনি এসব কী শুরু করেছেন...আমরা কি বউ-বাচ্চা নিয়ে এখানে থাকতে পারবো না?” কপট আক্ষেপের সুরে বললো বাস্টার্ড।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো বিনয় বাবু।

“আপনি নাকি এই ফ্ল্যাটে অসামাজিক কাজকর্ম-”

তাকে আর পুরো কথা বলতে দিলো না বাবু। “ভেতরে আসুন,” দরজা খুলে দিয়ে তাকে ভেতরে ঢুকতে দিলো।

যে তরুণী দরজা খুলে দিয়েছিলো তাকে ভেতরে চলে যাবার জন্য ইশারা করে বাবু চলে এলো ড্রইংরুমে। তারা দুজনেই বসলো সোফায়।

“অ্যালোটিরা নানান কানাঘুষা করছে। আপনি নাকি একজন রক্ষিতা নিয়ে থাকেন এখানে।

“এইসব আজেবাজে কথা কে বলেছে?”

“সবাই বলছে, তাই তো আমাকে আপনার সাথে এ নিয়ে কথা বলতে পাঠিয়েছে।”

“আমি কি কারোরটা খাই না পরি! কারোর তো সমস্যা করি না। তাহলে...?”

“ঠিক করে বলেন তো, দাদা, ঐ মেয়েটা আপনার কে হয়?”

বিব্রত হলো বাবু। “কে হয় মানে?”

“মানে, এ নিয়ে হাউকাউ হোক সেটা আমি চাই না, বুঝতেই তো পারছেন।” একটু থেমে আবার বললো, “এখানে তো আপনি রেগুলার থাকেন না, তাই না?”

“আশ্চর্য! আমি এখানে থাকি কি থাকি না তার কৈফিয়ত কি আপনাদের কাছে দেবো নাকি?...টাকা দিয়ে এই ফ্ল্যাটটা কিনেছি, কার সাথে থাকবো না থাকবো সেটা কারো জানার দরকার আছে বলে মনে করি না।”

“কিন্তু বিনয় বাবু, ভুলে গেলে তো চলবে না, এখানে সবাই ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। সন্তান সন্ততি নিয়ে ভালো পরিবেশে থাকতে চায় সবাই।”

“আরে কে তাদেরকে ভালো থাকতে মানা করেছে!”

“বাবু, এভাবে কথা বললে কিন্তু ঝগড়াঝাটি বাড়বে, তারচেয়ে ভালো আমার একটা কথা শোনেন।”

“কি কথা?” অবাক হলো বাবু।

“মেয়েটাকে বিয়ে করে রেখে দেন না, ল্যাঠা চুকে যাবে। কেউ কিছু বলতে সাহস করবে না। এতো ঝামেলা করার দরকার কি?”

বাবু হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো তার দিকে।

“বুঝতে পারছি, আপনি গোপন রাখতে চাইছেন, সমস্যা কি?...এখানকার লোকজন ছাড়া তো ব্যাপারটা কেউ জানতেও পারবে না।”

“আমি বুঝতে পারলাম না, আজ এতোদিন ধরে এখানে আছি, কেউ কিছু বললো না, আজ হঠাৎ করে নালিশ করা শুরু হয়ে গেলো!”।

মুচকি হাসলো বাস্টার্ড। “আপনার এখানে কে কে থাকে?...মানে আপনারা দুজনেই থাকেন নাকি আরো লোক থাকে?”

“আমরা দু'জন ছাড়াও একজন কাজের মহিলা থাকে,” বেশ কাটাকাটাভাবে বললো বাবু।

“ভালো,” বলেই ঘরটার চারপাশ ভালো করে দেখে নিলো সে। “বাকিরা কোথায়?”

বাবু ভুরু কুচকে তাকালো তার দিকে। “ভেতরের ঘরে আছে।”

“ভালো।”

“আপনি কি আর কিছু বলবেন?” বিরক্তির সাথে জানতে চাইলো বাবু।

“হ্যাঁ, অনেক কথা বলার আছে,” বলেই স্থির দৃষ্টিতে তাকালো সে।

“মানে?”

“আপনি নিশ্চয় জানেন ব্ল্যাক রঞ্জুর অনেক ঘনিষ্ঠ লোকজন খুন হচ্ছে,” শান্ত কণ্ঠে বললো বাস্টার্ড।

বাবু বিনয় কৃষ্ণ যেনো বজ্রাহত হলো। “আপনি কে?”

ভুরু তুললো সে, তবে কিছু বললো না। ভেবেছেন আপনার সাথে ব্ল্যাক রঞ্জুর সম্পর্কের কথাটা আমরা জানতে পারবো না?”

“আপনি কি পুলিশের লোক?” বিনয় বাবু ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো।

“আমার আসল পরিচয় জানতে পারলে আপনি পাজামা নষ্ট করে ফেলবেন।” বলেই কোমর থেকে সাইলেন্সরটা বের করে হাতে তুলে নিলো সে।”কোনো রকম চিৎকার চেঁচামেচি করবেন না।”

দু’হাত তুলে ভয়ে কাঁপতে লাগলো বাবু। “আপনি কি চান?”

“ব্ল্যাক রঞ্জুকে চাই।”

“তাকে আমি কিভাবে...?”

“তাই তো! আপনি তাকে কিভাবে আমার কাছে তুলে দেবেন। সে থাকে কোলকাতায়। ইচ্ছে করলেই তো আর সেখান থেকে তাকে এনে আমার কাছে তুলে দিতে পারবেন না, তাই না?”

বিনয় বাবু আতঙ্কভরা চোখে চেয়ে রইলো কেবল।

“তবে একটা উপায় অবশ্য আছে।”

“কি উপায়?” ঢোক গিলে জানতে চাইলো বাবু।

“রঞ্জুকে কোথায় পাবো সেটা বলে দিতে পারেন...খুব সোজা, তাই না?”

আরেকবার ঢোক গিললো বিনয় কৃষ্ণ বাবু।

“মিথ্যে ঠিকানা দিলে সমস্যা হবে, বিশাল বিপদে পড়ে যাবেন।” একটু থেমে আবার বললো সে, “ভাবছেন, আমি কিভাবে বুঝবো ঠিকানাটা সত্যি না মিথ্যে?” মুচকি হেসে মাথা দোলালো। “কোলকাতায় আমাদের লোক আছে, তারা যাচাই করে দেখবে।”

একটু থেমে ভালো করে বাবুর দিকে লক্ষ্য করে দেখলো সে। লোকটা কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

“ঝন্টু আমাকে সব বলেছে,” আস্তে করে কথাটা বলেই পিস্তলটা এবার সোজা বাবুর দিকে তাক করলো।

“আমি যদি রঞ্জুর ঠিকানা আপনাকে বলি তাহলে সে আমাকে...”

বাঁকা হাসি হাসলো বাস্টার্ড। “কি করবে?...আপনাকে মেরে ফেলবে?”

ভয়ার্ত চোখে চেয়ে রইলো বাবু।

দু’পাশে মাথা দোলালো সে। “মৃত মানুষ কিছু করতে পারবে না, বাবু।”

কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করে রইলো বাবু বিনয় কৃষ্ণ। “চায়না টাউন...মাউন্ট অলিম্পাস রেস্টুরেন্ট।” ...

বাস্টার্ডের চোখ দুটো চিকচিক করে উঠলো। এ নিয়ে তিনজন লোক এ কথা বললো। তার মানে এটাই রঞ্জুর আসল ঠিকানা।

হঠাৎ থুতু ফেলার শব্দ হতেই বাবু বিনয় কৃষ্ণ গোল গোল চোখে চেয়ে রইলো বাস্টার্ডের দিকে। তারপর আস্তে করে ঢলে পড়লো সোফায়। কোনো শব্দ বের হলো না। একেবারে নিঃশব্দে অগ্যস্ত যাত্রা করলো।

একটাই গুলি, আর সেটা ক্লোজ রেঞ্জে বিদ্ধ করেছে বাবুর কপালে।

ভালোভাবে সহযোগীতা করার পুরস্কার হিসেবে যন্ত্রণাহীন মৃত্যু উপহার দিয়েছে বাস্টার্ড।

গতকাল সন্ধ্যায় অফিস থেকে বের হবার আগেই হোমিসাইড প্রধান ফারুক আহমেদ জেফরি বেগকে জানিয়ে দিয়েছিলো আগামীকাল সকালে যেনো সে অফিসে না এসে সরাসরি চলে যায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের হেড অফিসে। কথাটা শুনে মনে মনে খুব খুশিই হয়েছিলো। তার ধারণা ছিলো না এতো দ্রুত কাজ হবে।

এখন সে স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান, তানভির আকবরের রুমে বসে আছে। তাকে বেশ উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে ভদ্রলোক। কাজকর্ম কেমন করছে, হোমিসাইডের কি অবস্থা, এফবিআই'এর ট্রেনিং কেমন ছিলো ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথা বলার পর কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে চলে গেছে।

অপেক্ষা করছে জেফরি। বুঝতে পারছে কাঙ্খিত রিপোর্টটা নিয়েই হয়তো ফিরবে তানভির আকবর।

পুরো দশ মিনিট পর ফিরে এলো ভদ্রলোক। তার হাতে একটি ম্যানিলা ফোল্ডার।

"সরি ফর লেট," অমায়িক হাসি দিয়ে নিজের ডেস্ক চেয়ারে ফিরে এলো তানভির আকবর। "আরেক কাপ চা খাবে?" . জেফরি সম্মতি দিলো স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধানের কথায়। বুঝতে পারছে ভদ্রলোকের চায়ের তেষ্টা পেয়েছে, তবে তার নিজের কথা বললে চা খাওয়ার কোনো ইচ্ছেই তার নেই। শুধুমাত্র ভদ্রলোককে সঙ্গ দেবার জন্যেই হ্যাঁ বলা।

ইন্টারকমটা তুলে দুকাপ চায়ের কথা বলে দিলো তানভির আকবর।

"আমাদের অফিস এখনও কম্পিউটারাইজড হয় নি, আশা করছি আগামী বছরের মধ্যে ইন্টেল রিপোর্টগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট কম্পিউটারাইজড করে ফেলতে পারবো।"

"ডিজিটাল ফর্মেটে ফাইল না থাকলে তো খুঁজে বের করাটা অনেক কষ্টকর হয়ে যায়, স্যার," বললো জেফরি।

"তাতো হয়-ই, তবে আমাদেরকে এখন সেমি-ডিজিটাল বলতে পারো।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো জেফরি বেগ।

"আমাদের এখানে শুধুমাত্র ফাইলগুলোর ট্যাগ নাম্বার আর সামান্য কিছু ডেসক্রিপশন কম্পিউটারে রাখি। এর ফলে খোঁজাখুঁজির কাজটা একটু সহজ হয়েছে। তবে পুরোপুরি ডিজিটাল হয়ে গেলে অনেক সুবিধা, সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।"

"তার মানে ফাইলগুলোর ইনডেক্স কম্পিউটারে রাখা থাকে?"

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলো তানভির আকবর। "তোমাদের মতো সার্চ ইঞ্জিন থাকা দরকার, বুঝলে?"

জেফরি মাথা নেড়ে সায় দিলো।

একজন পিয়ন এসে দুকাপ চা দিয়ে চলে গেলে স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান চোখেমুখে রহস্য এনে বললো, "ক্ষমতাসীন পলিটিশিয়ানরা, যারা দেশ চালায়, তারা নিজেদের নেতার নামে মাজার করতে বললে শত শত কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে দেবে মুহূর্তেই, আর সেই কাজের ফাইল এতো দ্রুত নড়বে যে মনে হবে সুপারসনিক গতিতে চলছে, কিন্তু জনগণের সরাসরি উপকারে আসে এরকম কিছুর কথা বললেই গরীব দেশ, টাকা নেই...বুঝলে? তাছাড়া গোয়েন্দা সংস্থার উন্নতি হোক এটা তারা চায়ও না।"

"কেন, স্যার?" জেফরির আসলে এ বিষয়ে জানার কোনো ইচ্ছেই নেই, তারপরও সৌজন্যের খাতিরে জানতে চাইলো।

"এতে করে তাদেরই বেশি সমস্যা হবে, ইউ নো...সারাক্ষণই তো ব্যস্ত থাকে কন্সপিরেসি নিয়ে, ভালো কাজ করে কটা?"

একান্ত অনিচ্ছায় দাঁত বের করে হাসলো জেফরি। তার চোখ বার বার যাচ্ছে তানভির আকবরের কাছে থাকা ম্যানিলা ফোল্ডারটার দিকে।

"চা নাও," নিজের কাপটা তুলে নিয়ে বললো সে।

চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে ছোট্ট করে একটা চুমুক দিলো জেফরি।

"ফারুক আমাকে বলেছে, তুমি নাকি মনে করছে গভর্মেন্টের কোনো এজেন্সি গোপন

অপারেশন চালাচ্ছে?"

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে সে বললো, "আমার সেরকমই সন্দেহ, স্যার।"

মাথা দোলালো তানভির আকবর। "আই ডোন্ট থিঙ্ক সো।" চায়ে একটু চুমুক দিয়ে আবার বললো ভদ্রলোক, "আমার কাছে সেরকম কোনো খবর নেই।"

"তাহলে আর কী হতে পারে?" প্রশ্নটা করেই আবার যোগ করলো জেফরি, "রর গ্রুপে কোন্দল?" বলেই মাথা দোলাতে লাগলো সে। "এখন পর্যন্ত সেরকম মনে হচ্ছে না।"

ব্ল্যাক রঞ্জু সম্পর্কে আমাদের অর্গানাইজেশনে তেমন কোনো ইন্টেল নেই। এর আগের সরকারের উপর মহলের সাথে রঞ্জুর বেশ ভালো ঘনিষ্ঠতা নাকি ছিলো। আমার ধারণা তখনই তার সম্পর্কে অনেক রিপোর্ট গায়েব করে ফেলা হয়। রিপোর্ট বলতে যা আছে তার প্রায় সবটাই চাঁদাবাজি, খুনখারাবি সংক্রান্ত, যেগুলো পত্রিকা মারফত সবাই জানে... পুরনো কিছু রিপোর্ট এখনও আছে কিন্তু ওগুলোকে জঞ্জাল বলতে পারো, তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না।"

জেফরি একটু হতাশ হলো। তাহলে কি রঞ্জু সম্পর্কে কোনো রিপোর্ট নেই? স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান কি এজন্যেই এতো ধানাইপানাই করছে, সরাসরি হতাশাজনক খবরটা দিতে চাচ্ছে না? একটু পরই হয়তো বলবে, দুঃখিত, ব্ল্যাক রঞ্জু সম্পর্কে সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের কাছে কোনো রিপোর্ট নেই। তাহলে সঙ্গে করে যে ম্যানিলা ফোল্ডারটা নিয়ে এলো সেটা কি?

"কিছু ভাবছো?"

জেফরি একটু চমকে উঠে বললো, "না।"

"বলছিলাম, ব্ল্যাক রঞ্জু সম্পর্কে তেমন কোনো রিপোর্ট নেই...বুঝলে?"

"জি, স্যার।" রিপোর্ট যদি না-ই থাকে তাহলে এতো আগডুম বাগডুম করার দরকার কি, ভাবলো জেফরি বেগ।

"তবে কিছু দিন আগে..." কথাটা বলেই এমন ভঙ্গি করলো স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান যেনো দেয়ালেরও কান আছে, আর অন্য কারোর কানে কথাটা পৌঁছাক সেটা চাচ্ছে না ভদ্রলোক। ...হাইলি সেন্সিটিভ পলিটিক্যাল একটা রিপোর্টে ব্ল্যাক রঞ্জুর নামটা চলে এসেছে, তানভির আকবরের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকালো ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ। "রিপোর্টটা হাইলি ক্লাসিফাইড, প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো হয়েছিলো। ইওর আইস অনলি? ক্যাটাগরির।"

একটু আশার আলো দেখতে পেয়েই আবার যেনো সেটা মিলিয়ে গেলো জেফরির কাছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে গোপন রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে সেটা কি তাকে দেখতে দেবে? মনে হয় না।

"রিপোর্টটা কি দেখা যাবে না, স্যার?" ধৈর্য আর রাখতে পারলো না সে।

মাথা নেড়ে মুচকি হাসলো তানভির আকবর। "যাবে।" নিজের চেয়ারে আবারো হেলান দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করার মতো ভঙ্গি করে বললো, "তোমার ভাগ্য ভালো। প্রথমত, তোমার বস্ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাছাড়া আর কিছু দিন পরই তত্ত্বাবধায়ক সরকার টেকওভার করবে। পলিটিক্যাল গভর্মেন্ট বিদায় নেবে। আমি হয়তো এখানে বেশি দিন আর থাকবে না। আগের সরকারের নিয়োগ কেয়ারটেকার সরকার রাখবে বলে মনে হয় না। আমি ধরে নিচ্ছি শীঘ্রই বদলি হয়ে যাচ্ছি। সুতরাং যাবার আগে বন্ধুর একটু উপকার করে গেলোম আর কি," বলেই হাসতে হাসতে ভদ্রলোক ম্যানিলা ফোল্ডারটা বাড়িয়ে দিলো জেফরির দিকে।

"থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার," ফোল্ডারটা হাতে নিয়ে বললো সে। খুলে ফেললো সেটা। বেশ মোটা একটি রিপোর্ট। স্পাইরাল বাইন্ডিং করা।

"ফাইলটা এখানেই পড়তে হবে," বললো তানভির আকবর।

চোখ তুলে তাকালো জেফরি। "জি, স্যার। ফারুক স্যার আমাকে এটা বলেছেন।"

প্রথম থেকে পড়তে শুরু করলো জেফরি বেগ।

কয়েক মিনিট পর তার দু'চোখ কুচকে গেলো। একেবারে ডুবে গেলো রিপোর্টের ভেতর। হোমিসাইডের সবচাইতে তুখোড় ইনভেস্টিগেটরকে স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান চেয়ারে

হেলান দিয়ে দেখতে লাগলো। যেনো বাচ্চা কোনো ছেলেকে তার প্রিয় খেলনা উপহার দিয়েছে, এরকম সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে তানভির আকবরকে।

একটানা বিশ মিনিটের মতো পড়ে গেলো রিপোর্টটা। মাঝেমধ্যে সামনে বসা তানভির আকবরের দিকে চোখ তুলে তাকালো সে। রিপোর্ট পড়া শেষ করে জেফরি দেখতে পেলো স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান ইঙ্গিতপূর্ণ চাহনি দিচ্ছে।

“একেবারেই পলিটিক্যাল ইন্টেল। বলতে পারো একটা কন্সপিরেসি বিল্ড আপ হচ্ছে। এরকম কন্সপিরেসি এ দেশে এর আগে হয়েছে কিনা জানি না। এই রিপোর্টে যা বলা হয়েছে তা যদি ঘটে তাহলে বলতে হবে ঐতিহাসিক একটি ঘটনার অপেক্ষায় আছি আমরা।”

“স্যার, এই রিপোর্ট প্রাইম মিনিস্টার দেখেছেন?”

মাথা নেড়ে সায় দিলো তানভির আকবর। “আগেই তো বলেছি, ‘ইওর আইস অনলি’ ক্যাটাগরির ছিলো।”

“তাহলে সরকারে পক্ষ থেকে কি পদক্ষেপ নেয়া হলো?”

একটু ভেবে নিলো স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান। “এরকম রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সরকার কি পদক্ষেপ নেবে সেটা আমাদের জানা সম্ভব নয়, যদি না সরকার আমাদেরকে কিছু বলে। গভর্মেন্টের অনেক অর্গানাইজেশন আছে, সরকার যদি কোনো পদক্ষেপ নিয়েও থাকে সেটা কাকে দিয়ে বাস্তবায়ন করবে তা জানা একটু কঠিনই। এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যাপার স্যাপার।”

“তার মানে বলতে চাচ্ছেন, কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয় নি?”

“সেটাও জোর দিয়ে বলতে পারছি না। আমার জানামতে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয় নি। তবে মনে রাখবে, এ সরকার কয়েক দিনের মধ্যে বিদায় নিচ্ছে, তারা হয়তো ঝামেলাটা কেয়ারটেকার সরকারের জন্যেই রেখে যাবে। এখন তো পুণরায় নিবার্চিত হবার চিন্তায় অস্থির তারা, এসব নিয়ে ভাবার সময় তাদের কোথায়?”

“কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে,” জেফরি জোর দিয়ে বললো।

“গোপন অপারেশনের কথা বলছো?”

“জি, স্যার।”

মাথা দোলালো তানভির আকবর। “এরকম কিছু হচ্ছে না সেটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। এরকম কিছু হলে আমাদেরকে অ্যালার্ট করে দেয়া হতো।”

“তাহলে?” কথাটা জেফরির মুখ ফসকে বের হয়ে গেলো।

“রিপোর্টটা তো দেখলে, এখন তোমার তদন্তের সাথে মিলিয়ে দ্যাখো, আসলে ঘটনা কি। আমার মনে হয় এটা জানার পর তোমার তদন্তে বেশ উপকারে আসবে।”

“অবশ্যই, স্যার। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।”

“ইটস ওকে।” কথাটা বলেই জেফরির কাছ থেকে ফোল্ডারটা নিয়ে নিলো স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান।

“স্যার?” জেফরি বললো।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো আকবর সাহেব।

“রিপোর্টে যাদের নাম আছে, মানে, হাসপাতালের ডাক্তার, কর্মচারী...তাদেরকে কি আমি জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবো?”

ভুরু কুচকে কিছুক্ষণ ভেবে নিলো তানভির আকবর। “আনঅফিশিয়ালি।” ফাইলটা একটু উপরে তুলে ধরলো ভদ্রলোক। “ঠিক এই ফাইলটা যেভাবে দেখলে। বাট, বি কেয়ারফুল। হাইলি সেন্সেটিভ অ্যান্ড ডার্টি পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স। কারো সাথে শেয়ার করা যাবে না।”

মাথা নেড়ে সায় দিলো ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ। যে কথা রিপোর্টে লেখা আছে সেটা যেকোনো থ্রীলার উপন্যাসের চেয়েও বেশি রোমাঞ্চকর।

বিশাল একটি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তাহলে।

জব চার্নকের কোলকাতা; এক সময়কার ভারতের রাজধানী। বহু ইতিহাসের সাক্ষী শহরটাতে পা রাখলো বাস্টার্ড।

বাবু বিনয় কৃষ্ণকে হত্যা করার পরদিনই কোলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হয় সে। সাতক্ষীরা শহরে পৌঁছেই কেরাণীগঞ্জ থানায় ফোন করে নিজের পরিচয় না দিয়ে জানিয়ে দেয়, কোথায় গেলে তারা কুখ্যাত সন্ত্রাসী রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ ঝন্টুকে খুঁজে পাবে। ঝন্টু হবে জেফরি বেগের জন্য একটা কানাগলি। উমার পেছনে না ছুটে এই ঝন্টুর পেছনে সময় নষ্ট করবে সে।

বর্ডার ক্রশ করে ভিসা-পাসপোর্ট ছাড়াই, তারপর বাসে করে সোজা চলে আসে সল্টলেক সিটির কাছে নতুন বাস টার্মিনালে। তার পুরনো আর বিশ্বস্ত এক লোক সীমান্ত পার করার কাজে তাকে সাহায্য করেছে। সল্টলেক থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে মির্জা গালিব স্ট্রীটে যখন এলো তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়।

মির্জা গালিব স্ট্রীটের ঠিক পাশে কিড স্ট্রীটের একটা মাঝারি মানের হোটেলে রাতটা কাটিয়ে দিলো সে। এ জায়গাটা তার অনেক বেশি চেনা। এর আগে যতোবার এসেছে এখানেই থেকেছে। মুসলিম অধ্যুষিত এই পুরনো এলাকাটি তার কাছে বিদেশ বলে মনে হয় না। তবে প্রয়োজনের পাশাপাশি আরেকটা বড় কারণ হলো, এখানে সুস্বাদু গরুর মাংসের কাবাব আর মগজ ভুনা পাওয়া যায়।

মির্জা গালিব স্ট্রীটের পাশেই নিউ মার্কেট আর গ্র্যান্ড হোটেল। হাঁটা দূরত্বে। আরো আছে এসপ্লানেড-মেট্রো স্টেশন, ইডেন গার্ডেন আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।

এটা এমন একটা জায়গা যেখান থেকে টাকা, অস্ত্র, ভুয়া দেশি পাসপোর্ট, সবই পাওয়া যাবে। বাংলাদেশ থেকে সড়কপথে যেসব বাস আসে তাদের বেশিরভাগের অফিসও এ এলাকায়। বিদেশ-বিভুয়ে অপারেশন চালানোর বেলায় এরকম পরিচিত জায়গা থেকে শুরু করাই ভালো।

রঞ্জু চায়না টাউনে থাকে কথাটা জানার পরই সে সিদ্ধান্ত নেয় খুব কাছে কোথাও থাকবে না। একটু দূরে থাকাই নিরাপদ হবে। কারণ কোলকাতায় রঞ্জুর দলটি কতো বড় সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই। আগে সে সম্পর্কে ভালো করে খোঁজ নিতে হবে, তারপরই রঞ্জুর কাছাকাছি চলে যাবে সে। এতো কাছাকাছি যে রঞ্জু কল্পনাও করতে পারবে না।

পরদিন সকালে একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠলো বাস্টার্ড। রুম সার্ভিসকে দিয়ে নাস্তা আনিয়ে খেয়ে নিলো।

সীমান্ত পাড়ি দেয়ার সময় সঙ্গে করে পিস্তলটা নিয়ে আসে নি, পাছে সাধারণ কোনো তল্লাশীর শিকার হলে সর্বনাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকতো। অস্ত্রসহ একজন বাংলাদেশি বিএসএফ'র হাতে গ্রেফতার হওয়া মানে নির্ঘাত কোনো জঙ্গিগোষ্ঠির সদস্য। শুধু যে গ্রেফতার করা হবে তা-ই নয়, মিডিয়াতে ফলাও করে ছবিসহ প্রচারও করা হবে।

তবে লাগেজের ভেতর নানান ফালতু জিনিসপত্রের মাঝে কৌশলে সাইলেন্সারটা নিয়ে এসেছে। গুলি আর পিস্তল চলে আসবে দুপুরের মধ্যে। তাকে যে ছেলেটা সীমান্ত পার করিয়ে দিয়েছে সে-ই এটা নিয়ে আসবে। ছেলেটা সঙ্গে করে নিয়ে আসতে চেয়েছিলো কিন্তু বাস্টার্ড মানা করেছে। তার সঙ্গী হিসেবে ছেলেটা ধরা পড়লেও তার সমস্যা হতো। বর্ডার পার হয়ে হাবড়া জেলা পর্যন্ত বাস্টার্ডকে সঙ্গ দিয়েছে ছেলেটা, তারপর ফিরে গেছে সীমান্তের ওপারে। বাস্টার্ড তাকে বলে দিয়েছে পরদিন সকালে যেনো সে আবার রওনা দেয় পিস্তলসহ।

বেলা যখন বারোটা বাজে তখন সে হোটেল থেকে বের হয়ে এলো। এই হোটেলে সে উঠেছে ভুয়া নামে, ভুয়া পরিচয়ে। সে কোনো বাংলাদেশী নয়। কোলকাতার বাইরে বাঁকুড়া জেলার পিনাকী দাস। এ নামে ভুয়া আইডি কার্ড তাকে সীমান্ত পাড়ি দেবার আগেই দিয়ে দেয়া হয়েছে।

অনেক দিন পর এসে দেখতে পেলো মির্জা গালিব স্ট্রীটটা যেনো কয়েক বছর আগের মতোই রয়ে গেছে। একটুও বদলায় নি। কিছুটা যদি বদলেও থাকে সেটা তার চোখে ধরা

পড়লো না। পুরনো কোলকাতা, পুরনোই রয়ে গেছে। শুধু ঝকমকে কিছু অত্যাধুনিক নিয়নসাইন জানান দিচ্ছে শহরের বাকি অংশ থেকে তারা মোটেও পিছিয়ে নেই। বাস্টার্ডের কাছে মনে হলো বুড়ো মানুষের হালফ্যাশনের পোশাক পরার মতো ব্যাপার এটি, হাস্যকর।

কিছু জামাকাপড় আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে কিনতেই দুপুরটা পার হয়ে গেলো। একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এলো হোটেলে। ফ্রন্ট ডেস্কের লোকটা তাকে দেখেই বললো, "পিনাকী বাবু, আপনাকে খুঁজতে এক লোক এসেছিলো একটু আগে।"

"নাম বলেছে?"

"হ্যাঁ, মৃদুল। বলে গেছে শ্যামলী পরিবহনের অফিসে আছে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।" বাস্টার্ড এইমাত্র কেনা জিনিসগুলো রুমে রেখেই আবার বেরিয়ে গেলো।

মৃদুল নামের লোকটাই তাকে বর্ডার পার করিয়ে দিয়েছে। ভুয়া আইডি কার্ডও জোগাড় করে দিয়েছে সে। আরো কিছু জিনিস জোগাড় করে দেবার কথা।

কিড স্ট্রীটের একটা পুরনো তিনতলা বাড়িতে শ্যামলী পরিবহনের অফিস, নীচতলায় কাউন্টার, দোতলায় অফিস আর তিন তলায় যাত্রিদের বিশ্রাম নেবার জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে পুরোটা ফ্লোর। বাস্টার্ড সোজা চলে গেলো তিন তলায়। ঢুকতেই দেখা হয়ে গেলো মৃদুলের সাথে।

"বস্, কোথায় গেছিলেন?" দাঁত বের করে হেসে বললো ত্রিশ বছর বয়সের মৃদুল কান্তি সরকার।

"একটু কাপড়চোপড় কিনতে গেছিলাম।"

"এখানেই কথা বলবেন, নাকি আপনার রুমে?"

বাস্টার্ড ঘড়িতে দেখলো প্রায় দুটো বাজে। লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। "দুপুরে তো খাও নি, তাই না?" মৃদুল শুধু হাসলো। "চলো, আগে কিছু খেয়ে নেয়া যাক।"

শ্যামলী পরিবহণের অফিস থেকে পঞ্চাশ গজ দূরত্বেই বাংলাদেশী মালিকানায় দুটো হোটেল আছে : রাধুনী আর কস্তরী। বাস্টার্ড ঢুকে পড়লো রাধুনীতে।

খেতে খেতেই কথা হলো তাদের।

"সিম কিনেছো?" জানতে চাইলো সে।

মাথা নাড়লো মৃদুল। তার মুখে খাবার। একটু পর খাবারটা গিলে বললো, "মাত্র এলাম, বিকেলের আগেই পেয়ে যাবেন।"

"একটা প্রাইভেটকার ভাড়া নিতে হবে। চার দিনের জন্যে।"

"হয়ে যাবে, বস।" খাবারের দিকে থেকে মনোযোগ না সরিয়েই বললো মৃদুল।

"আমি চাই তুমি আরো দুটো দিন থেকে যাও।"

গোগ্রাসে খাবার খেতে খেতে মৃদুল মুখ তুলে তাকালো। "তাই?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো বাস্টার্ড।

"ঠিক আছে," কথাটা বলেই আবার খাওয়াদাওয়ায় মনোযোগ দিলো মৃদুল। অনেকটা পথ ভ্রমণ করেছে, প্রচুর খিদে ছিলো।

মুচকি হাসলো বাস্টার্ড। ছেলেটা তার খুবই বিশ্বস্ত। প্রায় আট বছর ধরে পরিচয় তার সাথে। দক্ষিণবঙ্গে সর্বহারা পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলো। অন্য এক লোকের মাধ্যমে তার সাথে এই ছেলের পরিচয়। বাস্টার্ড তাকে ঢাকা শহরে নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলো প্রায় চার-পাঁচ মাস। সেই থেকে তাদের মধ্যে গাঢ় সম্পর্কের সূচনা। মৃদুল আর এখন সর্বহারাদের সাথে নেই। সীমান্তে অবৈধভাবে লোকজন পার করা, জাল পাসপোর্ট তৈরি করে দেয়া, অস্ত্র চালান ইত্যাদি কাজ করে। তার প্রায় সব আত্মীয়স্বজন থাকে কোলকাতা, হাওড়া এবং বাঁকুড়া জেলায়। মির্জা গালিব স্ট্রীটেও মৃদুলের ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয় থাকে, বাস্টার্ড ইচ্ছে করলে সেখানেও থাকতে পারতো কিন্তু রাজি হয় নি। তার দরকার একদম অচেনা জায়গা। সুতরাং ছিমছাম কোনো হোটেলে ওঠাই ভালো।

মৃদুলের খাওয়া শেষ। বাস্টার্ডের শেষ হয়েছে তারও আগে।

“বস, জিনিসটা কি এখানেই নেবেন?” হাত মুছতে মুছতে বললো সে।

“তোমার সঙ্গে আছে?” মাথা নেড়ে সায় দিলো মৃদুল। “ওয়াশরুমে চলে যাও। আমি আসছি।”

মৃদুল চুপচাপ ওয়াশরুমে চলে গেলে বাস্টার্ড কিছুক্ষণ পর উঠে গেলো।

সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পিস্তল আর গুলির প্যাকেটটা ওয়াশরুমেই অদলবদল করে নিলো তারা। তারপর যেভাবে গিয়েছিলো ঠিক সেভাবেই ফিরে এলো এক এক করে।

“তাহলে আমাকে দু’দিন থাকতে হবে?” মৃদুল বললো।

“হ্যাঁ।”

“আমি আমার মাসির বাড়িতেই উঠি, কি বলেন?...আপনার কাছাকাছি থাকা গেলো, দরকার হলেই দেখা করা যাবে।”

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

“আমি এখন যাই, সিম কিনে ট্যাক্সি ঠিক করে আসছি। আপনি তো রুমেই থাকবেন, না?”

“হ্যাঁ।” কথাটা বলেই বাস্টার্ড পকেট থেকে কিছু বংলাদেশি টাকা বের করে দিলো। “এখানে পঞ্চাশ হাজার আছে, ইন্ডিয়ান কারেন্সি করে নিও। পাঁচ হাজার রেখে দিও তোমার কাছে।”

টাকাগুলো পকেটে রেখে দিলো মৃদুল। “ওকে, বস।”

রাধুনী রেস্তোরাঁ থেকে সোজা নিজের রুমে ফিরে এলো বাস্টার্ড। আবারো বিশ্রাম নেবে। তার কাঁধের ক্ষতস্থানে যে ব্যান্ডেজটা আছে সেটা খুলে নতুন করে ড্রেসিং করতে হবে। হোটেলে ফেরার পথে একটা ওষুধের দোকান থেকে কিছু তুলা, কটনটেপ আর অ্যান্টিসেপটিক লোশন কিনে নিলো। শারিরীক যন্ত্রণাকে সে কখনই পাত্তা দেয় না, কিন্তু ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করাটা যে জরুরি সেটা সে জানে। এই গুলির আঘাতটা নিয়েই তো কতো কাজ করে ফেললো। কেউ বুঝতেও পারলো না তার কাঁধে গুলির ক্ষত রয়েছে।

নিজের রুমে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে বসে যখন নতুন করে ড্রেসিং করতে লাগলো তখন আচমকাই উমা নামের মেয়েটির কথা মনে পড়ে গেলো তার। মেয়েটা কোথায় আছে, কেমন আছে সে জানে না। পুলিশ নিশ্চয় তাকে এতো সহজে ছেড়ে দেয় নি। অবশ্য মেয়েটা যদি তার কথামতো কাজ করে থাকে তাহলে বেঁচে যাবে।

মাথা থেকে চিন্তাটা জোর করে বাদ দেয়ার চেষ্টা করলো। তাকে এখন অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে।

ব্ল্যাক রঞ্জু।

তারা এখন একই শহরে আছে। ঢাকায় পুলিশ আর হোমিসাইড তার পেছনে হন্যে হয়ে লেগেছিলো কিন্তু এখানে সে চিন্তা নেই। এখন ধীরেসুস্থে পরিকল্পনা করে এগোতে পারবে।

রঞ্জুর খুব কাছে চলে এসেছে। আস্তে আস্তে তার সুরক্ষিত জগতটা ভেদ করে ঢুকে পড়ছে সে। ঘুণাক্ষরেও রঞ্জু বুঝতে পারছে না তার মৃত্যুদূত এ শহরে পা রেখেছে আজ।

চায়না টাউনের একটি ব্যস্ত রেস্তোরাঁর চার তলায় কারা থাকে সে সম্পর্কে আশেপাশের লোকজনের কোনো ধারণাই নেই। দোতলাটি রিজার্ভ স্পেস হিসেবে ব্যবহৃত হয় আর তিন তলায় রেস্তোরাঁর কর্মচারিরা থাকে। তবে রেস্তোরাঁর লোকজন জানে চার তলায় থাকে স্বয়ং মালিক। বিশাল স্পেসটা তিনি নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছেন। ভোগ-বিলাসের প্রায় সব উপকরণই ওখানে আছে।

যে কেউ ইচ্ছে করলেই ওখানে যেতে পারে না। অবশ্য এ নিয়ে আশেপাশে কেউ মাথাও ঘামায় না, কারণ চায়না টাউনের এই এলাকাটিতে যে কয়টি রেস্তোরাঁ আছে তার প্রায় সব কটির মালিকই রেস্তোরাঁর উপরে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করে। " একতলা থেকে দোতলা আর তিন তলায় যাওয়ার যে সিঁড়িটা আছে সেটা দিয়ে চার তলায় যাওয়া যায় না। কিন্তু ঠিক কোন সিঁড়িটা দিয়ে চার তলায় পৌঁছানো যায় সেটা খুব কম মানুষই জানে।

এ মুহূর্তে চার তলার পরিবেশ স্বজন হারানো শোকে থমথম করছে। গুমোট আর স্তব্ধ। গোঁফওয়ালা লোকটা প্রচুর মদ পান করে জানালার সামনে একটা চেয়ার নিয়ে বসে আছে। সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে, পানাহারপ্রিয় লোকজন আসতে শুরু করেছে চায়না টাউনে। নীচের রেস্তোরাঁটা কিছুক্ষণের মধ্যেই সরগরম হয়ে উঠবে।

জানালার পাশে বসা লোকটার হাতে জ্যাক ড্যানিয়েলের একটা বোতল। অর্ধেকটা খালি হয়ে গেছে এরইমধ্যে। তার ঠিক পাশেই বসে আছে তার প্রায় সমবয়সী কালো কুচকুচে এক লোক। তার ঠোঁটে সিগারেট।

লম্বা একটা টান দিয়ে সিগারেটটা সামনের টেবিলে রাখা অ্যাস্ট্রে'তে গুঁজে রেখে বললো সে, "আমাদের কেউ কোনো খবর দিতে পারছে না?"

জানালার সামনে বসা লোকটা নীচের রাস্তা থেকে চোখ সরালো না। "বিনয় বাবুর কথা তো কেউ জানতো না," একটু থেমে আবার বললো সে, "ঝন্টু ছাড়া।"

"তাহলে তোমার ধারণাই ঠিক, ঝন্টু শেষ," পাশে বসা লোকটি বললো।

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "কাজটা কে করছে, কারা করছে আমরা কেউ জানি না, তাই না?" একই রকম উদাস দৃষ্টি তার।

বলা হলো তার কাছেও এর কোনো জবাব নেই। তার ধারণা প্রশ্নকর্তা নিজেও এটা জানে না।

বোতল থেকেই ঢকঢক করে কিছুটা পান করে নিলো জানালার সামনে বসা লোকটি। পাশে বসা লোকটি কিছু বললো না। তার বন্ধু যে বেশি পান করে ফেলেছে সেটা সে জানে।

"না জেনে কোনো কিছু করা যাবে না।" বোতল থেকে আবারো কিছুটা পান করে নিলো সে। "এখানে বসে বসে কিছু জানাও সম্ভব না।" আপন মনেই বলতে লাগলো সে।

"মনে হচ্ছে তুমি আজ একটু বেশি খেয়ে ফেলেছে, তার হাতের বোতলের দিকে ইঙ্গিত করে বললো পাশে বসা তার বন্ধু।

মাথা দুলিয়ে কথাটা বাতিল করে দিলো সে। "বেশি খেলেই আমার মাথাটা খুলে যায়। জানালা থেকে মুখটা সরিয়ে তাকালো বন্ধুর দিকে। কিছু দিন পরই বিরাট একটা অপারেশনে নামতে হবে আমাদেরকে। ঐ কাজটা ভালো ভালোয় শেষ করলে আমরা শুধু দেশেই ফিরতে পারবো না, আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবো। ক্রশফায়ারের ভয়ে বিদেশে পড়ে থাকার দিন শেষ হবে। পুলিশও আমাদের কিছু করতে পারবে না"

"তাহলে কি করতে চাও?"

"আমি ঢাকায় যাবো।"

আৎকে উঠলো তার বন্ধু। এই সময়?"

গর্দভ! মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বাইরের রাস্তার দিকে চেয়ে মনে মনে বললো সে। মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করতে করতে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। "ভুলে গেছো, আমার কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা তোমাকে নিয়ে!"

চুপ মেরে রইলো তার বন্ধু। কথাটা সত্যি।

“আমি ঢাকায় গিয়ে সব গুছিয়ে নেবো...কাজটা কে করছে সেটাও জেনে নিতে পারবো।”

বিকেলের মধ্যেই মৃদুল এসে সিম কার্ড দিয়ে গেলো। একটা প্রাইভেটকার ঠিক করে ফেলেছে সে, বাস্টার্ড চাইলে ড্রাইভারের সাথে যোগাযোগ করে যখন তখন গাড়িটা ব্যবহার করতে পারবে। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত গাড়িটা পাওয়া যাবে। চাইলে আরো কিছুটা সময়ও বাড়তি পাবে যদি সে চায়।

মৃদুল চলে যাবার পরই বাস্টার্ড ড্রাইভারকে ফোন করে তার হোটেলের কাছে আসতে বললো। সন্ধ্যার পর কোনো চায়নিজ রেস্তোরাঁয় খাবার খাওয়া যাবে সেইসাথে জায়গাটাও দেখে আসা যাবে।

চায়না টাউনে যখন পৌঁছালো তখন সন্ধ্যা হয় হয়। এক জায়গায় এতোগুলো চায়নিজ রেস্তোরাঁ সম্ভবত খুব কম জায়গায়ই আছে। এখানকার সবগুলো চায়নিজ রেস্তোরাঁয় মদ-বিয়ার পাওয়া যায়। কোলকাতা শহর হচ্ছে মদ-বিয়ারের জন্য উন্মুক্ত। সবচাইতে বড় কথা, চায়না টাউনের বেশিরভাগ রেস্তোরাঁর মালিক চীনাবংশোদ্ভূত। ইদানিং মালিকানা বদল হয়ে কিছু স্থানীয় লোক এই ব্যবসায় ঢুকে পড়েছে। মাউন্ট অলিম্পাস সেরকমই একটি রেস্তোরাঁ।

রেন্ট-এ-কারটা বেশ ঝকঝকে একটি টয়োটা লেক্সাস। দেখে মনে হবে না, এটা কোনো ভাড়া করা গাড়ি। মৃদুল ছেলেটা যে কাজের সেটা বুঝতে পারলো। ড্রাইভার লোকটির নাম যাদব। সম্ভবত বিহারের। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে। বাস্টার্ড এখন পিনাকী দাস। বাঁকুড়া জেলার উঠতি এক ব্যবসায়ী।

ড্রাইভার যখন জানতে চাইলো কোথায় নামবে, বাস্টার্ড তাকে মাউন্ট অলিম্পাস রেস্তোরাঁর কথা বললো। হ্যাঁ, সে চেনে। ওটা খুব ভালো রেস্তোরাঁ।

চায়না টাউনের মেইন রোড থেকে ডান দিকে যে রাস্তাটা চলে গেছে তাদের গাড়িটা সেখানে ঢুকে পড়লো। কিছু দূর যাবার পর সারি সারি চায়নিজ রেস্তোরাঁর সামনে থামলো গাড়িটা। বাস্টার্ড জানালার কাঁচ দিয়ে দেখতে পেলো মাউন্ট অলিম্পাস-এর সামনেই গাড়িটা থেমেছে।

ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

ভেতরটা বেশ বড়, কততগুলো পিলার ছাড়া এটা বড়সড় হলরুমের মতো। ডান দিকে লম্বা একটা বার চলে গেছে। কম পক্ষে চল্লিশ ফিট দৈর্ঘের। বাম দিকে, সারি সারি রাউন্ড আর স্কয়ার টেবিল পাতানো। একটা পার্টিশানের ওপাশে কতোগুলো সোফা পাতা আছে। এটা হলো লাউঞ্জ। সব মিলিয়ে একেবারে আধুনিক একটি রেস্তোরাঁ। সন্ধ্যার মাত্র শুরু অথচ লোকজন নেহায়েতই কম নয়। বাস্টার্ড বুঝতে পারলো রেস্তোরাঁটা পসার ঘটেছে ভালোমতোই।

এককোণের একটি ছোট্ট রাউন্ড টেবিলে গিয়ে বসলো সে। তরুণ ওয়েটার মেনু দিয়ে গেলে গভীর মনোযোগের সাথে দেখতে লাগলো, তবে তার আসল মনোযাগ রেস্তোরাঁরর ভেতরের পরিবেশের দিকে।

ফিশরোল আর দুটো বিয়ারের অর্ডার দিলো। খুব একটা খিদে নেই। শুধু সময় পার করতে হবে। এখানে এক ঘণ্টার মতো থাকার ইচ্ছে তার।

কাস্টমারদের বেশিরভাগই যুগল। প্রেমিক-প্রেমিকা, স্বামী-স্ত্রী কিংবা অন্য কিছু। তবে কয়েক জন পুরুষ আর মহিলাকে দেখতে পেলো একা বসে আছে। কারোর জন্য অপেক্ষা করছে পুরুষগুলো, কিন্তু মেয়েগুলোর ব্যাপারে সে কথা বলা যাবে না।

খেয়াল করলো তার ঠিক পাশের টেবিলেই এক সুদর্শন যুবক বসে আছে। চেনা চেনা লাগলো। হ্যাঁ, ধরতে পেরেছে। এখানকার টিভি'তে ছেলেটা অভিনয় করে। নায়ক। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শেভ করে নি। তার সামনে ম্যাকডাওয়েলের আস্ত একটি বোতল। পান করে যাচ্ছে। দেখে মনে হলো হতাশাগ্রস্ত।

ফিশরোল আর বিয়ার এসে পড়লে একটা গ্লাসে বিয়ার ঢেলে ছোটো ছোটো চুমুক দিতে লাগলো সে। তার নজর ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিরামহীন। তিন-চারজন তরুণীর দিকে চোখ পড়লো। একা বসে আছে তারা। বাস্টার্ড জানে এরা কেন বসে আছে।

চায়না টাউনের এসব রেস্তোরাঁয় এরকম মেয়েদের দেখা যায় সব সময়। কোন্ রেস্তোরাঁর মেনু ভালো, খাবারের মান ভালো তার সাথে সাথে এরকম কতো সুন্দর আর স্মার্ট মেয়ে আছে সেটাও বিবেচ্য বিষয়। বাস্টার্ড শুনেছে আজকাল নাকি এই লাইনে কিছু যুবকও নেমেছে, তবে সেরকম কাউকে দেখতে পেলো না।

নিঃসঙ্গ কাস্টমারকে সঙ্গ দেয়াই এদের কাজ। তবে নিছক সঙ্গ থেকে ব্যাপারটা আরো বেশি দূরও গড়াতে পারে দু'জনের বোঝাপড়ার মাধ্যমে। একটু দূরে এরকমই এক মেয়ে বসে আছে, তার সাথে বার কয়েক চোখাচোখি হলো। মুচকি হাসলো বাস্টার্ড। সে নিঃসঙ্গ থাকতে চায় না।

অন্য একটা খালি গ্রাসে বিয়ার ঢেলে রেখে দিয়ে নিজের গ্লাসে চুমুক দিলো। দেখতে পেলো মেয়েটা মুচকি হেসে নিজের টেবিল থেকে উঠে আসছে।

"বসতে পারি?" মিষ্টি কণ্ঠে বললো মেয়েটি। মাথা নেড়ে সায় দিলো বাস্টার্ড। "থ্যাঙ্কস।" মেয়েটা গ্লাসের বিয়ার তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিলো। "ওয়াইন চলে না?"

আন্তরিক একটা হাসি দিয়ে বললো বাস্টার্ড, "এততক্ষণ চলে নি, এখন মনে হচ্ছে চলবে।"

"দ্যাটস গুড," মেয়েটা চোখ নাচিয়ে বললো।

ওয়েটারকে ওয়াইনের অর্ডার দিয়ে দিলো বাস্টার্ড।

"নাম কি, মিস্টার?"

"পিনাকী।"

"টাইটেল বলতে সমস্যা আছে?" আবারো চোখমুখ নাচিয়ে বললো মেয়েটি।

"কাস্ট নিয়ে ম্যাডামের রিজাভেশন আছে নাকি?" পাল্টা বললো সে।

"ওহ্ নো। ওসব ফালতু জিনিস নিয়ে মিস টুম্পা মাথা ঘামায় না।"

"তাহলে ম্যাডামের নাম টুম্পা," মুচকি হেসে বললো বাস্টার্ড।

"নো ম্যাডাম, বড় বিচ্ছিরি লাগে...জাস্ট টুম্পা।"

"ওকে, টুম্পা..." বিয়ারে এক চুমুক দিয়ে বললো বাস্টার্ড। এখানে এলে কি তোমাকে পাওয়া যাবে?"

"ওমা, আমাকে পেতে চাও নাকি," কথাটা বলেই ভুরু নাচালো টুম্পা।

"আমি আরো এক সপ্তাহ কোলকাতায় আছি, এই এক সপ্তাহ চাচ্ছি আর ....

ভুরু কুচকে মেয়েটা বললো, "ও তুমি কোলকাতায় থাকো না?"

"দিল্লি," বিয়ারে আরেকটু চুমুক দিলো সে। "বারো বছর ধরে ওখানেই আছি। ব্যবসার কারণে।"

"দ্যাটস গুড," বললো টুম্পা, "দিল্লির কোথায় থাকো গো?"

দিল্লির যে জায়গাটা সবচাইতে বেশি চেনে সেটার কথাই বললো। "কনৌট প্লেস।"

"আচ্ছা," আবারো ভুরু নাচালো টুম্পা। "তো সাতদিনই কি আমাকে চাচ্ছো, মি: পি?" মুখ টিপে হাসলো মেয়েটি।

"তোমার কি কোনো সমস্যা আছে?"

"আগে দেখি তুমি আমার সাথে কেমন বিহেইভ করে তারপর ভাববো, বুঝলে?" রহস্য করে বললো।

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "ওকে।"

"কোথায় নিয়ে যাবে আমায়?"

একটু ভাবলো বাস্টার্ড। "এখানে তো আমার পরিচিত কোনো জায়গা নেই, আমি উঠেছি হোটেলে..."।

"আমি কিন্তু হোটেলে যাই না," ন্যাকামি করে বললো মেয়েটি।

টাকা দিলে তুমি হোটেলে কেন জাহান্নামেও যেতে রাজি হবে, মনে মনে বললো বাস্টার্ড। "তাহলে তুমিই আমাকে কোথাও নিয়ে চলো?"

একটু ভাবলো মেয়েটি। “উমমম...আমার এক পিসাত বোন আছে, ওর ওখানে যাওয়া যায়, বাট ওর রুমটা ব্যবহার করার জন্য ওকে এক হাজার টাকা দিতে হবে।”

“নো প্রবলেম,” মেয়েটার দিকে একটু ঝুঁকে বললো, “আর তোমাকে?”

“পাঁচ।”

মাথা দোলালো বাস্টার্ড। “একটু বেশি হয়ে গেলো না? আমি কিন্তু সাত দিন তোমাকে চাই। বুঝতে পেরেছো?”

“পুরো সাত দিন! ওয়াও, আমাকে এতো মনে ধরে গেছে!” মেয়েটাও একটু ঝুঁকে এলো তার দিকে। “দেন, ফোর থাউজেন্ড। জাস্ট ফর ইউ। ওকে, মি: পি?”

“ওকে,” একটু থেমে আবার বললো সে, “কোথায় নিয়ে যাবে?”

“ভয় পেয়ো না, খুব বেশি দূরে নিয়ে যাবো না গো।”

“এই রেস্তোরাঁটা আমার খুব ভালো লেগে গেছে, এর কাছাকাছি হলেই আমার জন্যে ভালো হয়, বাস্টার্ড বললো।

“তাই বুঝি?” ন্যাকামি করে বললো টুম্পা। “যাও, তাহলে তোমাকে বেশি দূরে নিয়ে যাবো না। সত্যি বলতে কি জানো, আমার পিসাতো বোনের বাড়িটা খুব কাছেই।”

“দ্যাটস ভেরি গুড।” কথাটা বলেই মেয়েটার গালে আঙুল দিয়ে আলতো করে টোকা দিলো। “তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমার কাজিন এই রেস্তোরাঁর উপরেই থাকে,” বলেই হেসে ফেললো সে।

“কেন, এর উপরে হলে তোমার কি অসুবিধে হবে?”

“তুমি থাকলে কোথাও আমার অসুবিধে হবে না।” আবারো মেয়েটার গালে টোকা দিলো।

“কী ব্যাপার, এখানেই শুরু করে দেবে নাকি?” কপটভাবে বললো টুম্পা।

হাতটা সরিয়ে নিলো বাস্টার্ড। “বললে না না। তো কোথায় যাচ্ছি?”

“কেন, তর সইছে না বুঝি?” মুখ টিপে হেসে ফেলো মেয়েটি।

“অনেক দিন পর তো, তাই সইছে না,” কাটাচামচে একটা ফিশরোল তুলে মেয়েটার মুখের কাছে ধরলো। “কাছে কোথাও হলে চলো এখনই চলে যাই।”

“ডোন্ট অরি, খুব কাছেই যাবো,” ফিশরোলটা মুখে পুরে বললো টুম্পা নামের মেয়েটি।

“উপরে?” ছাদের দিকে ইঙ্গিত করে বললো বাস্টার্ড।

“আরে না।”

“কেন, ওখানে এসব চলে না?”

“ওখানে আরো বেশি চলে,” বলেই রহস্য করলো টুম্পা।

“বেশি?”

“এই রেস্তোরাঁটার মালিক চার তলায় থাকে। ও আর ওর বন্ধুর নিত্য নতুন মেয়ে চাই।”

“তাই নাকি?”

“আর বোলো না, মালিকের বন্ধুটা হাড়ে হাড়ে বদমাশ, মাঝেমধ্যে একসাথে দুটো মেয়েকে নিয়ে ঢোকে।”

“দুটো!?”

“আর বলছি কী,” এবার নিজেই একটা ফিশরোল তুলে নিলো টুম্পা। “আমার বান্ধবী শিমকি কি বলেছে, জানো?” বাস্টার্ড সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। “বলেছে, লোকটা নাকি এক ঘন্টা সময় নেয়।”

ভুরু কপালে তুলে বিস্মিত হবার ভান করলো সে। শিমকি? ঠিক আছে। “বাপরে!” তারপর মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলো, “ওর ওয়াইফ থাকে না?”

মাথা দোলালো মেয়েটি। মুখে ফিশরোল, তাই কথা বলতে পারলো না। “বিয়ে করে নি তো।”

“একা থাকে?”

“না, বললাম না, ওর এক বন্ধুও থাকে। বন্ধুটা বদমাশ হলেও মালিক লোকটা অতোটা

খারাপ নয়।"

"কেন, তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করে বুঝি?"

"তা করে বৈ কি...আমার সাথে যারা রাফ বিহেইভ করে আমি তাদের সাথে যাই না।"

"তুমি কি ওর সাথে যাও?"

"ছি ছি, এসব নিয়ে কথা বলছো কেন, অন্য কিছু নিয়ে বলো।" কপট লজ্জা পাবার ভান করলো মেয়েটা। "ও কাউকে নেয় না, সুষমাই ওর রেগুলার।"

"সুষমা? ... তোমার বান্ধবী?"

"হ্যাঁ," এবার এক ঢোক বিয়ার খেলো মেয়েটি। "অনেক সুন্দরী, দেখলে তোমারও মাথা খারাপ হয়ে যাবে..."

ভুরু কপালে তুললো বাস্টার্ড। "তাহলে তো মাথা খারাপ করতে হয়!"

"বাব্বা, আমাকে দেখে মন ভরছে না, বুঝি? তোমরা পুরুষেরা একজনে খুশি থাকো না, সবগুলো একরকম," অভিমানী সুরে বললো টুম্পা।

"ঠিক আছে যাও, দেখবো না। শুধু তোমাকে দেখবো।" বাস্টার্ড একদৃষ্টে চেয়ে রইলো মেয়েটার দিকে।

"ওলে বাব্বা, এ দেখি অভিমানও করে!" হেসে বললো টুম্পা। "আগে তোমার সাথে মিশি তারপর দেখা যাবে, ঠিক আছে?"

মেয়েটার থুতনী ধরে বললো, "ঠিক আছে।"

এরপর তারা কয়েক পেগ মদ পান করে টুকটাক গল্পগুজব করলো। রাত আটটার পর দুজনে একসাথে বের হয়ে গেলো মাউন্ট অলিম্পাস থেকে বের হবার আগে টয়লেটে গিয়ে বাস্টার্ড রেন্ট-এ-কারের ড্রাইভারকে ফোন করে বলে দিলে চলে যেতে। কাল সকালে জানাবে কখন কোথায় আসতে হবে।

টুম্পা যে বিল্ডিংটাতে ঢুকলো সেটা মাউন্ট অলিম্পাস থেকে খুব কাছে। চার তলার একটি ফ্ল্যাটে ঢোকার আগেই টুম্পা নামের মেয়েটি তার তথাকথিত পিসাতো বোনকে ফোন করে বলে দিলো তারা আসছে।

চারতলার ফ্ল্যাটে ঢোকার আগে বাস্টার্ড ঘুণাক্ষরেও জানতো না এই ফ্ল্যাট থেকে সে কী দেখতে পাবে।

বেডরুমের দক্ষিণমুখী বিশাল জানালা দিয়ে যখন বাইরে চোখ রাখলো অবাক হয়ে দেখতে পেল মাউন্ট অলিম্পাস রেস্তোরাঁর চার তলার ফোরটি

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে।

এটাকে কী বলা যেতে পারে...

সৌভাগ্য?

জেফরি বেগ গোয়েন্দা রিপোর্ট পড়ে যা জানতে পেরেছে সেটা একেবারেই অভূতপূর্ব ঘটনা। একটা সন্ত্রাসী চক্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের তদন্তের সাথে এর কোনো মিলই নেই, অথচ কী গভীর কানেকশানই না আছে। অদ্ভুত!

আরেকটু তদন্ত না করে ব্যাপারটা কারো সাথে শেয়ার করা যাবে না। আরো কিছু বিষয় স্পষ্ট হওয়ার দরকার আছে। তার আগ পর্যন্ত পুরো বিষয়টা নিজের মধ্যেই রাখতে হবে। এমনকি তার সহকারী জামানকেও জানানো যাবে না। সে চায় না এই নোংরা ষড়যন্ত্রের সাথে খামোখা কেউ জড়িয়ে পড়ুক। বিস্ফোরকের মতো একটি তথ্য।

একটানা দুই ঘণ্টা নিজের অফিসে বসে বসে ভেবে যাচ্ছে ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ। পুরো তদন্তটি ধাপে ধাপে সাজিয়ে নিতে হবে, তার আগে কিছু বিষয় সম্পর্কে আরো স্পষ্ট জানতে হবে তাকে। সমস্যা হলো এসব বিষয় জানা মোটেও সহজ কাজ হবে না।

প্রধানমন্ত্রীকে যদি রিপোর্টটা জানানো হয়েই থাকে তাহলে তিনি এ বিষয়ে পরবর্তী কি পদক্ষেপ নিয়েছেন, সেটা তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবে অনুমাণ করতে পারে সে। কিছু সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী কিছু নাও করতে পারেন। যেমনটি ধারণা করছেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান। পুরোটাই কেয়ারটেকার সরকারের উপর ছেড়ে দেবেন।

তিনি হয়তো অন্য কোনো গোয়েন্দা সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করিয়েছেন। তবে সেই তদন্তের ফলাফল তারপক্ষে জানা সম্ভব হবে না।

প্রধানমন্ত্রী নির্দিষ্ট কিছু দিক নির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন যা বাস্তবায়ন করবে কেয়ারটেকার গভর্মেন্ট। সেক্ষেত্রেও আগাম কিছু জানা অসম্ভব।

কিন্তু সবইতে সহজ কাজ কোনটা?

যাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তাদেরকে জানিয়ে দেয়া!

হ্যাঁ। এটাই সবচাইতে সহজ আর কার্যকরী ব্যবস্থা।

কিন্তু এই সহজ কাজটা করা হয়েছে কিনা সেটাই এখন প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলে সিদ্ধান্তে আসাটা সহজ হয়ে যেতো।

"স্যার, আসতে পারি," জামানের কথায় তার চিন্তায় ছেদ পড়লো।

"আসো।"

জামান তার ডেস্কের সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললো, "স্যার, কেরাণীগঞ্জ থানার পুলিশ রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ ঝন্টু নামের একজনকে রিকভারি করেছে।"

"রিকভারি করেছে মানে?" অবাক হয়ে জানতে চাইলো জেফরি বেগ।

"অজ্ঞাত এক লোক ফোন করে জানায় বন্ধ হয়ে যাওয়া এক পাটকলে রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ লোক ঝন্টু আছে। পুলিশ ওখান থেকে হাত-পা-মুখ বাধা ঝন্টুকে উদ্ধার করেছে।"

"অদ্ভুত!" জেফরি বুঝতে পারলো ঘটনা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে।

"জি, স্যার। আমি নিশ্চিত, এটা ঐ খুনির কাজ।"

"তাহলে তো তাকে খুন করতো, এভাবে পুলিশে ধরিয়ে দেয়ার কথা না। এখন পর্যন্ত তো খুনি কাউকে রেহাই দেয় নি।"

"স্যার, উমা রাজবংশী নামের মেয়েটাকেও কিন্তু খুনি হত্যা করে নি।"

জেফরিকে মনে করিয়ে দিলো জামান। মাথা নেড়ে সায় দিলো ইনভেস্টিগেটর।

"এর বেলায়ও নিশ্চয় সেরকম কিছু হয়েছে," বললো জামান।

"ঠিক আছে, আগামীকাল আমরা ঐ ঝন্টুকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো। তুমি পুলিশকে বলে দাও।"

"জি, স্যার।" জামান একটু থেমে আবার বললো, "স্যার, আরেকটা ব্যাপার আছে।"

"কি?"

"পুরনো ঢাকার ওয়ারিতে একটা খুন হয়েছে, আমাদের কাছে মনে হচ্ছে, এই খুনের সাথেও আগের গুলোর কনেকশান থাকতে পারে।"

আরেকটা? ”ভিকটিম কে?”

“এক স্বর্ণব্যবসায়ী...বাবু বিনয় কৃষ্ণ। বয়স পঞ্চাশের উপর হবে।”

“কিভাবে বুঝলে, আগেরগুলোর সাথে কানেকশান আছে?”

“স্যার, লোকটা খুন হয়েছে এক অ্যাপার্টমেন্টে, ওখানে তার এক রক্ষিতা ছিলো...ঐ মহিলা বলেছে কোনো রকম গুলির শব্দ শোনে নি অথচ লোকটা মারা গেছে গুলিতে।”

“তার মানে আমাদের সেই খুনির কাজ,” বললো জেফরি। “কিন্তু এই স্বর্ণ ব্যবসায়ীর সাথে কি রঞ্জুর দলের কোনো কানেকশান আছে?”

“এখন পর্যন্ত আমরা সেটা জানি না, তবে...”

“তবে কি?”

“লোকটা নাকি স্বর্ণব্যবসার পাশাপাশি হুন্ডি ব্যবসাও করতো। পুলিশ বলছে, তার আসল ব্যবসা হলো হুন্ডি।”

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। এবার সে কানেকশানটা ধরতে পেরেছে। রঞ্জুর দলের সমস্ত চাঁদাবাজির টাকা কোলকাতায় পাঠানো হয় হুন্ডির মাধ্যমেই, সুতরাং একজন হুন্ডি ব্যবসায়ীর সাথে তাদের দলের সম্পর্ক থাকবেই।

“লোকাল থানাকে বলে দাও, আমরা এ হত্যাকাণ্ডেও তদন্ত করবো, আমাদের আগের কেসের সাথে এর কানেকশান আছে।”

“জি, স্যার।”

জেফরি ভাবতে লাগলো, এই খুনখারাবি শেষ হবে কখন। পরক্ষণেই বুঝতে পারলো সামনে আরো বড় ধরণের কিছু হতে যাচ্ছে। সে তুলনায় এসব খুনখারাবি কিছুই না।

টুম্পাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেও বাস্টার্ডের মনোযোগ পড়ে রইলো দক্ষিণ দিকের জানালার দিকে। বার বার তার চোখ ওখানে চলে যাচ্ছে। তার ধারণা জানালা দিয়ে রঞ্জুকে দেখা যেতে পারে। কিন্তু মেয়েটা যখন তাকে প্রশ্ন করলো ওদিকে কেন বার বার তাকাচ্ছে তখন বুঝতে পারলো এভাবে তাকানো ঠিক হচ্ছে না। ঠিক করলো মেয়েটার সাথে কথাবার্তা বলে আরো কিছু জেনে নেবে।

"তোমরা ক'জন কাজ করো ঐ রেস্তোরাঁয়?"

টুম্পা তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। "তোমার ক'জন দরকার এই সাত দিনে?" মেয়েটা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জবাব দিলো।

"আপাতত মিস টুম্পাই যথেষ্ট," বললো বাস্টার্ড।

"তাহলে এতো কথা জানতে চাচ্ছো কেন, মিস্টার?"

"এখানে আমার কয়েকজন বন্ধু আসবে সামনের মাসে, একটু রিক্রেয়েশন করতে... বুঝতেই পারছো, তাই জেনে নিচ্ছি।"

"কী বিজনেস করো গো, অ্যাঁ? তোমাদের বুঝি অনেক টাকা?"

"বিজনেস যা করি খারাপ না," বলেই হেসে ফেললো সে, "তবে সারাদিন প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়, সেজন্যে একটু..."

বাস্টার্ডের ইঙ্গিতটা ধরতে পারলো টুম্পা। "আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি।"

"আমার অনেক বন্ধু আছে, নিরাপদ জায়গা চায়, বুঝলে? আমার মনে হচ্ছে তোমার এই জায়গাটা বেশ নিরাপদ।"।

"ঠিক বলেছো। এখানে নিয়ে আসবে ওদের, কোনো সমস্যা নেই, তুমি শুধু বলবে, আমি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারবো।"

তারা দু'জনে বিছানার উপর পা তুলে বসে আছে।

"একটা ভুল হয়ে গেছে, আক্ষেপের সুরে বললো বাস্টার্ড।

"কি?"

"একটা ওয়াইনের বোতল নিয়ে আসা উচিত ছিলো। তোমার সাথে সারা রাত ওয়াইন খেয়ে আড্ডা মারা যেতো।"

"এটা কোনো ব্যাপার হলো, মিঃ পি," হেসে বললো টুম্পা। "আমি ফোন করে দিলেই রেস্টুরেন্ট থেকে ওরা বোতল পাঠিয়ে দেবে।"

"তাই নাকি?" অবাক হবার ভান করলো পিনাকী দাস।

"এক বোতল দিয়ে যেতে বলবো?"

বাস্টার্ড সম্মতি দিলে মেয়েটা বেডসাইড টেবিল থেকে ফোন করে কাকে যেনো বললো তার এই ফ্ল্যাটে একটা হুইস্কির বোতল দিয়ে যেতে। দশ পনেরো মিনিট পরই এক অল্পবয়সী ছেলে এসে বোতল দিয়ে টাকা নিয়ে চলে গেলো।

মদ খেতে খেতে নানান বিষয় নিয়ে কথা বলে যেতে লাগলো তারা। বাস্টার্ড খুব সাবধানে তার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো জেনে নিতে লাগলো, সতর্ক থাকলো মেয়েটা যেনো বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে না পারে। মেয়েটা বুঝতেই পারলো না তার সঙ্গী নিজে না যতো বেশি পান করছে তারচেয়ে অনেক বেশি তাকে পান করতে দিচ্ছে।

একটা সময় মেয়েটা যখন বুঝতে পারলো সে খুব একটা ড্রিংক করছে না তখন এর কারণ জানতে চাইলে মি: পি জানালো সে খুব বেশি ড্রিংক করতে পারে না।

রাত ১২টার পর মেয়েটার অবস্থা বেসামাল হয়ে পড়লো। বাস্টার্ড দেখতে পেলো এক লিটার মদের বোতলটিতে সামান্য পরিমাণ মদই অবশিষ্ট আছে। সে নিজে খুব কমই পান করেছে।

মিস টুম্পা এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণহীন।

"শিমকি, সুষমা এরা কি তোমার চেয়েও সুন্দরী?...আমার তো মনে হয় তারা তোমার চেয়ে বেশি সুন্দরী।"

ঢুলুঢুলু চোখে তাকালো মেয়েটি। "আমি কিভাবে বলবো, তোমরা পুরুষেরা বলতে পারবে...তোমরা যাকে দেখে মজে যাও তাদেরকেই তো লোকে সুন্দরী বলে।"

"কিন্তু তারা নিশ্চয় তোমার মতো এতোটা স্মার্ট না।"

"স্মার্ট?...মাই ফুট!" একটা ঢেকুর তুললো সে। "সুষমা তো দু'বছর আগেও হাওড়ায় ছিলো আর শিমকি কয়েক দিন আগে এসেছে নদীয়া থেকে।"

"আর তুমি?" আরেকটু মদ ঢেলে দিলো মেয়েটার গ্লাসে।

"আমি এখানকার মেয়ে...উত্তর কোলকাতার।"

"তাহলে মাউন্ট অলিম্পাসের মালিক তোমাকে বাদ দিয়ে শিমকি আর সুষমাকে নিয়ে পড়ে থাকে কেন?"

"ওরা যখন প্রথম এখানে আসে, তখন আমাকে নিয়েই পড়ে থাকতো, মিস্টার। অনেক দিন পর আমি নিজেই হাঁপিয়ে উঠলাম। ঐ যে রঞ্জু আছে না, ও তো মেয়েদেরকে জানোয়ারের মতো ব্যবহার করে। আমি নিজেই ওদের কাছ থেকে সরে এসেছি। শিমকি আর সুষমাকে নিয়েই থাক বাবা..."

টুম্পার একনাগাড়ে বলে যাওয়া কথাগুলো মন দিয়ে শুনে গেলো বাস্টার্ড।

রঞ্জু!

তার ধারণা ছিলো ব্ল্যাক রঞ্জু অন্য কোনো নামে কোলকাতায় বসবাস করছে। কিন্তু এখন জানতে পারলো ঐ শীর্ষ সন্ত্রাসী নিজের নামেই বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে। সমস্যা কি? এখানে তো তাকে কেউ চেনে না।

"ওরা দুজনেই কি রেস্টুরেন্টটার মালিক?"

"না।" গ্লাসটা হাতে নিয়ে আরেকটু পান করলো টুম্পা। "মৃণাল।"

"মৃণাল কে?"

"বললাম না ওরা দু'জন থাকে...রেস্টুরেন্টটার মালিক মৃণাল। রঞ্জু ওর ওখানেই থাকে।"

"আমি তো শুনেছি রঞ্জুই রেস্টুরেন্টটার মালিক।" একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলো সে।

"রঞ্জু কিভাবে মালিক হবে, অ্যাঁ?" ভারসাম্য রাখতে না পেরে টলে গেছিলো টুম্পা, বাস্টার্ড ধরে ফেললো।

"কেন, সমস্যা কি?"

"আরে, কী যা তা বলো...ওতো ওপারের!" কথাটা ফিসফিস করে বললো মেয়েটি।

"তাই নাকি?" বিস্মিত হবার ভান করলো মি: পি।

"হ্যাঁ, কেউ জানে না, বুঝলে?" আবারো একটা ঢেকুর তুললো টুম্পা। "খবরদার কথাটা কাউকে বলতে যেও না কিন্তু... মৃণাল শুনলে আমাকে আর অলিম্পাসে ঢুকতে দেবে না।"

"আরে না। আমি আবার কাকে বলতে যাবো। এটা কি বলার মতো কথা হলো।"

"সেটাই তো, রঞ্জু ওপারে থাকে এটা নিয়ে এতো লুকোছাপার কি আছে বাপু?" মেয়েটা হাত নেড়ে কথা বলছে এখন। পুরোপুরি মাতালই বলা চলে।

"নিশ্চয় কোনো কাহিনী আছে... তা না হলে এতো লুকোছাপা করবে কেন?" বোতল থেকে আরো মদ ঢেলে দিলো সে। "দ্যাখো গিয়ে ওপার থেকে খুনটুন করে এখানে গা ঢাকা দিয়ে আছে কিনা।"

"হ্যাগো, তুমি ঠিকই বলছো মনে হয়.. রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার আছে না, ঐ ম্যানেজার একদিন আমাকে বলেছিলো...ব্যাটা প্রচুর মাল টেনেছিলো, বউয়ের সাথে মনে হয় ঝগড়া হয়েছিলো...আমাকে বলে, অ্যাই বর্ণা, আ আমিই তোর ক্লায়েন্ট...চিন্তা করিস না, তোকে ভালো টাকা দেবো।"

টুম্পা বকবক করতে করতে নিজের নামটা বলে ফেলেছে। বাস্টার্ড মুচকি হাসলো। তারপর তুমি গেলে ওর সঙ্গে?"

"বা রে, যাবো না? ও তো বিনে পয়সায় কিছু চায় নি, চেয়েছে?"

"তাতো ঠিকই।"

“শীতল বাবু সারা রাত আমার সাথে মদ খেয়েছে আর গল্প করেছে। বয়স হয়েছে তো তাই ওসব করতে-টরতে পারে না। ঘরে ঢুকেই একবার চেষ্টা করেছিলো, মাইরি, কী আর বলবো, এক মিনিটেই শেষ...” হা হা করে হাসতে শুরু করে দিলো টুম্পা।

বাস্টার্ড বুঝতে পারছে এই মেয়েটার কাছ থেকে এখন যা শুনতে চাইবে তাই বলবে সে।

“তখন তোমায় এ কথা বললো?”

“হ্যাঁ। বলে কিনা, রঞ্জু খুব খারাপ... ওর কাছে তুমি যেও না, বর্ণা। আমি বললাম কেন গো, ও কী করেছে?...শীতল বাবু বলে, সে কথা তোমায় বলা যাবে না। একটু থেমে আবার বলতে লাগলো বর্ণা। “কী এমন কাজ করেছে

যে বলা যাবে না, অ্যাঁ?”।

“নিশ্চয় খুনটুনই হবে...” বললো বাস্টার্ড। সে একেবারেই একনিষ্ঠ শ্রোতা।

“তাই হবে গো... আমি আর কিছু জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করি নি।”

হঠাৎ মেয়েটা বাস্টার্ডের দিকে ভুরু কুচকে তাকালো। বুঝতে পারলো না সে। “কি হয়েছে?”

“অ্যাই, তুমি আবার শীতল বাবুর মতো এক মিনিটেই খালাস হয়ে যাবে না তো? কিছুই তো করছো না, শুধু কথা বলে যাচ্ছো আমার সাথে। আসো, তোমাকে একটু আদর করি।” বলেই বাস্টার্ডের গলা জড়িয়ে ধরে তার গালে, ঠোঁটে, ঘাড়ে চুমু খেতে লাগলো।

জেফরি বেগ গোয়েন্দা রিপোর্ট নিয়ে ভেবে যাচ্ছে। রিপোর্টের কিছু বিষয় পরিস্কার হবার দরকার কিন্তু গোয়েন্দা রিপোর্টে উল্লেখ করা আছে পিজি হাসপাতালের ঐ ডাক্তার আর কর্মচারিকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাদেরকে খুঁজে বের করাটা সহজ কাজ হবে না।

তবে ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের আরেকজনকে পাওয়া গেছে অদ্ভুতভাবে। সম্ভবত খুনি লোকটাকে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে যায় কেরাণীগঞ্জের বন্ধ হয়ে যাওয়া একটি পাটকলে। পাটকলটি নদীর তীরে অবস্থিত। একেবারে নিরিবিলি আর পরিত্যাক্ত একটি জায়গা। অজ্ঞাত পরিচয়ে একজন ফোন করে যে লোকটার কথা পুলিশকে জানিয়েছে সেটা ভেবেই জেফরি অবাক হচ্ছে। তার নিশ্চিত বিশ্বাস, ফোনটা খুনি নিজে করেছে। কিন্তু এরকম একটা কাজ খুনি করতে যাবে কেন? এর আগে একের পর এক রঞ্জুর লোকজনকে নির্দয়ভাবে খুন করেছে যে খুনি, সে কিনা এরকম একজনকে প্রাণে তো মারলোই না বরং পুলিশের কাছে তুলে দিলো।

খুনি কি তাদেরকে কোনো মেসেজ দিতে চাচ্ছে?

না। তার কাছে এটা মনে হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যেও এটা করা হতে পারে। তবে জেফরি জানে রঞ্জুর এই লোকের কাছ থেকে মূল্যবান কিছু তথ্য আদায় করতে পারবে, কারণ এখন সে গোয়েন্দা রিপোর্টটি সম্পর্কে পুরোপুরি জানে। জানে বিশাল একটি ষড়যন্ত্রের কথা।

তার বস ফারুক স্যারকে রিপোর্টের কথা বললে সব শুনে হোমিসাইডের মহাপরিচালক চিন্তিত হয়ে পড়ে। জেফরিকে বলে দিয়েছে খুব সাবধানে এগোতে। এ নিয়ে যেনো কারো সাথে কোনো রকম কথাবার্তা না বলে। রঞ্জুর দলের কয়েক জনের খুন নিয়েই তার তদন্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। তারপর যদি তদন্তের এক পর্যায়ে সব বের হয়ে আসে তখন বলা যাবে কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে তাদের কোনো ধারণাই ছিলো না।

জেফরির কাছে তার বসের কথাটা যৌক্তিক মনে হয়েছে। তার এখন এভাবেই কাজ করা উচিত।

ঠিক তখনই রমিজ লস্কর এসে জানালো পুলিশ রঞ্জুর যে সহযোগীকে উদ্ধার করেছে তাকে ইন্টেরোগেশন রুমে নিয়ে আসা হয়েছে।

ইন্টেরোগেশন রুমের দিকে যেতে যেতে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো জেফরি বেগ: আজকের জিজ্ঞাসাবাদটি সে একান্তে করবে। কেউ থাকবে না রুমে।

টুম্পা কিংবা বর্ণা, সকাল ন'টার আগে ঘুম থেকে উঠলো না। কোলকাতার বাসিন্দারা এমনিতেই দেরি করে ওঠে, আর মেয়েটা এতো বেশি পরিমাণ মদ খেয়েছে যে, বেহুশের মতো সারা রাত ঘুমিয়েছে। একবারের জন্যেও তার ঘুম ভাঙে নি। বাস্টার্ডের জন্যে অবশ্য সুবিধাই হয়েছে। সারা রাত সে ঘুমায় নি। দক্ষিণ দিকের জানালার সামনে বসে সারা রাত পার করে দিয়েছে। শুধু যে মাউন্ট অলিম্পাসের দিকেই তার নজর ছিলো তা নয়, এর চারপাশের পরিবেশ, বাড়িঘর, পথঘাটসহ সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে গেছে।

মাউন্ট অলিম্পাসের চার তলার ফ্লোরে রাত তিনটা পর্যন্ত বাতি জ্বলতে দেখেছে সে। খুবই টেনশনে কেটেছে ওখানকার বাসিন্দাদের রাত, বাস্টার্ড বুঝতে পারলো। তবে একবারের জন্যেও কাউকে জানালার সামনে আসতে দেখে নি। জানালার ভারি পর্দার আড়ালে দুয়েকবার আবছায়া অবয়ব ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে নি তার।

সবচাইতে বড় যে জিনিসটা সে জানতে পেরেছে সেটা এই অবলোকনের মাধ্যমে নয়। তার খুব কাছেই দুর্লভ একটা জিনিস পড়ে ছিলো-টুম্পার মোবাইল ফোন।

বাস্টার্ড সেই ফোনের সিমটা ফোনসেট থেকে খুলে তার ফোনসেটে ঢুকিয়ে সিমের সমস্ত কন্ট্যাক্ট কপি করে রেখেছে। কন্ট্যাক্ট থেকে নাম্বারগুলো ভালো করে চেক করে দেখেছে, কোনটা রঞ্জুর হতে পারে বোঝার চেষ্টা করেছে। তার ধারণা মেয়েটার ফোনে রঞ্জুর নাম্বার থাকবে। কিন্তু হতাশ হলো সে। এ নামে কোনো নাম্বার সেভ করা নেই। তবে রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার, শিমকি, সুষমা আর মৃণাল নামগুলো সেভ করা আছে-এ নামগুলো সে কথা প্রসঙ্গে টুম্পার কাছ থেকে শুনেছে। মাথার মধ্যে গেঁথে রেখেছে নামগুলো।

টুম্পা ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পেলো মি: পি তার পাশে বসে আছে।

"ক'টা বাজে গো?" ঘুম জড়ানো কণ্ঠে জানতে চাইলো সে।

"নটা।" তার মুখে হাসি।

মেয়েটা ধাতস্থ হতে আরো পাঁচ মিনিট সময় নিলো।

বিছানায় উঠে বসতে যাবে তখনই বুঝলো তার গায়ে কোনো কাপড় নেই। একেবারে নগ্ন। একটা চাদর জড়িয়ে আছে।

"আমার জামা কোথায়?"

বাস্টার্ড বিছানার নীচে ইঙ্গিত করলো। মেয়েটার জামা-কাপড় মেঝের এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

"এক রত্তি কাপড়ও রাখো নি গায়ে!" কপট বিস্মিত হবার ভান করলো সে। তারপরই চিন্তিত হয়ে গেলো। "কনডম ইউজ করেছে তো?...ড্রয়ারে যে কনডম আছে সে কথা তোমায় বলতেই ভুলে গেছিলাম।"

মেয়েটার চেহারায় আতঙ্ক দেখে হেসে ফেললো বাস্টার্ড। সাইড টেবিল থেকে কনডমের দুটো ছেঁড়া প্যাকেট হাতে নিয়ে মেয়েটার সামনে তুলে ধরলো। সব কিছুই সাজিয়ে রেখেছে সে, একেবারে নিখুঁত দক্ষতায়।

"ওমা!" চোখ নাচিয়ে বললো টুম্পা। "দু'বার!"

মিটিমিটি হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো বাস্টার্ড।

"আমি তো কিছুই মনে করতে পারছি না।"

"তুমি অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছিলে," বলেই মেয়েটার গালে আলতো করে টোকা মারলো। "একদম হুশ ছিলো না।"

"সেই অবস্থায়ই আমাকে...!" আবারো ভুরু নাচিয়ে বললো টুম্পা।

হা হা করে হেসে ফেললো বাস্টার্ড। "আমার কিন্তু ভালোই লেগেছে।"

টুম্পাও হেসে ফেললো। "আমাকে তোমার ভালো লেগেছে?"

"খুব।" আবারও মেয়েটার গালে টোকা দিলো সে। কিন্তু মিস, টুম্পা, আমার তো অনেক দেরি হয়ে গেছে...আমাকে এক্ষুণি চলে যেতে হবে। তুমি ঘুমাচ্ছিলে বলে ডাকি নি।"

"ওমা, তাই তো," বিছানা থেকে উঠে বসলো মেয়েটি। গায়ে চাদর জড়িয়ে নিয়ে বললো,

“আজ আবার আসবে তো?”

পকেট থেকে প্রচুর টাকা বের করলো বাস্টার্ড, সেখান থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিলো টুম্পাকে। “এক হাজার তোমাকে বখশিস দিলাম।” কথাটা বলেই উঠে দাঁড়ালো সে। “তুমি রেস্ট নাও, আমি যাই।”

“কখন আসছো?” আহ্লাদ করে বললো মেয়েটি।

“একটু ভেবে বললো সে, “সন্ধ্যার পর, অলিম্পাসে।”

“ঠিক আছে, তাহলে সন্ধ্যার পর দেখা হচ্ছে।”

বাস্টার্ড তিন তলা থেকে নেমে গেলো। রাস্তায় এসে আবারো ভালো করে দেখে নিলো এলাকাটি। সন্ধ্যার আগেই আবার সে আসবে। তার শরীরে এক ধরণের শিহরণ বয়ে গেলো।

রঞ্জুর অনেক কাছে এসে পড়েছে।

রঞ্জুর সহযোগী ঝন্টু বসে আছে সাদা ধবধবে ইন্টেরোগেশন রুমে। ঘরে আর কেউ নেই। জেফরি বেগ সবাইকে চলে যেতে বলেছে। তার সহকারী জামান খুব অবাক হয়েছে যখন তাকেও চলে যেতে বলে। সাধারণত এর আগে এরকম ঘটনা ঘটে নি। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা অনেকেই উপস্থিত থাকে, এমন কি ঘরে যে বিশাল আয়নাটা রয়েছে, সেই দ্বিমুখী আয়নার ওপাশে একটা ছোট্ট রুমে বসে অন্যেরাও জিজ্ঞাসাবাদের সবকিছু দেখতে পারে। আজ এর ব্যতিক্রম হলো। কেউ অবশ্য জানতে চায় নি কেন এরকম করা হচ্ছে। চুপচাপ রুম থেকে চলে গেছে সবাই। জেফরি জানে, কেন্টিনে গিয়ে সবাই এখন এ নিয়ে নানা রকম কথা বলাবলি করবে।

ঝন্টুর শরীরে পলিগ্রাফের সেন্সর লাগানো আছে। চুপচাপ বসে আছে সে, মনে হচ্ছে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। তিন দিন একটি পরিত্যাক্ত পাটকলের জঘন্য গুদামঘরে হাত-পা-মুখ বাধা অবস্থায় পড়েছিলো সে। নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছে সন্দেহ নেই। তবে খুনি যে তাকে শারিরীকভাবে কোনো টর্চার করে নি সেটা বোঝা যাচ্ছে। তবে তিনদিন না খেয়ে, ভয়ানক পরিবেশে থেকে ঝন্টু অনেকটা বাকরুদ্ধ।

"চা খাবেন?"

জেফরির কথাটা শুনে মুখ তুলে তাকালো ঝন্টু। কিছুটা অবাক হয়েছে।

"চা, সিগারেট খেতে চাইলে খেতে পারেন," বেশ স্বাভাবিকভাবেই বললো সে। খেয়াল করলো লোকটা ঢোক গিললো। হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

"ঠিক আছে, আমি দুকাপ চা আর সিগারেট দিতে বলি, কেমন?" তার সিদ্ধান্ত নেয়ার কষ্ট লাঘব করে বললো জেফরি।

মাথা নেড়ে সায় দিলো ঝন্টু।

"কি সিগারেট খান?"

"বেনসন," দূর্বল কণ্ঠে বললো ব্ল্যাক রঞ্জুর অন্যতম ঘনিষ্ঠ লোকটি।

ইন্টারকম তুলে চা আর সিগারেটের কথা বলে দিলো সে।

"আপনার শরীর এখন কেমন?"

ঝন্টু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। পুলিশী জেরা কেমন হয় সেই অভিজ্ঞতা তার রয়েছে কিন্তু এ কেমন ব্যবহার! এরা কি পুলিশ নাকি অন্য কিছু?

"জি, ভালো।"

"তিন দিন ছিলেন, ওখানে...?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ঝন্টু।

"আপনাকে কোত্থেকে তুলে নিলো?"

"ঢাকা মেডিকেল থেকে।"

"কয়জন ছিলো?"

"একজন।" কথাটা বলার সময় মাথা নীচু করে রাখলো ঝন্টু।

"আচ্ছা, একটু থেমে আবার বললো জেফরি বেগ, "খুনি নিশ্চয় আপনাকে ওখানে যেতে বলেছিলো?"

"জি।"

"লোকটাকে দেখলে চিনতে পারবেন তো?"

"পারবো।"

জেফরির সামনে একটা ল্যাপটপ আর ম্যানিলা ফোল্ডার। ফোল্ডার থেকে একটা স্কেচ করা মুখমণ্ডলের ছবি বের করে ঝন্টুর সামনে মেলে ধরলো।

"এই ছবিটা দেখে চিনতে পারছেন?"

ঝন্টু ছবিটার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলো। "অনেকটা ঐ লোকটার মতোন।" তার কণ্ঠ এখনও খ্রিয়মান তবে চোখেমুখে বিস্ময় দেখা যাচ্ছে। হয়তো ভাবছে এরা কিভাবে খুনির ছবি তৈরি করতে পারলো। ছবিটা যে কেউ এঁকেছে সেটা বুঝতে পারছে সে।

“অনেকটা?” মাথা নেড়ে আবার বললো জেফরি, “অনেকটা মানে কতোটুকু মিল আছে?”
“চোখটা হয় নি,” আস্তে করে বললো সে।
“তাই?”
রুমে একজন পিয়ন চা আর সিগারেট নিয়ে ঢুকলো।
“তাহলে খুনির চোখ দেখতে কেমন?” পিয়ন চলে যাবার পর বললো জেফরি।
ঝন্টু একটু ভেবে বললো, “এরকম না...” তারপর জেফরির দিকে। তাকিয়ে রইলো। “তার চোখ দুটো ঠিক আপনার মতো।”
বিষম খেলো জেফরি বেগ। আবার! তার মনে পড়ে গেলো বাস্টার্ডের কথা। জায়েদ রেহমানের কেসের তদন্ত করতে গিয়েও তার এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। তবে এজন্যে সে কাউকে দোষ দিতে পারে না। সত্যি বলতে কি, ঐ বাস্টার্ডের সাথে তার অনেক মিল আছে। উচ্চতা, শারিরীক গঠন, গায়ের রঙ....তবে সবচাইতে বেশি মিল চেহারায়।
কিন্তু ব্ল্যাক রঞ্জুর এই লোকও একই কথা বলছে কেন? তবে কি...?
অসম্ভব! তার কাছে যতোটুকু তথ্য আছে তাতে করে সে জানে ঐ হিংস্র খুনি বিদেশ চলে গেছে। সহসা দেশে ফিরে আসার কথা নয়। জেফরির ধারণা কমপক্ষে ছয় মাস সে দেশের বাইরে থাকবে।
আবার এমনও হতে পারে, যে অজ্ঞাত খুনিকে তারা খুঁজছে তার চেহারার সাথেও হয়তো জেফরির চেহারার কিছুটা মিল আছে। কিংবা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ঝন্টু গুলিয়ে ফেলেছে।
“আমি কি চা-সিগারেট নেবো?” আস্তে করে বললো ঝন্টু। তার কথায় সম্বিত ফিরে পেলো জেফরি।
“হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিন।” খুনির স্কেচটা সরিয়ে রাখলো সে। তার জন্যেও এককাপ চা দেয়া হয়েছে, কাপটা তুলে আনমনে চুমুক দিতে লাগলো।
ঝন্টু চায়ে চুমুক দিচ্ছে, তবে সিগারেটটা ধরাচ্ছে না। জেফরি সিগারেট ধরাতে বললে ট্রে থেকে ম্যাচটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালো।
“খুনি আপনার কাছ থেকে কি জানতে চেয়েছিলো?” চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললো ইনভেস্টিগেটর।
“রঞ্জু ভায়ের ঠিকানা।” এখন তার গলাটা একটু স্বাভাবিক শোনাচ্ছে। চা আর সিগারেট যেনো তাকে নতুন করে শক্তি দিয়েছে।
“রঞ্জু তো কোলকাতায় থাকে, তাই না?”
“জি।”
“ওর ঠিকানা নিয়ে খুনি কি করবে?”
ঝন্টু চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। “সেটা তো আমাকে বলে নি।”
“কিন্তু আপনার কাছে কি মনে হয়, রর ঠিকানা নিয়ে সে কী করবে?”
সিগারেটে পর পর দুটো টান দিয়ে ভেবে নিলো ঝন্টু। “কী আর করবে...খুন করবে হয়তো।”
“রঞ্জুকে?”
মাথা নেড়ে নায় দিলো ঝন্টু।
“কেন?”
“আমি সেটা কিভাবে জানবো?”
কথাটায় সন্তুষ্ট হতে পারলো না এমনভাবে মাথা দুলিয়ে জেফরি বললো, “কিন্তু আপনার তো জানা উচিত...রঞ্জুর দলে আছেন অথচ এটা জানবেন না কে আপনাদের পেছনে লেগেছে, কেন লেগেছে?”
মাথা নীচু করে রাখলো ঝন্টু।
“আপনার বিরুদ্ধে ঢাকা শহরের তিনটি থানায় মোট তেরোটি মামলা আছে,” বললো

জেফরি। এরমধ্যে পাঁচটিই হত্যা মামলা।"

ঝন্টু মুখ তুলে তাকালো। অনুশোচনা আর করুণ ভবিষ্যতের আতঙ্ক তার চোখেমুখে।

"ফেরারি আসামী আপনি। রঞ্জুর সাথে কোলকাতায় ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে, হঠাৎ কী মনে করে দেশে এলেন?"

জেফরি দেখলো লোকটা ভড়কে গেছে কিছুটা।

আগের প্রশ্নের জবাব না পেলেও আরেকটা প্রশ্ন করলো সে, "কতো দিন আগে এসেছেন দেশে?"

"দুই সপ্তাহ।"

"কেন? কি কারণে? কোন্ প্রয়োজনে?"

ঝন্টু নিশ্চুপ।

মুচকি হাসলো জেফরি। "আপনি বাঁচতে পারবেন না। একটা হত্যা মামলার রায় কয়েক দিনের মধ্যেই হয়েই যাবে। তারপরও এতো ঝুঁকি নিয়ে দেশে এলেন!" মাথা দোলাতে লাগলো সে। "আপনি না বললেও আমি সব জানি, মি: ঝন্টু।"

মুখ তুলে তাকালো লোকটা।

"হয়তো ভাবছেন আন্দাজে ঢিল ছুড়ছি," একটু থেমে সামনের দিকে ঝুঁকে এলো সে। "আপনি চাইলে আমি পুরো কাহিনীটা আপনাকে শোনাতে পারি। শুনবেন?"

"কি কাহিনী, স্যার?" ভয়ার্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো ব্ল্যাক রঞ্জুর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

"কিছুদিন পর আপনারা যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছেন সেই কাহিনী!"

ঝন্টু নিষ্পলক চেয়ে রইলো জেফরি বেগের দিকে।

এই লোক দেখি সব জেনে গেছে!

এদিকে বাস্টার্ড চায়না টাউন থেকে বের হয়ে নিজের হোটেলে ফিরে এলো না। কাছেই একটা পার্কে গিয়ে প্রথম টোপটা ব্যবহার করলো।

"হ্যালো, শীতল বাবু বলছেন?" একটা নাম্বারে ডায়াল করে বললো সে। তার বাচনভঙ্গিতে নিখুঁত পশ্চিমবঙ্গিয় টান। ছোটোবেলায় এক ঘটি শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভের ফলাফল।

"হ্যাঁ, বলছি...আপনি কে?" ওপাশ থেকে একটা রোগাটে কণ্ঠ বললো।

"আমি পীযুষ মুখার্জি, অরকুট ডট কমের সিনিয়র মার্কেটিং ম্যানেজার...আপনি কি মাউন্ট অলিম্পাসের ম্যানেজার বাবু বলছেন?"

"হ্যাঁ, বলছি। কী ব্যাপার বলুন?"

"আমি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।"

"হ্যাঁ, কি ব্যাপারে?"

"আমরা সামনের হপ্তায় একটি কনফারেন্স করবো কোলকাতায়। ভাবছি, আপনাদের রেস্টুরেন্টটায় করা যায় কিনা। শুনেছি আপনাদের খাবারের মান বেশ ভালো।"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমরা সব সময় চেষ্টা করি কাস্টমারকে ভালো কিছু দেবার... সেজন্যে আমাদের রেস্টুরেন্টটা নতুন হলেও বেশ নাম করে ফেলেছে। কোনো সমস্যা নেই। আপনি চলে আসুন সন্ধ্যার দিকে, বিস্তারিত কথা হবে তখন?"

"আমি আসলে অনেক ব্যস্ত আছি...একটা কাজে বেরিয়েছিলাম, তো আপনি যদি আমাকে এখন একটু সময় দিতেন আমার খুব সুবিধে হতো।" বাস্টার্ড জানে চায়না টাউনের রেস্টুরেন্টগুলো দুপুর থেকে খোলে।

"মুখার্জি বাবু, আমাদের রেস্টুরেন্ট তো দুপুরের আগে ওপেন হয় না।"

"ও তাই নাকি, আমি অবশ্য জানতাম না, থাকি তো বাঙ্গালোরে, মাঝেমধ্যে আসি কোলকাতায়...কি করা যায় বলুন তো? আমার হাতে একদম সময় নেই। ভেবেছিলাম আপনার সাথে দেখা করে সব ফাইনাল করে ফেলবো।"

শীতল বাবু একটু ভেবে নিলো। "ঠিক আছে, আপনি চলে আসুন আমার রেস্টুরেন্টে।"

"তাই? সো কাইন্ড অফ ইউ। আমি চলে আসছি।"

লাইনটা কেটে দিয়ে রেন্ট-এ-কারের ড্রাইভারকে ফোন দিয়ে বলে দিলো কোথায় আসতে হবে।

পনেরো মিনিট পর আবারো মাউন্ট অলিম্পাসের সামনে এসে থামলো তার গাড়িটা। ড্রাইভার লোকটা অবাক। এই রেস্টুরেন্টে লোকটা কী এতো মজা পেয়েছে ভগবানই জানে!

ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলো একেবারে ফাঁকা। চেয়ার টেবিলগুলো পরিস্কার করছে তিনচারজন লোক। কয়েক ঘণ্টা পরই এটি খুলে দেয়া হবে। তাকে ঢুকতে দেখে এক লোক এগিয়ে এলো তার কাছে। "আপনি কি মি: মুখার্জি?"

"হ্যাঁ।"

"আসুন আমার সাথে, ম্যানেজার বাবু আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

লোকটার সাথে রেস্টুরেন্টের আরো ভেতরে চলে গেলো সে। কিচেনের পাশে সরু আর ছোট্ট একটি প্যাসেজের মাঝখানটায় এসে বন্ধ দরজার কাছে থামলো তারা। দরজায় ইংরেজিতে লেখা : ম্যানেজার।

দরজায় টোকা মারতেই ভেতর থেকে খুলে দেয়া হলো। মাঝবয়সী হাড্ডিসার এক লোক দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে।

"নমস্কার, আমিই শীতল বাবু," দু'হাত জোড় করে বললো লোকটা।

মি: মুখার্জি হাত বাড়িয়ে দিলো। "পীযুষ মুখার্জি।"

করমর্দন করার পর তাকে চেয়ারে বসতে দিয়ে শীতল বাবু বসলো ডেস্কে নিজের চেয়ারে। "আপনাদের কনফারেন্সটা কবে হচ্ছে?" সরাসরি কাজের কথায় চলে এলো ভদ্রলোক।

“নেক্সট উইকের প্রথম দিকে। রেস্টুরেন্ট বুকিং হলেই আমরা ফাইনাল করে ফেলবো।”

দাঁত বের করে হাসলো ম্যানেজার। নেক্সট উইকের একটা দিন তাহলে ঠিক করে ফেলুন।”

“ওহ গড, বাঁচালেন। এটা নিয়েই একটু টেনশনে ছিলাম।”

“আপনাদের অ্যারেঞ্জমেন্টটা কেমন?”

“আপনাদের ক্যাপাসিটি কতো?” পাল্টা বললো সে।

“দুশোর মতো।”

“তাহলে তো একটু সমস্যা হয়ে গেলো। আমাদের প্ল্যান অবশ্য তিনশোর মতো।”

“কোনো সমস্যা নেই। উপরে একটা রিজার্ভ ফ্লোর আছে।”

“উপর তলায়?” আবারো একটু ভেবে নিলো মি: মুখার্জি। “কিন্তু জায়গাটা কি দেখা যাবে?”

“অবশ্যই দেখা যাবে। সাধারণত আমরা উপরতলাটা পার্টি-কনফারেন্সের জন্যেই রাখি। এমনিতে ওটা খালি পড়ে থাকে। কিছু স্টাফ থাকে আর কি। আপনার পছন্দ হবে।”

“ঠিক আছে...নো প্রবলেম। টোটাল প্যাকেজটা কী রকম হবে একটু বলবেন?”

“ড্রিঙ্কসহ নিশ্চয়?”

“তাতো অবশ্যই,” হেসে বললো বাস্টার্ড।

ডেস্কের ড্রয়ার থেকে কয়েকটা কাগজ বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিলো ম্যানেজার। এখানে বিভিন্ন ধরণের প্যাকেজ আছে। পার-হেড হিসেব দেয়া আছে। আপনি দেখুন আপনার জন্যে কোনটা সুট করে।”

বাস্টার্ড কাগজগুলোর দিকে কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে গেলো। “আচ্ছা, একটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছিলাম।”

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো ম্যানেজার।

“এন্টারেটেইনের কোনো ব্যবস্থা নেই...মানে, বুঝতেই তো পারছেন, উইমেন কোম্পানির কথা বলছি,” বললো সে।

ম্যানজারের হাসি আরো চওড়া হলো। তারপর তকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গি করে বললো, “এ নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না। একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এলো লোকটা। “আমরা শুধু কলেজ-ইউনিভার্সিটি গোয়িংদের রাখি...অন্যদের মতো হাউজওয়াইফ কিংবা ম্যারেড আমাদের এখানে পাবেন না।” চায়না টাউনে এ ব্যাপারে আমাদের সুনাম সবচেয়ে বেশি।”

বাস্টার্ড মুখ টিপে হেসে বললো, “সত্যি বলতে কি, আমি সেজন্যেই আপনাদের রেস্টুরেন্টটা চুজ করেছি।” বলেই দুষ্টুমিভরা হাসি দিলো।

দাঁত বের করে হাসলো ম্যানেজার। “তাহলে কোনটা ঠিক করলেন?”

একটা কাগজ বাড়িয়ে দিলো মি: মুখার্জি। “আমার মনে হয় এটাই আমাদের জন্যে ভালো হবে।”

কাগজটা হাতে নিয়ে ম্যানেজার মাথা নেড়ে সায় দিলো। “ভালো জিনিস চুজ করেছেন।”

এভাবে ব্যবসায়িক আলাপ আলোচনা আরো কিছুক্ষণ চলার পর মি: মুখার্জি অন্য প্রসঙ্গে চলে এলো। “আপনি কি চার তলায় থাকেন?”

“না, না, আমি এখান থেকে ওয়াকিং ডিসটেন্টে থাকি।’

“আমি ভাবলাম এখানকার অন্যসব রেস্টুরেন্টের মতো আপনিও বোধহয় উপরতলায়ই থাকেন।”

“ঠিকই বলেছেন, এখানকার সবগুলো রেস্টুরেন্টেই প্রোপাইটররা থাকেন। আমাদের প্রোপাইটরও থাকেন চার তলায়।”

“তাই নাকি,” কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করলো সে। “আপনাদের প্রোপাইটর কি চীনা?”

“না, আমাদের প্রোপাইটর বাঙালি। এর আগের প্রোপাইটর ছিলো চীনা। পরে এটা আমাদের প্রোপাইটর কিনে নেন।”

“ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন?”

“না, না। এখনও সিঙ্গেল।”

“তাহলে চলুন, দোতলাটা একটু দেখে আসি।”

ম্যানেজারের রুমের ঠিক পাশেই একটা সিঁড়ি, সেটা দিয়ে তারা দোতলায় চলে এলো। শীতল বাবু ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলো কিন্তু মি: মুখার্জির সেদিকে মন নেই। তার আগ্রহ অন্য কিছুতে।

“ভালো, জায়গাটা আমার পছন্দ হয়েছে,” মন্তব্য করলো সে।

“তাহলে চলুন আমার অফিসে গিয়ে বসি। কিছু ফর্মালিটিজ আছে...” ম্যানেজার বললো।

আবারো তারা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে যাবে এমন সময় বাস্টার্ড নিতান্তই স্বাভাবিক কৌতূহলের মতো করে বললো, “চার তলায় যাবার সিঁড়িটা তো দেখলাম না?”

“অন্য একটা সিঁড়ি দিয়ে ওখানে যেতে হয়। এই ভবনের পেছন দিকে ওটা। বুঝলেন না, প্রাইভেসি। আমাদের মালিক প্রাইভেসির ব্যাপারে খুবই সজাগ।”

“সেটাই ভালো। রেস্টুরেন্ট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন, তাই না?”

“হ্যাঁ।”

তারা নীচে নামতে লাগলো।

“আচ্ছা, আপনাদের কি ফায়ারএস্কেপ সিঁড়ি নেই?..আমাদের চেয়ারম্যান লোকটা আবার এসব ব্যাপারে খুঁতখুঁতে।”

ম্যানেজারের দাঁত বের করা হাসি আবারো দেখা গেলো। “দোতলার জন্য কি ফায়ারএস্কেপ সিঁড়ির দরকার আছে?”

“বললাম না, আমাদের চেয়ারম্যান লোকটা...”

মাথা নাড়লো শীতল বাবু। “চিন্তার কিছু নেই। আছে।”

“কোথায়?”

তারা ম্যানেজারের রুমের সামনে এসে পড়লো। “পেছন দিকের যে সিড়িটা দিয়ে চার তলায় যাওয়া আসা করে আমাদের প্রোপাইটর, সেটাই আসলে ফায়ারএস্কেপ সিঁড়ি ছিলো।”

“ওটা কি এখন আর ব্যবহার করা হয় না...মানে বন্ধ করে রেখেছেন?”

ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে গেলো তারা। “দরকার পড়ে না, তাই প্রেপাইটর ওটাকে চার তলায় যাবার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে। তবে আপনাদের কনফারেন্স যেদিন হবে বন্ধ গেটটা খুলে রাখবো।”

“গেটটা কোন্ দিকে ছিলো...দেখলাম না তো?” মি: মুখার্জির প্রশ্ন।

“দোতলার সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে গেটটা আছে। বন্ধ ছিলো তাই খেয়াল করেন নি। প্রোপাইটর ভেতর থেকে তালা মেরে রাখেন।”

“আচ্ছা,” একটু থেমে আবার বললো বাস্টার্ড। “বাকি ফর্মালিটিজগুলো আমার এক জুনিয়র এক্সিকিউটিভ এসে আপনার সাথে সেরে নেবে। তাকে কালই পাঠিয়ে দেবো। আর ফোনে জানিয়ে দেবো কোনদিন আমাদের কনফারেন্সের ডেটটা ঠিক করেছি। আপনার বিজনেস কার্ডটা একটু দিলে সুবিধে হয়...”

“ওহ্ নিশ্চয়,” শীতল বাবু তার বিজনেস কার্ডটা বের করে দিলো।

কার্ডটা হাতে নিয়ে বললো বাস্টার্ড, “ভুল করে আমার কার্ড নিয়ে আসি নি। তাই দিতে পারছি না।”

“না, না...ঠিক আছে।”

হাতটা বাড়িয়ে দিলো শীতল বাবুর সাথে। “আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো। ফোনে কথা হবে। তাহলে আমি এখন আসি।”

শীতল বাবু মেইনগেট পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিলো।

রেন্ট-এ-কারে বসতেই বিহারি ড্রাইভার যখন জানতে চাইলো এরপর কোথায় যাবে তখন

শুধু বললো, “কিড স্ট্রীট।”

জেফরির কাছ থেকে সব শুনে ব্ল্যাক রঞ্জুর ঘনিষ্ট সহচর ঝন্টু বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো। সে বুঝতেই পারছে না তাদের গোপন অপারেশনের কথা এরা কিভাবে জানলো। রঞ্জু যদি এটা জানতে পারে তাহলে কী করবে, ভাবলো সে।

জেফরি বেগ নামের লোকটাকে তার কাছে ঠিক পুলিশ বলে মনে হচ্ছে না। এই লোকটা যা বলেছে তার প্রায় সবটাই সত্যি। রঞ্জু আর তার দলের হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া এ অপারেশনের কথা কেউ জানে না। বাইরের কেউ যদি জেনে থাকে তাহলে সে স্বয়ং ঐ ব্যক্তি যার মাথা থেকে এই আইডিয়াটা বের হয়েছে।

মোটামুটি সব গুছিয়ে নিয়ে এসেছে তারা। এখন শুধু নির্দিষ্ট একটা ক্ষণের অপেক্ষা। সব কিছু সুন্দরভাবেই সম্পন্ন করা হয়েছে। কাজটাও যে এমন কঠিন তা নয়, কিন্তু এখন, এই লোকটার কাছ থেকে সব শুনে বুঝতে পারছে তাদের সমস্ত পরিকল্পনা কেবল ভণ্ডুলই হবে না, তাদের পুরো দলটাও শেষ হয়ে যাবে।

অজ্ঞাত সেই খুনি তাহলে ঠিকই বলেছে, পুলিশের চেয়েও বড় কিছু। হ্যাঁ। এটা নির্ঘাত কোনো গোয়েন্দা সংস্থার কাজ। এখন তার কাছে সব স্পষ্ট হয়ে গেছে। রঞ্জু শেষ। তার সময় এসে গেছে। যতো ধূর্তই সে হোক না কেন, তার সমস্ত খেলা শেষ হতে যাচ্ছে। কিন্তু তার কী হবে? এরা তাকে ক্রশফায়ারে দেবে না তো? অন্য রকম ক্রশফায়ার! যেমনটি তার দলের অন্যদের সাথে করা হয়েছে।

"কি ভাবছেন?" ঝন্টুকে অনেকক্ষণ চুপ থাকতে দেখে ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ বললো।

জেফরির দিকে তাকালো ঝন্টু। "আপনারাই তাহলে আমাদের দলের লোকজনকে খুন করছেন?"

ভুরু কুচকে ফেললো হোমিসাইড ইনভেস্টিগেটর। "আমরা খুন করছি মানে?"

"আমাকে যে তোক তুলে নিয়ে গেছিলো সে আমাকে একটা কথা বলেছে...'

"কি?" উদগ্রীব হয়ে উঠলো জেফরি।

"তারা পুলিশের চেয়েও বড় কিছু।"

মাইগড!

কিড স্ট্রীটে নেমে রেন্ট-এ-কারটা ছেড়ে দিলো বাস্টার্ড, ড্রাইভারকে বলে দিলো বিকেলের পর তাকে আবার দরকার হবে। গাড়িটা চলে গেলে সে হোটেলের দিকে পা বাড়িয়ে সোজা চলে গেলো নিউ মার্কেটে। কিড স্ট্রীট থেকে নিউ মার্কেট হাটা দূরত্ব।

হার্ডওয়্যার দোকান থেকে একটা পাঞ্জ, স্কচট্যাপ, ম্যাচবক্সসহ আনুষঙ্গিক আরো কিছু জিনিস কিনে নিলো। হোটেলে ফেরার পথে কিড স্ট্রীটের একটি রেস্তোরাঁর সামনে দিয়ে যাবার সময় গরুর মগজের ভুনার ঘ্রাণ নাকে যেতেই আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। পেট ভরে খেয়ে নিলো মগজভুনা আর গরম গরম ভাত।

হোটেলে ফিরে এসে গোসল করে নিলো। সারা রাত ঘুমাতে পারে নি। তার দরকার এখন ঘুম। সব কিছু দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। এই কন্ট্রাক্টটা যখন নেয় তখন তার কাছে মনে হয়েছিলো এক মাস সময় অনেক কম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এর অর্ধেক সময়ের মধ্যেই ব্ল্যাক রঞ্জুর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারবে। ইতিমধ্যে তার দলের অনেককে শেষ করে দিয়েছে। বাকি আছে শুধু রঞ্জু। তার মন বলছে, কাজটা শেষ করতে আর মাত্র দু'একদিনের বেশি লাগবে না। তবে আজকের দিনটাই যদি সেই মাহেন্দ্রক্ষণ হয় তাহলে সে অবাক হবে না। পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়েই সে বের হচ্ছে।

বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে লাগলো বিকেলে কি করবে। খুব বেশি ভাবনার কি আদৌ দরকার আছে, প্রশ্ন করলো নিজেকে। তার কাজ তো এখন একটাই। ব্ল্যাক রঞ্জুকে খুন করা। রঞ্জুর সুরক্ষিত ডেরায় ঢুকে পড়েছে। এখন শুধু আঘাত হানার পালা। ভাবলো, মৃদুল নামের ছেলেটাকে রেখে দিয়ে ভালোই করেছে। কাজটা ভালোয় ভালোয় শেষ করতে পারলে এই ছেলেটাকে নিয়েই সীমান্ত পাড়ি দিতে পারবে।

ঠিক কখন ঘুমে তলিয়ে গেলো বুঝতে পারলো না। আর সেই ঘুমের মধ্যে উমা নামের মেয়েটিকে কেন স্বপ্নে দেখলো সেটা তার কাছে আরো দুর্বোধ্য ঠেকলো ঘুম থেকে ওঠার পর।

চমৎকার একটি স্বপ্ন। এ জীবনে এরকম স্বপ্ন সে দেখে নি।

উমার কোলে মাথা রেখে নির্জন এক জায়গায় শুয়ে আছে।

ব্ল্যাক রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ লোক ঝন্টু যা বলেছে সেটা শুধু পলিগ্রাফ টেস্টই পজিটিভ বলছে না জেফরির মনও বলছে লোকটা সত্যি কথাই বলেছে। এর আগে উমা নামের মেয়েটিও একই কথা বলেছে তাকে। পলিগ্রাফ টেস্টও তখন মেয়েটার পক্ষে ছিলো। এখনও টেস্টের রেজাল্ট একই রকম। ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগের মাথা দ্রুত কাজ করতে শুরু করলো। সে এখন নিশ্চিত, কোনো না কোনোভাবে একটা গোপন অপারেশন পরিচালিত হচ্ছে ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের বিরুদ্ধে আর এটা করা হচ্ছে এই দেশটাকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু কারা এটা করছে সে সম্পর্কে আগের মতোই অন্ধকারে রয়ে গেছে সে। তবে সে জানে খুনির পরিচয় উদঘাটন করতে পারলে সেই সূত্র ধরে সবটা জেনে নিতে পারবে।

স্কটল্যান্ডইয়ার্ডে খুনি আর বাস্টার্ডের ব্যবহৃত বুলেটের খোসা পাঠিয়েছিলো আজ থেকে প্রায় আট-নয় দিন আগে, সেটার রেজাল্ট এখনও। জানা যায় নি। এরজন্যে অবশ্য ইয়ার্ডকে দায়ি করতে পারছে না সে। এ দেশের ডাক বিভাগের বদান্যতায় তারা বুলেটের খোসা দুটো পেয়েছে পুরো এক সপ্তাহ পরে। দুটো খোসা টেস্ট করতে এক দিনের বেশি লাগবে না। সে হিসেবে আজকালের মধ্যে টেস্টের রেজাল্ট জানা যেতে পারে।

অজ্ঞাত খুনির বুলেটের খোসা পাঠানোর সময় বাস্টার্ডের ব্যবহৃত বুলেটের খোসাটাও সে পাঠিয়েছে, কারণ জেফরি চায় ঐ খুনির আঙুলের ছাপ ডাটা ব্যাঙ্কে থাকা দরকার, তাতে করে ভবিষ্যতে তাকে ট্র্যাকডাউন করা সম্ভব হবে।

ইন্টেরোগেশন রুম থেকে ফিরে এসে নিজের রুমে বসে বসে এসব কথা যখন ভাবছিলো তখন অনেকটা কাকতালীয়ভাবেই তার কাছে একটা সংবাদ এসে পৌঁছায়।

তার সহকারী জামান হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলো তার রুমে। রুমে ঢোকার অনুমতি চাইতে হয়, সে কথা ভুলে গেলো তার এই সহকারী। জেফরি বেগ তাকে দেখেই বুঝতে পারলো দারুণ কোনো সংবাদ আছে। জামানের হাতে একটা ফ্যাক্সকপি।

"স্যার!" জামান ফ্যাক্সকপিটা বাড়িয়ে দিলো তার বসের দিকে। সে রীতিমতো হাফাচ্ছে। "স্কটল্যান্ডইয়ার্ড থেকে বুলেটের খোসার রিপোর্ট এসেছে।"

কাগজটা হাতে নিয়ে পড়ে দেখার আগেই উত্তেজিত জামান বলে উঠলো, "বাস্টার্ড! স্যার, এটা বাস্টার্ড!"

বাস্টার্ড ঘুম থেকে উঠলো বিকেলের দিকে। বেশ চাঙ্গা বোধ করলো সে। মাথাটাও হালকা লাগছে। দেরি না করে কাজে নেমে পড়লো। প্রথমেই মৃদুলকে ফোন করলো। ছেলেটা খুবই বুদ্ধিমান। তাকে দিয়ে ছোটোখাটো নিরীহ গোছের একটা কাজ করাবে। বিস্তারিত বলে দিলো তাকে। এই ছেলের সবচাইতে ভালো গুন হলো, কেন, কি কারণে এসব প্রশ্ন করে না। যা করতে বলা হবে শুধু তাই করবে।

এরপর ড্রেসিং টেবিলের উপর একটা দৈনিক পত্রিকা মেলে রেখে তার উপর কয়েকটি বুলেট রেখে দিলো। পাঞ্জ দিয়ে একে একে দশটা বুলেট থেকে সুগ অর্থাৎ সীসার অংশটা টেনে খুলে ফেললো সে। বুলেটের ভেতর থাকে বি ফোর এক্সপ্লোসিভ। খুবই দাহ্য পদার্থ। সহজ ভাষায় যাকে বলে গানপাউডার। সেই গানপাউডার বের করে একসাথে জমিয়ে রাখলো একটা দেয়াশলাইয়ের খালি বাক্সে।

এরপর আরো পাঁচটা বুলেট নিয়ে অন্য রকম একটি কাজ করলো। ধারালো ব্লেড দিয়ে প্রতিটি বুলেটের ত্রিভূজাকৃতির সীসার অংশটার চারদিকে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত দাবিয়ে দাবিয়ে দাগ কাটলো। এটাকে তারা বলে কামরাঙ্গা বানানো। এভাবে পাঁচটা বুলেট কামরাঙ্গা করে রেখে দিলো আলাদা একটি ম্যাগাজিনে। এই বুলেটগুলোর কোনো দরকার নাও লাগতে পারে, তবে সে জানে সতর্কতার কোনো বিকল্প নেই। যদি প্রয়োজন পড়ে এই বুলেটগুলো হয়ে উঠবে আরো বেশি ভয়ংকর। ফায়ার করার পর প্রতিটি বুলেটের ধনুকের ফলা আকৃতির স্লগ কয়েকটি টুকরোয় বিভক্ত হয়ে আঘাত হানবে লক্ষ্য বস্তুতে। ফলে একটা গুলি কাজ করবে অনেকগুলো গুলির। কয় টুকরো হবে সেটা নির্ভর করে কতোগুলো দাগ কাটা হয়েছে তার উপর। বাস্টার্ড প্রতিটি স্লগের গায়ে পাঁচটি করে দাগ কেটেছে। তার মানে তার কাছে থাকা এই পাঁচটি বুলেট এখন পঁচিশটি বুলেটের কাজ করবে। তারচেয়েও বড় কথা এতে করে টার্গেট মিস হবার সম্ভাবনাও কমে যায়। পাঁচটি খণ্ডিত শ্লাগ একবর্গফুটের মতো জায়গায় ছড়িয়ে আঘাত হানবে।

বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরে চমৎকার আর আরামদায়ক জামাকাপড় পরে নিলো। কালো প্যান্ট আর কালো রঙের টি-শার্ট। টি-শার্টের বুকে বড় বড় করে লেখা : বিগ বয় প্লেইজ অ্যাট নাইট। টি-শার্টের উপর ফুলহাতা শার্ট পরে নিলেও সবগুলো বোতাম খোলা রাখলো।

দেয়াশলাইয়ের বাক্স, স্কচটেপটা পকেটে নিয়ে সাইলেন্সর পিস্তলটা কোমরে গুঁজে রুম থেকে বেরিয়ে পড়লো সে।

জেফরি বেগ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে যে ফ্যাক্সটা এসেছে সেটা বার বার পড়লো। অবশেষে বিড়বিড় করে বললো, “বাস্টার্ড!”

“জি, স্যার!” জামানের উত্তেজনা এতোটুকু কমে নি। ছেলেটা রীতিমতো হাফাচ্ছে। করিডোরের শেষ মাথায় কমিউনিকেশন্স রুম থেকে যে দৌড়ে এসেছে সেটা বুঝতে পারলো জেফরি।

এই খুনি, জনপ্রিয় লেখক জায়েদ রেহমানকে নিখুঁত দক্ষতায় খুন করে সমস্ত দায়দায়িত্ব লেখকের তরুণী, স্ত্রী আর প্রেমিকের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলো। জেফরি এমন বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছিলো যে, লেখকের সাবেক স্ত্রী, এক প্রকাশক আর এক অভিনেত্রীকে পর্যন্ত সন্দেহের তালিকায় ঠাঁই দিয়েছিলো।

যাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে জেফরি বেগ। যাকে ট্রেস করার জন্য রীতিমতো একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করে ফেলেছে-জেফরি-বেক টেকনিক। কাকতালীয়ভাবে খুনির সাথে তার চেহারার রয়েছে অনেক মিল। প্রচণ্ড স্মার্ট আর ধূর্ত এক খুনি। ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে। দেখলে মনে হবে নিষ্পাপ চেহারার এক যুবক। আদতে হাইলি পেইড প্রফেশনাল হিটম্যান।

“স্যার?” জামান তার বসকে দীর্ঘক্ষণ নিশ্চুপ থাকতে দেখে বললো।

সম্বিত ফিরে পেলো ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ। “কি?”

“এখন কি করবো আমরা?” জামানের রক্ত যেনো টগবগ করছে।

তাই তো, এখন কি করবো? মনে মনে ভাবলো সে। নিজেকে ধাতস্থ করে নিলো। “বাস্টার্ডের যে ছবিটা আমাদের কাছে আছে সেটা নিয়ে আস।”

“জি, স্যার,” বললো জামান কিন্তু জায়গা থেকে নড়লো না, সে জানে তার বস্ আরো কিছু নির্দেশনা দেবে।

“রঞ্জুর লোকটা, মানে ঝন্টু এখন কোথায়?”

“লকআপে।” হোমিসাইডের নিজস্ব লকআপ আছে, যেকোনো থানা হাজতের লকআপের চেয়ে সব দিক থেকেই উন্নত আর মানবিক।

“ওকে ইন্টেরোগেশন রুমে নিয়ে যাও, আমি আসছি।”

জামান দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেলো।

পাঁচ মিনিট পর জেফরি বেগ হোমিসাইডের ইন্টেরোগেশন রুমে বসে আছে ব্ল্যাক রঞ্জুর সহযোগী ঝন্টুর বিপরীতে। একটু আগেও তারা ঠিক এখানে বসেছিলো, তবে এবার জেফরি একা নয়, তার সাথে জামানও আছে।

জামানের কাছ থেকে বাস্টার্ডের ছবিটা হাতে নিয়ে ঝন্টুর দিকে মেলে ধরলো জেফরি। এই ছবিটা কম্পিউটারের সাহায্যে এনলার্জ করে তৈরি করা হয়েছে।

“চিনতে পারছেন একে?”

ঝন্টু যেনো দুঃস্বপ্ন দেখছে। বজ্রাহত হলো সে। শুধু মাথাটা একটু নাড়াতে পারলো। হ্যাঁ। চিনতে পেরেছে। না চেনার কোনো কারণই নেই।

“এ ছবিটার সাথে তার বর্তমান চেহারার কতোটুকু পার্থক্য আছে?”

ঝন্টু ছবিটা হাতে নিয়ে আরো ভালো করে দেখে নিলো। “চুলগুলো এখন অনেক ছোটো...”।

“হ্যাঁ...” জেফরি তাড়া দিলো। আরো জানতে চাইছে সে।

“গায়ের রঙ রোদে পোড়া...” সম্মোহিতের মতো বলে চললো ঝন্টু।

“আর?”

“এই...বাকি সব ঠিকই আছে।”

“ভালো করে দেখুন!” অনেকটা ধমকের মতো শোনলো জেফরির কথাটা।

“না, স্যার...বাকি সব ঠিকই আছে।”

আশ্বস্ত হলো সে। ফিরে তাকালো জামানের দিকে। “ওকে, দ্যাটস এনাফ,” টেবিলের উপর চাপড় মেরে বললো জেফরি। “জামান, আমার মনে হয় ও ঠিকই বলেছে। আমাদের

আর্টিস্টের যে স্কেচ তাতে ছোটো ছোটো চুলই আছে। তুমি এক্ষুণি কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টে গিয়ে বাস্টার্ডের এই ছবিটা নিয়ে রিকন্সট্রাক্ট করে ফেলল। কি কি পরিবর্তন করতে হবে সেটা তো তুমি জানোই...”

“জি, স্যার।”

“ওকে, মেক ইট কুইক।”

জামান ছবিটা নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে যেতেই জেফরি তাকালো ঝন্টুর দিকে।

“মি: ঝন্টু। আপনাকে এখন সাহায্য করতে হবে। সব বলতে হবে। আমি যা যা জানতে চাইবো তার ঠিক ঠিক উত্তর চাই। ফাঁসি থেকে বাঁচতে চাইলে আপনাকে শুধু সব কিছু বললেই হবে না, আপনাকে হতে হবে রাজসাক্ষী।”

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো ঝন্টু। রাজসাক্ষী! ঐ খুনিও তাকে এই কথা বলেছিলো। এরা কি সবাই একই দলের নাকি? বুঝতে পারছে এদের সহযোগীতা না করলে তার আর বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না। তাদের তো সাক্ষী লাগবে, নাকি!

“স্যার, আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো। বলুন কি করতে হবে?” অবশেষে বললো ঝন্টু।

“গুড!” কথাটা বলেই নিজের অস্থিরতা একটু দমিয়ে নিলো সে। বড় করে নিঃশ্বাস নিলো। ঝন্টু ভয় মিশ্রিত কৌতূহল নিয়ে তাকে দেখে যাচ্ছে।

“ব্ল্যাক রঞ্জু কোলকাতার কোথায় থাকে?”

রেন্ট-এ-কারটা যখন মাউন্ট অলিম্পাসের সামনে এসে থামলো তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা বাজে। বাস্টার্ড ইচ্ছে করেই অনেক আগে এসেছে। তার কিছুটা সময় দরকার।

ড্রাইভারকে একটু সামনে নিয়ে গিয়ে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতে বললো সে। আরো বলে দিলো ফোন করে জানাবে কখন কোথায় আসতে হবে।

মাউন্ট অলিম্পাসের পেছন দিকটা দেখেনি, এবার সেখানেই গেলো সবার আগে। ম্যানেজার লোকটার কথামতো পেছন দিকেই একটা সিঁড়ি আছে, আগে যেটা ছিলো ফায়ারএস্কেপ, আর সেই সিঁড়িটাই ব্যবহার করে ব্ল্যাক রঞ্জু। ভবনটার পাশে আরো দুটো পাঁচ তলার ভবন। দ্বিতীয় ভবনটির বাম পাশ দিয়ে সরু একটা গলি চলে গেছে পেছন দিকে। অলিম্পাসের পেছন দিকে বেশ বড় ফাঁকা একটি জায়গা, চার দিকে কতোগুলো ভবনের পেছন দিক সেটা। এখান থেকে কোথাও যাওয়া যায় না। জায়গাটা কানাগলির মতো।

সংকীর্ণ একটা দরজা খুঁজে পেলো সে। লোহার দরজা। বাইরে দিয়ে কোনো তালা মারা নেই। দরজাটার কাছে গিয়ে ধাক্কা মেরে দেখলো। ভেতর থেকে লক করা আছে। তার মানে ব্ল্যাক রঞ্জু এখন উপরেই আছে।

আবার ফিরে এলো অলিম্পাসের সামনে। দেখতে পেলো রেস্টুরেন্টে কাস্টমার ঢুকছে। সন্ধ্যা যতো ঘনিয়ে আসবে কাস্টমার ততোই বাড়বে। তাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে বাইরে। ভেতরে গিয়ে যদি ঐ ম্যানেজারের সাথে দেখা হয়ে যায় তাহলে সমস্যা। অবশ্য দেখা হয়ে গেলে কি বলতে হবে সেটাও ঠিক করে রেখেছে : আপনাদের এন্টারটেইনমেন্ট কম্প্যানিয়নদের একটু দেখতে এসেছি!

টুম্পার আসতে এখনও অনেক দেরি আছে। একটু হেঁটে অলিম্পাসের বিল্ডিং থেকে দূরে গিয়ে ভালো করে তাকালো চার তলার দিকে। পাঁচটা জানালা আছে এদিকটায়। ডান দিকের জানালাটার পর্দা সরানো। তার কাছে মনে হলো জানালার সামনে একটা আবছা অবয়ব বসে আছে। তবে সে নিশ্চিত হতে পারছে না।

এটাই হলো ব্ল্যাক রঞ্জুর গুহা। তার ধারণা চার তলা থেকে সহসা সে, নীচে নামে না, যদি না বিশেষ কোনো প্রয়োজন পড়ে। তবে এখান থেকে তাকে কিভাবে বের করা যাবে সেটা সে ভালো করেই জানে।

পরিকল্পনাটা গুছিয়ে নিলো। সোজা ঢুকে পড়লো অলিম্পাসের ভেতরে।

কাস্টমারের সংখ্যা মোটামুটি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সব। আগের দিন যে টেবিলে বসেছিলো ঠিক সেই টেবিলটাই ফাঁকা দেখতে পেয়ে সেটাতে বসে পড়লো। চারপাশে তাকিয়ে দেখলো টুম্পার মতো কোনো মেয়ে আছে কিনা। আছে। কমপক্ষে দু'জন। কাছাকাছি দুটো রাউন্ড টেবিলে বসে আছে তারা। একজনের পরনে টাইট জিন্স আর গেঞ্জি, অন্যজনের শাড়ি।

গতকালের মতোই করলো। প্রথমে চোখাচোখি। তারপর মুচকি হেসে ওয়েটারকে ডেকে দুটো বিয়ারের অর্ডার দিলো সে। ওয়েটার ছেলেটা চলে যেতেই টাইট জিন্স ক্যাটওয়াকের ভঙ্গিতে চলে এলো তার কাছে।

"বিগবয় কি শুধু রাতেই খেলে নাকি?" শার্টের বোতাম খোলা থাকার কারণে বাস্টার্ডের টি-শার্টের শ্লোগানটা দেখা যাচ্ছে। সেটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো টাইট জিন্স।

"সুযোগ পেলে দিনেও খেলে," কথাটা বলেই বাস্টার্ড বসার জন্য ইশারা করলো মেয়েটাকে।

"থ্যাঙ্ক ইউ," মুচকি হেসে বললো টাইট জিন্স।

"ওয়াইন চলবে?" মেয়েটার উদ্দেশ্যে বললো সে। "শিউর।"

ওয়েটারকে ডেকে একটা ওয়াইনের অর্ডার দিয়ে দিলো। "আমি পিনাকী।"

"হ্যালো মি: পিনাকী। আমি অঞ্জলী।"

"নাইস নেইম।"

"থ্যাঙ্কস।"

ওয়াইন আর বিয়ার চলে এলে মেয়েটাকে অফার করলো পান করার জন্য। তারা দুজনেই পান করতে শুরু করলো।

"তোমার অন্য বান্ধবীদের দেখছি না যে?"

ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইলো অঞ্জলী, "আমার বান্ধবীদেরও চেনা হয়ে গেছে দেকচি!"

"সবাইকে না...শুধু টুম্পা, সুষমা আর শিমকিকে চিনি।"

"ওমা, আর বাকি থাকলো কে!"

"কেন, তুমি?" হেসে বললো সে।

"ওদের ছেড়ে আমাকে ভাল্লাগবে তো?" ন্যাকা ন্যাকা সুরে বললো মেয়েটি।

"আগে যদি তোমাকে দেখতাম তাহলে ওদের কাছে যেতামই না।"

অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো অঞ্জলী। "আমাকে তোমার মনে ধরেছে বুঝি?"

"ধরেছে দেখেই তো ডাকলাম।" একটু থেমে আবার বললো, "ইউ আর সো হট!"

"বাপরে, এতো অল্প সময়েই এভাবে কথা বলছে! অনেক মেয়ে ঘেঁটেছে নাকি এ জীবনে?"

"আহ, এভাবে বোলো না। মেয়েরা আমার কাছে আবর্জনা নয় যে ঘাঁটাঘাঁটি করবো। তারা আমার কাছে একেকটি ফুল। আর ফুলের গন্ধ নিতে আমার খুব ভালো লাগে।"

"বাব্বা, কথাও বলতে জানো দেকচি।" একটা বিয়ার খুলে চুমুক দিলো অঞ্জলী।

"তোমার বান্ধবীরা কোথায়?...দেখছি না যে?"

"আবার ওদের কথা বলা হচ্ছে কেন, মিস্টার?"

"কারণ, ওরা আসার আগেই তোমাকে নিয়ে কেটে পড়তে চাই।"

"ডোন্ট অরি, ওরা আসবে না।"

"কেন, ওরা কি এখন এখানে আসে না?"

"সুষমা আর শিমকি আজকাল নীচে আসে না। তবে টুম্পা আসে। ওকে নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই। আমাদের মধ্যে ওসব হিংসেটিংসে হয় না, বুঝলে?"

"গুড।" কথাটা বলেই মেয়েটার চুলে আলতো করে হাত বোলালো। "সুষমা আর শিমকি নীচে আসে না কেন?"

"রাজরাণী হয়ে গেছে যে...উপর তলায় যায় তো তাই আজকাল মাটিতে পা পড়ে না।"

"উপর তলা মানে?"

একটু কাছে এসে ঝুঁকে বললো অঞ্জলী, "এই রেস্টুরেন্টের মালিক আছে না, ঐ যে মৃণাল বাবু...সুষমা তো এখন ওর সাথেই রেগুলার যায়।"

"আর শিমকি?" বাস্টার্ড বিয়ারে চুমুক দিয়ে বললো।

"মৃণাল বাবুর সাথে তার এক বন্ধু থাকে...শিমকিকে লোকটার খুব মনে ধরেছে বোধহয়। এ কদিন ধরে তো দেখছি ও একবার উপরে গেলে সহজে নামে না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "ঐ যে কালোমতো লোকটাই কি মৃণাল বাবুর বন্ধু?"

"আরে ওরা দুজনেই কালো। মৃণাল বাবুর গোঁফ আছে, ওর বন্ধুর নেই।"

আচ্ছা! একটু চুপ করে থেকে বললো, "টুম্পা কার সাথে আছে এখন?"

"ও কারো সাথে নেই। আমার মতো...এখানে রোজই আসে।"

"এখনও কি সুষমা আর শিমকি উপরে আছে?"

"একটু আগে মৃণাল বাবু বের হয়ে গেলে শিমকিকে উপরে যেতে দেখেছি। মৃণাল বাবুর ঐ বন্ধুর তো আবার খিদে বেশি।"

বাস্টার্ড নড়েচড়ে বসলো। "এখান থেকে যেতে দেখলে? কিভাবে? আমি তো জানি উপরে যেতে হলে পেছন দিয়ে যেতে হয়।" বিস্মিত হবার ভান করলো সে।

"কে বলেছে শুধু পেছন দিয়ে যেতে হয়?"

"ঐ যে ম্যানেজার, শীতল বাবু বলেছে।"

"মিথ্যে বলেছে...ম্যানেজারের রুমের পাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি আছে না, ওটা দিয়েও

যাওয়া যায়। লোকটা এমন ভান করে যেনো চার তলায় সাত রাজার ধন লুকিয়ে রেখেছে।"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছো, তুমি।" বিয়ারে চুমুক দিলো বাস্টার্ড। "ওখানে আছেটা কী?"

"কিছু নেই, তবুও এতো লুকোছাপা।" তারপরই কপট অভিমানের সুরে বললো অঞ্জলী, "আচ্ছা, আমরা কেন অন্য মানুষদের নিয়ে এতো কথা বলছি?"।

"তাই তো!" বাস্টার্ডও সায় দিলো।

"বাদ দাও ওদের কথা।" বিয়ারে চুমুক দিয়ে আবার বললো অঞ্জলী, "এখন বলো, আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?"

"তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যাও। টাকা যা লাগে দেবো, বাট নিরাপদ হতে হবে।"

একটু ভেবে অঞ্জলী বললো, "ঠিক আছে। কাছেই আমার এক মাসতুতো বোন থাকে, তার ওখানে যাওয়া যেতে পারে। তবে এক হাজার টাকা দিতে হবে ওকে।"

"টাকা নিয়ে তুমি ভেবো না, ডার্লিং!"

"তাই? তোমার বুঝি অনেক টাকা?" কথাটা বলেই চোখ নাচালো মেয়েটা। "তাহলে আমকে কতো দেবে, বলি?"

"অনেক...একেবারে ভরে দেবো," ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বললো কথাটা।

"ওমা, তুমি দেখছি বড় নটি আছো?"

হেসে ফেললো বাস্টার্ড। এবার ওয়াইনের বোতল খুলে অঞ্জলীর গ্লাসে ঢেলে দিয়ে নিজেও কিছুটা নিলো। "চিয়ার্স ফর আওয়ার নেক্সট অ্যাডভেঞ্চার।

"নেক্সট অ্যাডভেঞ্চার!" গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকি হলো। "ওয়াও!" রহস্য করে বললো মেয়েটা।

"ইয়েস," মদে চুমুক দিয়ে মি: পিনাকী বললো। "বিকজ, আমি একটু ডিফারেন্ট কিছু করতে চাচ্ছি আজ।"

"সেটা আবার কেমন?" ভুরু নাচিয়ে বললো অঞ্জলী।

"তুমি আমি আর..." কথাটা বলেই চোখেমুখে লম্পটের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো বাস্টার্ড।

"আর কি?"

"টুম্পা।"

ভুরু কুচকে মুখ টিপে হাসতে লাগলো টাইট জিন্সের অঞ্জলী। "বাব্বা, তুমি এতো নটি! দেখে কিন্তু বোঝা যায় না।"

"দেখে কী মনে হয়?"

"মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দ...রাম নাম জপ করা ছাড়া আর কিছু করো না," বলেই হেসে ফেললো মেয়েটা।

বাস্টার্ডও দুষ্টুমিপূর্ণ হাসি হাসতে লাগলো। "বাট আজকে আমি রাম নাম নয়...অঞ্জলী-টুম্পার নাম জপ করতে চাইছি।"

"আমার দিক থেকে নো প্রবলেম,.বাট টুম্পা রাজি হবে তো?"

"হবে," মদে চুমুক দিয়ে বললো বাস্টার্ড। "না হবার তো কিছু নেই। উই আর গোয়িং টু হ্যাভ এ গ্রেট ফান!"

হা হা করে হেসে ফেললো অঞ্জলী। "আই থিঙ্ক আম গোনা লাইক ইউ," মদে চুমুক দিয়ে বললো সে।

"আই হোপ সো," মেয়েটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বললো বাস্টার্ড, "আশা করি তোমরা..." চারপাশটা একবার চকিতে দেখে নিলো। হ্যাঁ, যাকে দেখার কথা দেখতে পেয়েছে। "...দীর্ঘদিন আমাকে মনে রাখবে।"

জেফরি বেগ জানে বাস্টার্ড এখন ঢাকায় নেই।

রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ দু'জন লোকের কাছ থেকে কোলকাতার ঠিকানা জানতে পেরে সে আর দেরি করে নি, চলে গেছে পশ্চিমবঙ্গে। এজন্যেই তিন-চার দিন ধরে রঞ্জুর দলের বিরুদ্ধে পর পর কয়েক দিনে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড হঠাৎ করেই যেনো থেমে গেছে। ঝন্টুর কাছ থেকে ঠিকানা জেনে বাবু বিনয় কৃষ্ণকে হত্যা করে সোজা চলে গেছে কোলকাতায়। তার ধারণা দু'তিন দিন আগেই এই ভয়ঙ্কর খুনি কোলকাতায় চলে গেছে।

সিদ্ধান্ত নিতে আর দেরি করলো না। হোমিসাইডের মহাপরিচালক ফারুক আহমেদের কাছ থেকে অথোরাইজেশন নিয়ে কোলকাতার মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনারকে ফোন করে বিস্তারিত জানিয়ে দিলো সে।

চায়না টাউনের মাউন্ট অলিম্পাস রেস্টুরেন্ট। সেখানকার চার তলায় বসবাস করে ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী, বহু হত্যা-খুন আর চাঁদাবাজির হোতা ব্ল্যাক রঞ্জু। কিন্তু কমিশনারের জন্যে সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হলো, আরেক ভয়ঙ্কর খুনি ওখানে গেছে রঞ্জুকে খুন করতে। জেফরির আশংকা আশেপাশের অনেক নিরীহ লোকজন এসবের মাঝখানে পড়ে প্রাণ হারাতে পারে। নিজের শহরের নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তার জন্যেই কমিশনারের উচিত এক্ষুণি পদক্ষেপ নেয়া। খুনি কিছু করার আগেই সন্ত্রাসীকে অ্যারেস্ট করতে পারলে একটা রক্তাক্ত ঘটনা এড়ানো যাবে সেইসাথে বিরাট একটি ষড়যন্ত্রও উন্মোচিত করা সম্ভব হবে। তবে পুলিশকে যেনো সতর্ক করে দেয়া হয় খুনি এবং তার টার্গেট উভয়েই ভয়ঙ্কর প্রকৃতির। তাদের কাছে রয়েছে অত্যাধুনিক অস্ত্র। আর জায়গাটা জনপ্রিয় রেস্টুরেন্ট হওয়াতে কাস্টমারদের নিরাপত্তার কথাও যেনো মাথায় রাখা হয়। খুনির একটি ছবি এক্ষুণি ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দেবে সে। আরো সাহয্যের দরকার হলে তাকে যেনো ফোন করা হয়।

সব শুনে কমিশনার আশ্বাস দিলেন, তিনি এখনই ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তাকে খবরটা জানানোর জন্যে জেফরি এবং হোমিসাইডকে ধন্যবাদও জানালেন ভদ্রলোক। অল্পক্ষণের এই ফোনালাপে তিনি এটা জানাতেও ভুললেন না যে, তার আদি নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলায়। পিতা আর পিতামহের আদি নিবাসে তিনি প্রায়ই আসেন সপরিবারে। ফোন রাখার আগে কমিশনার জানালেন, কি হলো না হলে সে সম্পর্কে তিনি জেফরিকে অবহিত করবেন কিছুক্ষণ পর পর।

ফোনটা রেখেই জামানকে বলে দিলো কম্পিউটারে রিকন্সট্রাক্ট করা বাস্টার্ডের ছবিটা যেনো এক্ষুণি কোলকাতার মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনারকে ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

জেফরি বেগ কিছুক্ষণ চুপ মেরে বসে রইলো। বেলকাতার পুলিশ যদি দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে তাহলে ভয়ঙ্কর সেই খুনি ধরা না পড়লেও রঞ্জু ধরা পড়বে। নস্যাৎ হয়ে যাবে বিরাট একটি ষড়যন্ত্র।

তারপর ঐ খুনিকে সে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবে, কারণ এখন তার আঙুলের ছাপ জেফরির কাছে রয়েছে। খুব দ্রুতই তাকে ধরা সম্ভব হবে। কিভাবে তাকে ধরা হবে সে ব্যাপারে বাস্টার্ডের কোনো ধারণাই নেই।

ব্যাপারটা ভাবতেই এক ধরণের শিহরণ বয়ে গেলো জেফরি বেগের শরীরে।

মদ্যপান আর কথাবার্তা সমানে চলতে লাগলো মাউন্ট অলিম্পাসের ভেতরে। মি: পিনাকী আর মিস অঞ্জলী আসন্ন অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে উত্তেজিত, শিহরিত।

বাস্টার্ড আসলে সময়ক্ষেপণ করছে। কিছু বিষয়ে নিশ্চিত জানা দরকার তার। মাউন্ট অলিম্পাসের চারতলায় দেবতা জিউসের সাথে আর কে কে আছে, কি রকম লোকজন আছে এইসব। সে জানে না ওখানে সব সময় কতোজন থাকে, আর তাদের কাছে আদৌ কোনো অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা। চার তলায় রঞ্জুর আখড়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া মাত্রই দেরি করবে না। এমনকি সে যদি দেখতে পায় মাউন্ট অলিম্পাস থেকে স্বয়ং জিউস নেমে আসছে তাহলেও দেরি করবে না। কারণ তার মিশনটা খুব কঠিন হলেও একদিক থেকে এটা একেবারে সহজ সরল : স্রেফ রঞ্জুকে খুন করা।

তবে খুন করা যতোটা সহজ হবে তার পরের কাজগুলো ততটা সহজ হবে না বলেই তার বিশ্বাস। বিশেষ করে চায়না টাউন থেকে বের হওয়াটা একটু কঠিন হয়ে যেতে পারে যদি না একটা বিরাট হট্টগোল বাধায়। হট্টগোল একটা ঠিকই বাধাবে সে। তার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। শুধু সময়টা ঠিক করতে পারছে না। এ নিয়ে তার মধ্যে কোনো অস্থিরতাও নেই, কারণ হাতে প্রচুর সময় আছে। ধীরেসুস্থে কাজ করাই ভালো। দেখা যাক সুযোগটা কখন আসে।

"তাহলে আমরা কখন যাচ্ছি?" অঞ্জলী বললো।

সম্বিত ফিরে পেয়ে বাস্টার্ড মেয়েটার দিকে তাকালো। "কী বললে?"

"বাব্বা! তুমি দেখছি স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছো...কোথায় ছিলে গো?"

হেসে ফেললো সে। "কী যেনো বলছিলে?"

"বলছিলাম, কখন যাবো আমরা...ভালো কথা, টুম্পা কখন আসছে?"

একটু ভেবে নিলো বাস্টার্ড। "টুম্পা এক্ষুণি এসে যাবে। ও এলেই আমার চলে যাবো। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে," একটু টেনে বললো অঞ্জলী।

বাস্টার্ড নড়েচড়ে বসলো। চকিতে হাত ঘড়িটা দেখে নিলো সে। "আচ্ছা, দাঁড়াও, টুম্পাকে ফোন দেই। দেখি ও কোথায় আছে।"

"দাও, ওকে বলো জলদি চলে আসতে," অঞ্জলী মদে চুমুক দিতে শুরু করলো।

একটা নাম্বারে ডায়াল করলো বাস্টার্ড। "হ্যাঁ, তুমি কোথায়?" ওপাশ থেকে কী বলা হলো সেটা বোঝা গেলো না। "আচ্ছা, আসো...আর মাত্র কয় মিনিট?...ঠিক আছে। রাখি।"

"কি বললো ও?" জানতে চাইলো অঞ্জলী।

"আসছে। কাছেই এসে পড়েছে। বেশিক্ষণ লাগবে না। মেয়েটাকে আরো ড্রিংক ঢেলে দিলো সে।

"আরে, আমাকে এতো দিচ্ছো কেন...তুমিও নাও, তোমার গ্লাস তো দেখি একেবারেই খালি।"

"আমার একটু ওয়াশরুমে যেতে হবে, সেজন্যে আর নিচ্ছি না। তুমি একটু বসো, আমি ওখান থেকে আসি।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মুচকি হাসলো অঞ্জলী।

বাস্টার্ড উঠে চলে গেলো রেস্টুরেন্টের পেছনে। ওখানেই ওয়াশরুমটা। এর আগে এখানে এসে দেখে গেছে ওয়াশরুমের পাশেই ম্যানেজারের রুম আর তার ঠিক পাশেই একটা সিঁড়ি আছে, যেটা চলে গেছে উপর তলায়। সেই সিঁড়ির নীচে বৈদ্যুতিক মিটার, মেইনসুইচ এসব আছে। ওয়াশরুমে ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিলো সে। পকেট থেকে দুটো দেয়াশলাইয়ের বাক্স বের করলো, এরমধ্যে একটি ম্যাচবক্সের সবগুলো কাঠির বারুদের অংশ বের করে বাক্সটা লাগিয়ে রাখলো যাতে করে কাঠিগুলো আঁটকে থাকে। এবার একটি রাবার ব্যান্ড বের করে সেই দেয়াশলাইয়ের বাক্সে একটা জ্বলন্ত সিগারেট পেঁচিয়ে রাখলো এমনভাবে যাতে করে সিগারেটটার আগুন কিছুক্ষণের মধ্যেই দেয়াশলাইয়ের বারুদ স্পর্শ

করে। কাজটা করার সময় একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেলো তার : ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগের হাত থেকে বাঁচার জন্য ঠিক এমনই একটা কাজ করেছিলো সে। তবে সেবার ব্যবহার করেছিলো গ্যাসের চুলার গ্যাস। এবার সে ব্যবহার করবে বৈদ্যুতিক মিটার আর সার্কিটবোর্ড।

আরেকটা দেয়াশলাই বের করে সেটার মুখ একটু খুলে রাখলো। এই বাক্সে আছে গানপাউডার।

ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে সিঁড়ির নীচে এসে পড়লো। চারপাশটা আরেকবার দেখে নিলো সে। না, কেউ নেই। জায়গাটা এমনিতেও নিরিবিলি থাকে। ইলেক্ট্রিক্যাল সার্কিটবোর্ডের কাছে গিয়ে মেইনসুইচের উপর সিগারেটসহ দেয়াশলাইটা সুন্দর করে রেখে দিয়ে হাটা ধরলো, তবে গানপাউডার ভর্তি দেয়াশলাইটা বাম হাতে এমনভাবে ধরে রাখলো যেনো সেটার ফাঁক করা মুখ দিয়ে গানপাউডার পড়তে থাকে।

তাই হলো। অনেকটা পথ পর্যন্ত গানপাউডারগুলো সরু ধারায় পড়তে লাগলো, মেঝেতে গানপাউডারের একটি সরু রেখা তৈরি হলো যা কারো চোখে পড়বে না। রেস্টুরেন্টের মাঝখানে এসে একটা খালি টেবিলের নীচে সবার অলক্ষ্যে ম্যাচবাক্সটা ফেলে দিলো। সে জানে এখনও বাক্সে যথেষ্ট পরিমাণ বারুদ রয়ে গেছে। এটাই সে চেয়েছিলো।

নিজের টেবিলে ফেরার আগে একটা টেবিলের সামনে যাবার সময় বিড়বিড় করে কিছু একটা বললেও কেউ সেটা শুনতে পেলো না।

চেয়ারে বসতেই অঞ্জলী হেসে তার দিকে মদের গ্লাসটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, “এবার নাও…”

“থ্যাঙ্ক ইউ,” মদের গ্লাসটা হাতে নিয়েই আলতো করে একটা চুমুক দিলো।

“এখন ফ্রেশ লাগছে তো?”

“শিউর,” বললো সে।

আচমকা কিছু মানুষের হৈহট্টগোল শুনতে পেয়ে তারা দুজনেই ফিরে তাকালো সেদিকে।

খেলা শুরু হয়ে গেছে! মনে মনে বললো বাস্টার্ড।

অলিম্পাস হোটেলের কাস্টমাররা অবিশ্বাস্য চোখে চেয়ে আছে মাঝখানের এক টেবিলে দিকে। এক রাগি যুবক থাইসুপের পেয়ালা থেকে মৃত আরশোলা হাতে নিয়ে সবার উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করে বোঝাতে চাইছে এই রেস্টুরেন্টের লোকজন কতো কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে খাবার প্রস্তত করে থাকে, কতটা বাজে তাদের কিচেনের অবস্থা। উপর দিয়ে ফিটফাট থাকলেও আসলে এদের খাবারের মান এতো জঘন্য পর্যায়ে চলে গেছে। আরশোলাটা দেখেই দুতিনজন কাস্টমার, যারা কিনা এইমাত্র থাইসুপ মুখে দিয়েছিলো, বমি না করে পারলো না।

রেস্টুরেন্টের সবার মনোযোগ মাঝখানের টেবিলের রাগি যুবকের দিকে। ইতিমধ্যেই অনেকের সহমর্মিতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে সে। রাগেক্ষোভে চিৎকার করে শাসাচ্ছে রেস্টুরেন্টের সবাইকে। তাকে কোনোভাবেই শান্ত করতে পারেছে না ওয়েটাররা। এক বিতিকিচ্ছরি অবস্থা।

"উফ! কী অবস্থা!" অঞ্জলী বললো। "আস্ত একটা আরশোলা! এদের কিচেনের এমন হাল হয়েছে জানতাম না তো।"

বাস্টার্ড ওয়াক করে উঠলে মেয়েটা তার দিকে তাকালো। "কি হয়েছে তোমার?"

"আমার বমি বমি লাগছে...ঐ আরশোলাটা দেখে..." আবার একটা ওয়াক করলো।

"তুমি ওয়াশরুমে চলে যাও। এক্ষুণি।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মি: পিনাকী ওয়াশরুমের দিকে চলে গেলো আবার।

কিন্তু ওয়াশরুমে না ঢুকে আস্তে করে উঠে পড়লো দোতলায় যাবার সিঁড়িটা দিয়ে। সিঁড়িতে ওঠার আগে চকিতে দেখে নিলো জ্বলন্ত সিগারেটটা কাঠির বারুদ ছুঁই ছুঁই করছে। প্রচণ্ড হৈ হল্লার কারণে সবার মনোযোগ এখন রেস্টুরেন্টের ভেতরে। বাস্টার্ডকে কেউ খেয়ালই করলো না।

দোতলার ল্যান্ডিংয়ে আসার আগেই ধপ করে একটা শব্দ হলো, তার ঠিক কয়েক সেকেন্ড পরই রেস্টুরেন্টের ভেতরে সমস্ত বাতি বন্ধ হয়ে নেমে এলো ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচি। আতঙ্ক।

যেনো পাগলা ঘণ্টা বেজে গেছে মাউন্ট অলিম্পাস রেস্টুরেন্টের ভেতরে।

আগুন! আগুন!

একসাথে অনেকগুলো মানুষের চিৎকারটা গাঢ় অন্ধকারে ভীতিকর এক পরিবেশের সৃষ্টি করলো।

কানফাঁটা শব্দে বেজে উঠলো ফায়ার অ্যালার্ম।

দোতলার ল্যান্ডিংয়ে ছোট্ট একটা লোহার দরজার সামনে গাঢ় অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো বাস্টার্ড, শিকারীর ধৈর্য নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকলো। সে জানে ভেতর থেকে বন্ধ এই দরজাটা একটু পরই খুলে যাবে। এছাড়া চার তলার লোকগুলোর আর কোনো উপায় নেই। পেছন দিককার লোহার দরজাটা, যেটা তারা ব্যবহার করে সেটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে সামান্য একটি টিপ তালা দিয়ে।

দোতলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থেকেই টের পাচ্ছে অলিম্পাসের ভেতরে আগুনের লেলিহান শিখার থাবা বেশ ভালোভাবেই বিস্তার লাভ করেছে। গানপাউডারের আগুন কতো দ্রুত ছড়ায় সেটা সে ভালো করেই জানে, তার উপর ইলেক্ট্রিক সার্কিট আর প্রচুর পরিমাণের অ্যালকোহল যোগ করলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে বেশি লাগার কথা নয়। জেনারেটর থাকলেও সেটা যে কাজ করছে না তার কারণ সব ধরণের সার্কিট অচল হয়ে পড়েছে। এটাই সে চেয়েছিলো।

কিন্তু মাউন্ট অলিম্পাস থেকে জিউস নেমে আসছে না কেন?

প্রশ্নটা তার মনে উঁকি দিতেই লোহার দরজাটা ভেতর থেকে খোলার শব্দ পেলো। হাতে তুলে নিলো পিস্তলটা।

যে-ই দরজাটা খোলার চেষ্টা করুক না কেন, ঘন অন্ধকারে তালার মধ্যে চাবি ঢোকাতে বেগ পাচ্ছে। একটা উৎকণ্ঠিত নারীকণ্ঠ তার সমস্ত অনিশ্চয়তা দূর করে দিলো।

“জলদি করো, রঞ্জু!”

অন্য কণ্ঠটা জবাব দিলো, “মোবাইল ফোন দিয়ে আলো ফেলো, শিমকি। দেখতে পাচ্ছি না!”

বাস্টার্ড একদম প্রস্তুত। আর কোনো অনিশ্চয়তা নেই তার মধ্যে। দরজার ওপাশে আছে তার টার্গেট।

ব্ল্যাক রঞ্জু!

তালা খুলে ফেলার শব্দ পেলো সে। লোহার দরজাটা এক ঝটকায় খুলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে পর পর তিনটি থুতু ফেলার শব্দ! একটা জান্তব গোঙানি। সেই গোঙানির সঙ্গী হলো নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ম চিৎকার।

কিন্তু তাদের শব্দ নীচের হট্টগোল ছাপিয়ে যেতে পারবে না, বাস্টার্ড সেটা ভালো করেই জানে। অন্ধকারেই নারী কণ্ঠটা রোধ করতে পারলো কারণ মেয়েটার হাতে থাকা মোবাইল ফোনের কল্যাণে বুঝতে পারলো সে। ডিসপ্লেটা এখনও জ্বলছে।

এক হাতে শিমকি নামের মেয়েটার মুখ চেপে ধরে অন্য হাতে পিস্তলটা ঠেকালো মেয়েটার তলপেটে। “চুপ!” তার কণ্ঠটা যেমন ভীতিকর তেমনি ফিসফিসে। অন্ধকারে সেটা ভৌতিক শোনালো।

পায়ের কাছে কিছু একটা নড়ে উঠতেই আবার গুলি চালালো সে।

শুধুই থুতু ফেলার শব্দ।

মেয়েটা বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে। পেছন থেকে তার গলা জড়িয়ে শক্ত করে মুখটা চেপে রেখেছে।

“আওয়াজ করলেই গুলি করবো!”

মেয়েটা তার হাত থেকে ছোটার জন্য হাসফাস করা বন্ধ করে দিলো সঙ্গে সঙ্গে।

“হাতের মোবাইল ফোনটা দিয়ে তোমার পায়ের নীচে আলো ফেলো,” তলপেটে পিস্তলের নল দিয়ে খোঁচা মেরে মেয়েটাকে বললো সে।

মোবাইল ফোনের ডিসপ্লের স্বল্প আলোতেও ঘুটঘুঁটে অন্ধকারে বাস্টার্ড দেখতে পেলো ব্ল্যাক রঞ্জু চিৎ হয়ে দরজার কাছে পড়ে আছে। একটা গুলি লেগেছে রঞ্জুর ডান চোখের ঠিক উপরে।

নির্ঘাত মৃত্যু!

বুঝতে পারলো, অসংখ্য খুনের হোতা ব্ল্যাক রঞ্জু কোনো মৃত্যুযন্ত্রণাই ভোগ করে নি। আফসোস!

শিমকি নামের মেয়েটাকে কী করবে সেটা যখন ভাবছে ঠিক তখনই ঘটলো আরেকটি ঘটনা।

স্পষ্ট শুনতে পেলো সাইরেনের আওয়াজ।

ফায়ার সার্ভিস? এতো দ্রুত!

কাছেই তাহলে সিভিল ডিফেন্স আছে। তা না হলে এতো দ্রুত আসার কথা নয়। ভালোমতোই আগুন লেগে গেছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। দেরি করলে আগুনের কারণে বাইরে বের হতে পারবে না। ভালো করেই জানে সিঁড়ির নীচের আগুন আতঙ্কের চেয়ে বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। শিমকি নামের মেয়েটাকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে এক্ষুণি।

পিস্তল ধরা হাতটা একটু উপরে তুলে পিস্তলের বাট দিয়ে মেয়েটার ডান কানের উপর প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে বসলো সে। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট শব্দ করে ঢলে পড়লো শিমকি।

ব্ল্যাক রঞ্জুর পাশে মেয়েটাকে শুইয়ে দিয়ে নীচে নেমে এলো সে। এইফাঁকে পিস্তলটা গুঁজে ফেলেছে কোমরে।

সিঁড়ির নীচে, যেখানে আগুন লেগেছিলো সেখানে আসতেই দেখতে পেলো আগুন নিভু নিভু করছে। আগুনের ব্যাপকতা যে খুব বেশি হবে না সেটা সে জানতো। এই রেস্টুরেন্টে রয়েছে অটোমেটিক সার্কিটব্রেকার। শটসার্কিট হয় নি।

ওয়াশরুমটা পেরিয়ে রেস্টুরেন্টের ভেতরে দেখতে পেলো কার্পেট আর কিছু টেবিলে আগুন জ্বলছে এখনও। একটা কাস্টমারও নেই। নেই কোনো ওয়েটার।

আজব!

কেউ আগুন নেভানোর চেষ্টাও করে নি? বুঝতে পারলো, কর্মচারিদেরকে আগুন নেভানোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটাই হয়। এর ফলে আগুন নেভানোর সব ব্যবস্থা থাকলেও তাতে কোনো কাজ হয় না।

ঠিক এই সময় মেইনগেটের সামনে যে দৃশ্যটা দেখতে পেলো সেটার জন্যে মোটও প্রস্তুত ছিলো না সে।

নক্সা করা কাঠের তৈরি বিশাল দরজাটা পুরোপুরি খোলা। সেটা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে একদল লোককে। তারা ভেতরে আসতে উদ্যত।

পুলিশ!

জেফরি বেগ উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ আগে কোলকাতা থেকে খবর এসেছে চায়না টাউনের মাউন্ট অলিম্পাস নামের রেস্টুরেন্টে বিরাট হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে। পুলিশ যাবার আগেই রেস্টুরেন্টের ভেতরে আগুন লেগে যায়। বিদ্যুত চলে গিয়ে অন্ধকার হয়ে যায় পুরো ভবনটি। পুলিশের দল ইতিমধ্যেই রেস্টুরেন্টটির সামনে অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। তারা ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে বলেও জানানো হয়েছে তাকে।

জেফরি নিশ্চিত এটা বাস্টার্ডের কাজ, কিন্তু কোলকাতার পুলিশ অপারেশন চালাচ্ছে সেটা তো ঐ খুনির জানার কথা নয়। অথচ সে জেনে গেছে। পুলিশের কাছে যে ছবি দেয়া হয়েছে সেটা আগুনের ভয়ে দৌড়ে বাইরে আসা কাস্টমার আর ওয়েটারদের দেখালে তারা নিশ্চিত করেছে এরকম দেখতে এক লোক রেস্টুরেন্টে ছিলো। তবে আগুন লাগার পর তাকে আর দেখা যায় নি।

অদ্ভুত!

দশ মিনিট আগে যখন তাকে জানানো হলো তখনও গোলাগুলির কোনো ঘটনা রিপোর্ট করা হয় নি। পুলিশ নিশ্চিত, বাস্টার্ড নামের খুনি এখনও রেস্টুরেন্টের ভেতরেই আছে। তাদের সন্দেহ, রঞ্জু যেখানে থাকে, চার তলার উপরে হয়তো সে আটকা পড়ে গেছে।

কিন্তু চার তলার উপরে যদি রঞ্জু থেকে থাকে তাহলে বলতেই হবে এতোক্ষণে সে বাস্টার্ডের শিকার হয়ে গেছে। কুখ্যাত এই খুনি-সন্ত্রাসী আর বেঁচে নেই। আবার এমনও হতে পারে বাস্টার্ডই রঞ্জুর শিকার বনে গেছে। নিশ্চিত করে কিছু বলার উপায় নেই। এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে আর কিছুক্ষণ পরই। যে খুনিকে হাতের কাছে পেয়ে ধরতে পারে নি তাকে এখন শত শত মাইল দূর থেকে ধরে ফেলতে যাচ্ছে। ব্যাপারটা ভাবতেই শিহরিত হলো সে।

অমনি তার ডেস্কের ফোনটা বেজে উঠলো। দ্রুত তুলে নিলো সেটা। নিজের পরিচয় দেবার পর ওপাশ থেকে কিছু কথা শুনে কেবল "ইয়েস...ইয়েস...ও মাইগড!...অ্যাজ আই টোল্ড ইউ বিফোর, হি ইজ অ্যা ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস ম্যান....অ্যান্ড ভেরি ইনোভেটিভ...ইউ মাস্ট বি কেয়ারফুল...ওকে, থ্যাঙ্ক ইউ...থ্যাঙ্ক ইউ অ্যাগেইন," বলে ফোনটা রেখে দিলো।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে জানতে চাইলো জামান, "স্যার, কি হয়েছে?"

"পুলিশকে লক্ষ্য করে অলিম্পাসের ভেতর থেকে কয়েক রাউন্ড গুলি করা হয়েছে!"

মাউন্ট অলিম্পাসের মেইনগেট দিয়ে পুলিশের দলটাকে ঢুকতে দেখেই বাস্টার্ডের শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটি প্রবাহ বয়ে যায়। কোনো কিছু ভাবার আগেই বুঝতে পারে সে পেছন দিকে দৌড়ে ছুটে যাচ্ছে।

স্বতঃফুর্ত প্রতিক্রিয়া।

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত উঠে যায় চার তলায়। ব্ল্যাক রঞ্জুর ডেরায়। জানালা দিয়ে যে আলো আসছে তাতে দেখতে পায়, ফাঁকা, পরিত্যাক্ত কোনো জায়গা যেনো। সামনের ঘরটা আয়তনে বিশাল। সোফা আর চেয়ারটেবিল পাতা আছে। বেশ সাজানো গোছানো। তবে সেসব দেখার সময় ছিলো না বাস্টার্ডের। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় ভেতরের রুমে। বিলিয়ার্ড টেবিল, ছোটোখাটো একটি বার, বিশাল পর্দার এলসিডি টিভিসহ অনেক কিছুর সমাহার সেখানে।

বাস্টার্ড ভেবেছিলো ফায়ার সার্ভিস এসেছে, কিন্তু না, এসেছে পুলিশ। কোলকাতা পুলিশের সাদা পোশাকটি তার চেনা। তার দেখায় কোনো ভুল নেই। স্পষ্ট দেখেছে সে। একজন দু'জন নয়, মেইনগেটের সামনে যে পরিমাণ পুলিশ দেখেছে তাতে নিশ্চিত, রীতিমতো বিরাট একটি দল নিয়ে এখানে ছুটে এসেছে তারা। ভেতরে একদল ঢুকেছে, নিশ্চয় আরেকদল ব্যাকআপে আছে। তার মানে অনেক!

এই স্বল্প সময়ে সে কিছুতেই বুঝতে পারলো না পুলিশ এখানে কিভাবে এলো। কে পুলিশকে খবর দিলো? রেস্টুরেন্টের কেউ যদি খবরটা দিয়ে থাকতো তাহলে এতো দ্রুত পুলিশ আসতো না। অসম্ভব!

তবে এ নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করে নি সে। মাথাটা দ্রুত কাজ করতে শুরু করে। একটা ভাবনা মাথায় আসতেই ছুটে যায় সিঁড়ির দিকে। দোতলার ল্যান্ডিংয়ে এসে বুঝতে পারে পুলিশ সতর্কতার সাথে, পজিশন নিয়ে ফেলেছে রেস্টুরেন্টের ভেতরে। পুলিশ যাতে হুরমুর করে উপরে উঠে না আসে সেজন্যে একটা কাজ করার আছে।

এক ঝটকায় পিস্তলের সাইলেন্সরটা খুলে ফেলে, তারপর সিঁড়ির নীচে লক্ষ্য করে পর পর তিনটি গুলি করেই অপেক্ষা করে প্রতিক্রিয়ার জন্য।

"ক্রলিং! ক্রলিং! এভরিবডি ক্রলিং!" একটা কণ্ঠ চিৎকার করে বলে ওঠে।

আরেকটা গুলি চালালেও পাল্টা জবাব দেয়া হয় না। বাস্টার্ড আর অপেক্ষা করে নি, দোতলার ল্যান্ডিংয়ে লোহার দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়। ব্ল্যাক রঞ্জু আর শিমকি নামের মেয়েটা পড়ে আছে দরজার কাছেই। দু'জন মানুষকে টপকে ফায়ারএস্কেপ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যায় সে।

পুলিশ সম্ভবত সিঁড়ি দিয়ে উপরের তলাগুলো খুঁজে দেখবে। ফায়ারএস্কেপ সিঁড়িটার কথা জানতে পারবে চার তলায় গেলে। তার মানে কিছুটা সময় সে পাবে। কিন্তু এটাও বুঝতে পারে, নিজেই নিজের ফাঁদে পড়ে গেছে। এখান থেকে বের হবার একটা মাত্র উপায়ই আছে : ফায়ারএস্কেপ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাওয়া।

হতাশাজনক ব্যাপার হলো, বাইরে থেকে সেই দরজাটাও বন্ধ করে রেখেছে টিপ তালা মেরে। ভেবেছিলো রঞ্জুকে বাধ্য করবে রেস্টুরেন্টের ভেতর দিয়ে আসার জন্য। সেইমতোই কাজ হয়েছে কিন্তু এখন পুলিশের আগমনে সে নিজেই ফাঁদে পড়ে গেছে।

তার কাছে পিস্তল ছাড়া আর কিছু নেই, গুলির পরিমাণও খুব বেশি নেই এখন। এ দিয়ে এতোবড় বিশাল পুলিশ বাহিনী কোনোভাবেই মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

ঠিক তখনই বুদ্ধিটা মাথায় আসে। পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে একটা নাম্বারে ডায়াল করে সে।

"মৃদুল?"

"বস, আপনি কোথায়?" মৃদুলের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

"তুমি এখন কোথায় আছো?" তাড়া দিলো বাস্টার্ড।

"আমি ঐ রেস্টুরেন্ট থেকে কোনোমতে বের হয়ে গেছি...এখন আছি মেইনরোডে।"

"তুমি তাড়াতাড়ি ঐ রেস্টুরেন্টটার পেছনে চলে আসো।"

"পুলিশ আছে তো, বস।"

"না। ওখানে পুলিশ নেই...যদি থাকে তাহলে আমাকে ফোন করে জানিও। না থাকলে একটা কাজ করতে হবে।"

"কি কাজ, বলেন?"

"পেছন দিকে একটা লোহার দরজা আছে, তালা মারা। যেভাবেই হোক তালাটা খুলতে হবে তোমাকে...জলদি।"

মৃদুল একটু ভেবে বললো, "ঠিক আছে বস, আমি এক্ষুণি আসছি।"

সিঁড়ি ভেঙে কতোগুলো লোক উপরে উঠে আসছে, শব্দ শুনেই বুঝতে পারলো সে। এরকম অসহায় অবস্থায় খুব কমই পড়েছে জীবনে। কিভাবে এখান থেকে বের হবে তার মাথায় ঢুকছে না। পেছন দিকের গেটের ওখানে যদি পুলিশ গিয়ে থাকে তাহলে তার আর কোনো আশা নেই।

পুলিশ কেন এতো দ্রুত চলে এলো সেই ভাবনাটা তার মাথায় জেঁকে বসলো আবার। এ প্রশ্নের কোনো জবাব খুঁজে পাচ্ছে না। রেস্টুরেন্টে পুলিশের এই আগমন তার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি আজকের অপারেশনে এরকম কিছু হবে।

ফায়ারএস্কেপের সিঁড়ির নীচে, লোহার দরজার সামনে অপেক্ষা করতে থাকলো সে।

জামান খেয়াল করছে তার বস জেফরি বেগের উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। সুদূর কোলকাতায় কি ঘটছে সে সম্পর্কে জানার জন্য ছটফট করছে রীতিমতো। জামান জানে, লেখক জায়েদ রেহমানের খুনি হিসেবে বাস্টার্ডকে ধরার যে ব্যর্থতা তার জন্যে তার বসের মনে গহীনে একটা চাপা আক্ষেপ আছে। আজ যদি বাস্টার্ড জীবিত অথবা মৃত ধরা পড়ে তাহলে সেই ব্যর্থতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাবে সে।

দশ মিনিট আগে শেষ কলটা আসার পর থেকেই নিজের রুমে পায়চারি করছে। বসকে উঠতে দেখে জামানও উঠে দাঁড়িয়েছিলো কিন্তু তার কাঁধে হাত রেখে তাকে বিরত করেছে জেফরি।

"আমি নিশ্চিত, বাস্টার্ড ভেতরে আছে," বললো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর। পুলিশের উদ্দেশ্যে গুলি করেছে!"

"বস, ব্ল্যাক রঞ্জুও তো হতে পারে?" বললো জামান।

পায়চারি থামিয়ে সহকারীর দিকে তাকালো জেফরি। "এটা বাস্টার্ড। আমি নিশ্চিত।"

"কি কারণে আপনার মনে হচ্ছে বাস্টার্ডই গুলি চালিয়েছে?"

"কারণ, ব্ল্যাক রঞ্জু খুব সম্ভবত সাথে অস্ত্র রাখে না। ওটা হলো তার নিরাপদ জায়গা। ওখানে অস্ত্র রাখার কোনো দরকারই নেই। এটা ঝন্টুও বলেছে আমাকে। আমি তার কথাটা বিশ্বাস করেছি।"

জামান মাথা নেড়ে সায় দিলো। রঞ্জুর কাছে যদি কোনো অস্ত্র না-ই থেকে থাকে তাহলে গুলিটা অবশ্যই বাস্টার্ড চালিয়েছে। তার মানে, ব্ল্যাক রঞ্জু হয় মরেছে, না হয় বাস্টার্ডের সাথে সাথে সেও পুলিশের কাছে ধরা পড়বে।

ডেস্কের ফোনটা বেজে উঠলে জেফরি বেগ ছুটে গিয়ে সেটা ধরলো। "হ্যালো, জেফরি বেগ স্পিকিং।"

জামান দেখতে পেলো তার বসের চেহারাটা হতাশার কালো ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে। ওপাশ থেকে কী বলা হচ্ছে সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই তবে খুব ভালো কোনো খবর যে দেয়া হচ্ছে না সেটা বুঝতে পারছে।

বিমর্ষ হয়ে ফোনটা রেখে দিলো জেফরি বেগ। দু'হাত ডেস্কের উপর ভর দিয়ে চেয়ে রইলো সহকারি জামানের দিকে।

"খারাপ খবর?"

"খবরটা খারাপ না ভালো বুঝতে পারছি না," চিন্তিতভাবে বললো জেফরি বেগ।

"কি হয়েছে, স্যার?"

"ব্ল্যাক রঞ্জু খুন হয়েছে। পুলিশ তার ডেডবডি রিকভার করেছে একটু আগে।"

জামান সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। সে জানে এটাই একমাত্র খবর না। "আর বাস্টার্ড?"

"পালিয়েছে!" টেবিলে একটা ঘুষি মেরে বললো ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ, "বাস্টার্ড!"

মৃদুল ছেলেটা ইচ্ছে করলে তাকে এমন বিপদে রেখে সটকে পড়তে পারতো। কিন্তু ছেলেটা প্রচণ্ড সাহসী। তারচেয়েও বেশি বিশ্বস্ত। বাস্টার্ডকে সাহায্য করার জন্য বিরাট ঝুঁকি নিয়ে পুলিশে ঘিরে থাকা মাউন্ট অলিম্পাস রেস্টুরেন্টে ফিরে আসে সে।

রেস্টুরেন্টের সামনে প্রচুর সংখ্যক পুলিশ দেখে ভড়কে না গিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের জটলার ভেতর থেকে লক্ষ্য করে পুলিশ শুধুমাত্র অলিম্পাসের সামনের দিকে পজিশন নিয়ে আছে। কারণটা সহজ। অলিম্পাসের দু'পাশে গা ঘেষা দুটো চার-পাঁচ তলার ভবন আছে। তারপরও পুলিশ কেন পেছন দিকটায় যায় নি মৃদুল সেটা বুঝতে পারলো একটু পরই।

সবার মনোযোগ রেস্টুরেন্টের সামনের দিকে, সুতরাং আস্তে আস্তে হেঁটে রেস্টুরেন্টটার পেছনে চলে আসতে মৃদুলের কোনো সমস্যা হলো না। পেছন দিকটা কানাগলি। কিন্তু সে বিস্ময়ের সাথে দেখতে পেলো পেছনে কোনো লোহার দরজাই নেই।

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে কল করে সে।

"বস! পেছনে তো কোনো দরজা দেখতে পাচ্ছি না!" কলটা রিসিভ করা মাত্রই বলে মৃদুল।

"কি!" দারুণ অবাক হলো ফায়ারএস্কেপ সিঁড়িতে অবরুদ্ধ হওয়া বাস্টার্ড। "ভালো করে দ্যাখো!" তাড়া দেয় সে।

মৃদুল ফোনটা কানে চেপে রেখে পেছন দিকটা ভালো করে দেখে। কিছু নেই। শুধু একটা হাতে টানা রিক্সা ছাড়া। কোলকাতা শহরের অতিপরিচিত একটি হাতে টানা রিক্সা ভবনের পেছনের দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে।

"বস, কোনো দরজা নেই...পেছনটা একেবারে খালি। শুধু একটা হাতে টানা রিক্সা দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে।"

"হাতে টানা রিক্সা?" বাস্টার্ড একটু ভেবে নেয়। সে যখন পেছন দিকটায় গেছিলো তখন এরকম কিছু ছিলো না। হতে পারে কিছুক্ষণ আগে কেউ হয়তো সেটা রেখেছে। তার মানে কি দরজাটা সেই রিক্সার কারণে আড়াল হয়ে আছে? "মৃদুল?...রিক্সাটার পেছনে ভালো করে দ্যাখো। আমার মনে হয় দরজাটা সেজন্যেই তুমি দেখতে পাচ্ছে না।"

মৃদুল বুঝতে পারে তার বস ঠিকই বলেছে। একটু কাছে এসে ভালো করে দেখতেই বুঝতে পারে ছোট্ট একটা লোহার গেট রিক্সাটার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। বুঝতে পারে এই রিক্সাটা রাখার কারণেই পুলিশের চোখে ফায়ারএস্কেপের দরজাটা আড়ালে থেকে যায়। যার কারণে তারা আর এখানে কোনো পাহারার ব্যবস্থা করে নি।

"বস, দরজাটা খুঁজে পেয়েছি...একটা তালা মারা আছে। তালাটা ভাঙছি আমি, চিন্তা করবে না," মৃদুল বলে।

দরজার ওপাশে হাফ ছেড়ে বাঁচে বাস্টার্ড। সে টের পায় পুলিশের দল দোতলা-তিনতলা কিংবা চার তলায় ঢুকে তল্লাশী শুরু করে দিয়েছে। সময় বেশি নেই। মনে মনে এই কামনাই করেছিলো, মৃদুল যেনো তালা ভাঙতে বেশি সময় না নেয়। কপালে হাত দিয়ে দেখে টেনশনে ঘাম জমতে শুরু করে দিয়েছে।

এদিকে মৃদুল ফোনটা রেখেই হাতে টানা রিক্সাটা টেনে একটু সরিয়ে রাখে। একটা সামান্য টিপ তালা। শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করলেই চিচিংফাঁক হয়ে যাবে। আশেপাশে তাকিয়ে শক্ত কিছু খোঁজে। একটু দূরে বড়সড় ইটের টুকরো পড়ে ছিলো। সেটা তুলে এনে তালার উপর সজোরে আঘাত করে সে। পর পর তিন আঘাতে তালাটা ভেঙে যায়।

দরজা খুলে বের হতেই মৃদুলের মুখে চওড়া হাসি দেখতে পায় বাস্টার্ড। ছেলেটার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, "দারুণ কাজ করেছো...এখন বলল, কোন্‌দিক দিয়ে যাওয়া যাবে?"

মৃদুল একটু ভেবে বলে, "দাঁড়ান, আমি দেখে আসি রেস্টুরেন্টের সামনে কী অবস্থা।"

কথাটা বলেই ছেলেটা চলে যায়, ফিরে আসে কিছুক্ষণ পরই।

"কি ব্যাপার?" উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চায় সে।

"বস্, সামনে অনেক পুলিশ, এখন লোকজনের ভীড়ও বেড়ে গেছে। এদিক দিয়ে যেতে হলে একটা কেওয়াস লাগাতে হবে।"

দ্রুত ভেবে নেয় বাস্টার্ড। "লোকজন ভয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলে কাজ হবে?"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলে মৃদুল, "হবে। কিন্তু কিভাবে এটা করবেন?"

"তোমার কাছে ম্যাচবক্স আছে?" মৃদুলকে বলে সে। বাস্টার্ড জানতো মৃদুল ধূমপায়ী।

মৃদুল পকেট থেকে একটা ম্যাচবক্স বের করে দেয়।

পকেট থেকে একটা ম্যাগাজিন বের করে সেটা থেকে ছয়-সাতটা গুলি বের করে নেয় সে। এই গুলিগুলো কামরাঙ্গা করা। রাস্তার উপর একটা রুমাল বিছিয়ে গুলিগুলো রেখে দেয়, তারপর মৃদুলের কাছ থেকে নেয়া ম্যাচবক্স থেকে একটা কাঠি বের করে রুমালে আগুন ধরিয়ে দেয় সে।

মৃদুলকে টেনে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বলে, "প্রথম গুলিটা ফোঁটার পরই তুমি চিৎকার করতে করতে দৌড়ে চলে যাবে। লোকজন ভয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করলে আমিও দৌড়ে মিশে যাবো তাদের মধ্যে। আমাদের দেখা হবে কিড স্ট্রিটে। ঠিক আছে?"

মৃদুল যেনো অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পায়। বেশ উৎসাহী হয়ে ওঠে সে।

কয়েক সেকেন্ড পরই রুমালের আগুন একটা বুলেটকে স্পর্শ করতেই সেটা বিস্ফোরিত হয়। মৃদুল ভো দৌড় দিয়ে চলে যায় চিৎকার করতে করতে।

বাস্টার্ড শুনতে পায় লোকজন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে শুরু করে দিয়েছে। সে আর দেরি করে নি। সোজা দৌড় দেয় প্রাণপনে। পেছন থেকে শুনতে পায় পর পর আরো দুটো গুলির শব্দ। মুহূর্তেই এদিকওদিক ছুটোছুটি করতে থাকা শত শত লোকজনের মাঝে মিশে যায় সে।

অলিম্পাসের সামনে পুলিশের বিশাল দলটি এ অবস্থা দেখে কিছুক্ষণের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছিলো। একটু পর যখন পরিস্থিতি সামলে নেবার চেষ্টা করতে শুরু করে তারা, বাস্টার্ড তখন মেইনরোডে চলে এসেছে প্রাণপনে ছুটতে থাকা একদল ভয়ার্ত লোকজনের সাথে সাথে।

কিছুটা পথ এগোবার পর ফোন করে রেন্ট-এ-কারের ড্রাইভারকে। রেস্টুরেন্টের হট্টগোল আর পুলিশের কারণে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অন্য কোথাও সরে গিয়েছিলো। বাস্টার্ড তাকে বলে দেয় ঠিক কোত্থেকে তাকে পিক করতে হবে।

পাঁচ মিনিট পর গাড়িতে উঠেই গভীর করে নিঃশ্বাস নেয় সে। ধারণার চেয়ে কততো সহজ আর দ্রুতই না কাজটা করতে পারলো! তার ঠোঁটে দেখা যায় স্মিত হাসি।

ব্ল্যাক রঞ্জু শেষ!

জেফরি বেগ জানে বাস্টার্ড তার মিশনে সফল হয়েছে কিন্তু তার নিজের মিশন এখনও সফলতার মুখ দেখে নি। তবে এটাও ঠিক এতো সহজে সে হাল ছেড়ে দিচ্ছে না। কোলকাতার পুলিশকে বাস্টার্ডের ছবি দিয়ে দিয়েছে, ওরা নিশ্চয় এই ভয়ঙ্কর খুনিকে ধরার জন্য সব চেষ্টা করবে। বিশেষ করে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফকে অ্যালার্ট করার পাশাপাশি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পুলিশকে সতর্ক করে দেয়া হবে। খুনির ছবি অতিদ্রুত ফ্যাক্স করে সবগুলো থানায় পাঠিয়ে দিতে পারলে বাস্টার্ডের পক্ষে সীমান্তে পাড়ি দেয়া সম্ভব হবে না।

ব্ল্যাক রঞ্জুর লাশ পুলিশ নিয়ে গেছে। মাউন্ট অলিম্পাস নামের রিস্টুরেন্টটা বন্ধ করে রেখেছে তারা। এর মালিক মৃণাল বাবু পলাতক। পুলিশ যতোটুকু জানতে পেরেছে, মৃণাল বাবু নামেমাত্র মালিক হলেও ব্ল্যাক রঞ্জুই আসল মালিক। তার হয়তো একজন স্থানীয় লোকের দরকার ছিলো, সেই প্রয়োজন মিটিয়েছে মৃণাল বাবু। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার শীতল বাবুকে গ্রেফতার করা হয়েছে, আশা করা যায় মৃণাল বাবুকেও শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে।

কোলকাতার পুলিশ কমিশনার জেফরি বেগকে জানিয়েছে কিভাবে চতুর খুনি পুলিশে ঘিরে থাকা ভবন থেকে সুকৌশলে বের হতে পেরেছে। জেফরি অবশ্য অবাক হয় নি, সে জানতো এরকম কিছু হবে। সেজন্যে আগেই বলে দিয়েছিলো তাদেরকে, বাস্টার্ড খুবই ইনোভেটিভ। অবশ্য যা ঘটেছে তাতে করে কোলকাতার পুলিশকে দোষ দেয়া যায় না। তারা তো খুব বেশি প্রস্তুতি নেবার সময় পায় নি। জেফরির রিকোয়েস্টের জবাবে দ্রুত রিঅ্যাক্ট করেছে তারা।

তারপরও সারা রাত ঘুম হয় নি জেফরি বেগের। পর দিন সকালে অফিসে গিয়ে দেখা করলো তার বস ফারুক আহমেদের সাথে।

"যা-ই বলো না কেন, একটা বিরাট উপকার হয়ে গেছে এ ঘটনায়," ফারুক আহমেদকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে।

জেফরি জানে তার বস কি বলতে চাচ্ছে। "তা ঠিক, একান্ত অনিচ্ছায় বসের সাথে তাল মেলালো সে। কিন্তু সে খুশি হতে পারছে না। তার ব্যক্তিগত মিশনটা এখনও সফলতার মুখ দেখে নি।

"তুমি মনে হয় অতোটা খুশি হও নি?" জানতে চাইলো হোমিসাইড প্রধান।

"বাস্টার্ড কিন্তু এখনও ধরা পড়ে নি," আস্তে করে বললো সে।

"কিন্তু ব্ল্যাক রঞ্জু মারা গেছে, আই মিন তাকে খুন করা হয়েছে, যাকে হন্যে হয়ে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছিলো এতোদিন, যে ছিলো আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তারচেয়েও বড় কথা, বিরাট একটি ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে গেছে। আমরা এখন হাফ ছেড়ে বাঁচতে পারি। সে তুলনায় তোমার ঐ বাস্টার্ডের ধরা পড়া আর না পড়া একেবারেই তুচ্ছ ঘটনা।" একটু সামনের দিকে ঝুঁকে মহাপরিচালক বললো, "ইনফ্যাক্ট, ব্ল্যাক রঞ্জুর মতো একজন ক্রিমিনালকে খুন করার জন্য ঐ খুনিকে তুমি বাহবা দিতে পারো।"

জেফরি স্থির চোখে চেয়ে রইলো হোমিসাইডের মহাপরিচালকের দিকে। এটা জেফরিও জানে। শুধুমাত্র ব্ল্যাক রঞ্জু নিহত হবার খবরটাই সেলিব্রেট করার জন্য যথেষ্ট। আর যে গোপন ষড়যন্ত্রটি বানচাল হয়ে গেছে সেটা বিশাল সাফল্য হলেও এ নিয়ে সেলিব্রেট করার মতো লোক বলতে তারা দুজন। তারপরও নতুন আরেকটা প্রশ্ন তাকে খোঁচাচ্ছে কাল রাত থেকেই।

"তাছাড়া তুমি তো ঐ বাস্টার্ডের ছবি, আঙুলের ছাপ বের করেই ফেলেছো। আজ হোক কাল হোক সে ধরা পড়বেই। এ নিয়ে চিন্তা কোরো না।" ফারুক আহমেদ তাকে আশ্বস্ত করলো।

জেফরি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো, "স্যার, বাস্টার্ডকে এবার কে নিয়োগ দিলো?" ফারুক আহমেদের কাছ থেকে যে এ প্রশ্নের জবাব পাবে না সেটা ভালো করেই জানে।

"উমমম...সেটা তো ভাবনার বিষয়। এই খুনি কেন ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের বিরুদ্ধে, আই মিন রঞ্জুকে খুন করতে এতে মরিয়া হয়ে উঠলো?...কে তাকে এ কাজের কন্ট্রাক্ট দিলো, অ্যাঁ?"

"তারচেয়ে বড় কথা বাস্টার্ড এমন একটা খুনের কন্ট্রাক্ট জেনেশুনে নিতে পারলো!... এতোবড় ঝুঁকি, এত বড় একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেললো শুধুমাত্র টাকার জন্যে?"

"হি ইজ অ্যা প্রফেশনাল হিটম্যান, মাইবয়। মানি ডাজ ম্যাটার টু হিম," বিজ্ঞের মতো বললো ফারুক আহমেদ।

জেফরিও জানে কথাটা সত্যি। হয়তো তাকে প্রচুর টাকা অফার দেয়া হয়েছে। এতো বিপুল পরিমাণের টাকা, যে অফারটা ফিরিয়ে দিতে পারে নি। কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন জন্ম দেয়- এতো টাকা কে তাকে দেবে?

গোয়েন্দা সংস্থা নিশ্চয় প্রচুর পরিমাণের টাকা খরচ করে, এমন একজন খুনিকে ভাড়া করবে না- কাজটা করার জন্য। বিগত সরকার যে এমন কাজের পেছনে থাকবে না সেটা নিশ্চিত। এ দেশের প্রধান দুটি দল কোনোভাবেই একে অন্যের বিরাট উপকার করতে মাঠে নামবে না। পারলে তারা একে অন্যেকে ধ্বংস করে দিতে মরিয়া।

তারচেয়েও বড় কথা, কোনো পেশাদার খুনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিংবা গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজও করবে না। কারণটা খুব সহজ - তারা একে অন্যেকে বিশ্বাস করে না। বিশেষ করে কোনো প্রফেশনাল কিলার এরকম কোনো সংস্থার হয়ে কাজ করবে না। অতীতে হাতে গোনা কিছু নীচুশ্রেণীর সন্ত্রাসীদের দিয়ে এরকম কাজ করিয়ে নেবার পর সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে দুনিয়া থেকে। কথাটা নিশ্চয় বাস্টার্ডের অজানা নয়। এরকম কাউকে সে বিশ্বাস করবে না। কোনো দিনই না। তাহলে কে তাকে এমন কন্ট্রাক্ট দিলো?

"চা খাবে?"

ফারুক আহমেদের কথায় সম্বিত ফিরে পেলো জেফরি বেগ। "জি, স্যার।"

ফারুক আহমেদ দুকাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে দিলো। "কাল সবগুলো দৈনিক পত্রিকায় যখন খবরটা ছাপা হবে তখন কি হবে বুঝতে পারছো?"

গতকাল ব্ল্যাক রঞ্জুর নিহত হবার খবর হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট অবগত হলেও এ দেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো এখনও সেই খবর জানে না। তবে আজকের মধ্যে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট কোলকাতার পুলিশের কাছ থেকে অফিশিয়ালি সব জানতে পারবে, নিহতের ছবিসহ বিস্তারিত সবই তাদের কাছে পাঠানো হলে তারা সেটা সরকারী সংবাদসংস্থায় পাঠিয়ে দেবে। নিঃসন্দেহে বিরাট একটি খবর। সবগুলো পত্রিকা হেডলাইন করতে পারে।

"আমি ভাবছি কোলকাতা থেকে সব জানতে পারলে এ নিয়ে একটা প্রেসকনফারেন্স করবো।"

ফারুক আহমেদের এ কথায় জেফরি অবাক হলো। আমাদের কি প্রেসকনফারেন্স করা ঠিক হবে, স্যার?" বললো সে।

"কেন ঠিক হবে না? তুমি যদি ওভাবে খুনিকে ট্র্যাকড্রাউন না করতে তাহলে কি ব্ল্যাক রঞ্জুর অবস্থান সম্পর্কে কেউ জানতে পারতো? এর পুরো কৃতিত্ব তোমার, আই মিন আমাদের ডিপার্টমেন্টের।"

"কিন্তু আমাকে এসব প্রেসকনফারেন্সে থাকতে বলবেন না, স্যার।"

ফারুক আহমেদ হাসতে লাগলো। সে জানে তার এই প্রিয়পাত্র মোটেও সাংবাদিকবান্ধব নয়। এদেরকে এড়িয়ে যায় সব সময়। তারপরও এতোবড় কৃতিত্ব নেবে না?

"কিন্তু এবার তোমার প্রেসকনফারেন্সে থাকা উচিত। শুধু ব্ল্যাক রঞ্জুর ঘটনাই নয়, তুমি যে নতুন একটি টেকনিক উদ্ভাবন করেছে আর সেটা যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড স্বীকৃতি দিয়েছে সেটা সবাইকে জানানোর উপযুক্ত সময় এসে গেছে।"

আৎকে উঠলো জেফরি বেগ। "স্যার, আপনি কী বলছেন?" একটু সামনের দিকে ঝুঁকে

এলো সে। "এই টেকনিকের কথা কাউকে বলা যাবে না। একদম না।"

ফারুক আহমেদ ভুরু কুচকে তাকালো তার দিকে। "কেন? জানালে সমস্যা কি?"

"স্যার, প্রচার পেলে অপরাধীরা সাবধান হয়ে যাবে। তারা পিস্তল রিভলবারে গুলি ভরার সময়ও অতিরিক্তি সতর্ক হয়ে উঠবে। এটা বিজ্ঞাপন করার মতো বিষয় না।"

কপালের একপাশ চুলকে নিলো ফারুক সাহেব। ঠিকই তো বলেছে জেফরি। এমন সময় ঘরে একটা ছেলে ঢুকে চা দিয়ে গেলো।

"ওকে, কেউ জানবে না। তোমার কথাই মেনে নিলাম। তাহলে শুধু ব্ল্যাক রঞ্জুর ব্যাপারে একটা প্রেস কনফারেন্স করি, কি বলো?"

চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে জেফরি বেগ বললো, "যেটা ভালো মনে করেন, স্যার।" কথাটা শেষ না হতেই তার মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো। বের করে দেখলো একটা এসএমএস।

টি-প্যালেস। ৫টা। আই উইল বি দেয়ার। লাভ ইউ।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে জেফরি মেসেজটা পড়লো।

লাভ ইউ টু।

চায়না টাউন থেকে পালিয়ে আসার পর রেন্ট-এ-কারটা যখন তার হোটেলের সামনে আসে দেখতে পায় গেটের কাছে মৃদুল দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই মৃদুলের মুখে চওড়া হাসি ফুটে ওঠে। ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরে হোটেলে ঢোকে বাস্টার্ড।

"তুমি আমার আগে কিভাবে এলে?" রুমে আসার পর জানতে চায় সে।

"আমি তো বস্ এক দৌড়ে চলে যাই মেইনরোডে, সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলে আর দেরি করি নি।"

"গুড," বাস্টার্ড তার পিঠ চাপড়ে বলে।

"বস, খুনখারাবির কেস নাকি?" এই প্রথম মৃদুল জানতে চায়। তার স্বভাবে বাড়তি কৌতূহল বলে কিছু নেই। তবে আজকের ঘটনাটা ব্যতিক্রম। রেস্টুরেন্টে সুপের বাটি থেকে আরশোলা পাওয়া নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধানোর যে ভূমিকা শুধু তাই পালন করে নি, বাস্টার্ডকে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে ঝুঁকি নিয়ে রক্ষাও করেছে। তাই সে সিদ্ধান্ত নেয় মৃদুলকে সত্যি কথাই বলবে।

"হুম। ব্ল্যাক রঞ্জু।"

ভুরু কপালে উঠে যায় মৃদুলের। "খালাস?" হাত দিয়ে গলা কাটার ভঙ্গি করে সে।

মাথা নেড়ে সায় দেয় বাস্টার্ড।

"বাপরে!" শুধু এটুকুই বলেছিলো আর কিছু জানতে চায় নি।

"কালই আমরা চলে যাচ্ছি, তুমি ব্যবস্থা করো।"

"ওকে, বস্।"

"রেন্ট-এ-কারটা ছেড়ে দাও। পাওনা-টাওনা যা আছে মিটিয়ে ফেলো।"

"ঠিক আছে। আমি তাহলে যাই। কাল খুব সকালে রওনা দেবো। উমমম...আটটা?"।

"ঠিক আছে।"

মৃদুল চলে গেলে বিছানার উপর সটান শুয়ে পড়ে সে। বুঝতে পারে কোলকাতার পুলিশ হন্যে একজন ফেরারিকে খুঁজবে এখন। চায়না টাউনের এক রেস্টুরেন্টে খুন করে পালিয়ে যাওয়া সেই ফেরারিকে ধরার জন্য ব্যাপক পুলিশী অভিযান শুরু হবে সন্দেহ নেই।

কিন্তু এখানকার পুলিশ কিভাবে তার মিশনের খবর জানতে পারলো, কিভাবে তারা অলিম্পাসে এসে হাজির হলো?

এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর তার জানা নেই। কোনো অনুমাণ ও করতে পারে নি। মাথা থেকে ভাবনাটা আপাতত সরিয়ে রাখতে জামাকাপড় পাল্টে গোসল করে নেয়। রুমের বাতি নিভিয়ে সটান পড়ে রয় বিছানায়।

ঠিক কততক্ষণ ঘুমিয়েছিলো জানে না, কাঁচাঘুম ভাঙে দরজায় জোরে জোরে টোকার শব্দে।

বুকটা লাফিয়ে ওঠে তার। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারে নি। তার দরজায় এভাবে টোকা মারার তো কথা নয়। একমাত্র মৃদুল ছাড়া কেউ তার এখানে আসারও কথা নয়। কিন্তু ছেলেটা তো একটু আগেই চলে গেছে এখান থেকে।

"বস্!" মৃদুলের ফিসফিসে কণ্ঠটা শুনে আরো ঘাবড়ে যায় সে। এভাবে কেন তাকে ডাকছে!

"বস! জলদি খোলেন!" মৃদুলের কণ্ঠে তাড়া।

ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা হাতে নিয়ে আস্তে করে দরজা খুলে দিতেই মৃদুল ভেতরে ঢুকে পড়ে।

"বস! সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

"কি হয়েছে?" বাস্টার্ডের মাথায় কিছুই ঢোকে না।

মৃদুল নিজেই দরজা বন্ধ করে ফেলে। "পুলিশ আপনাকে খুঁজছে।"

"কি!"

"হ্যাঁ, আমি নিজের চোখে দেখেছি। আপনার ছবি তাদের হাতে..."

“কোথায়?”

“একটা কাজে বাইরে গেছিলাম, পথে পুলিশবক্সের এক পুলিশ কিছু লোকজনকে থামিয়ে আপনার একটা ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করছে চেনে কিনা। আমি কাছে গিয়ে ছবিটা দেখেছি।”

মাইগড! “আমার ছবি?” অবিশ্বাসে বলে সে। কিভাবে তার ছবি এদের হাতে এলো কে জানে। তার কাছে পুরো ব্যাপারটাই পুরোটাই গোলকধাঁধার মতো মনে হতে লাগলো।

“ভাবেন একবার! ভাগ্য ভালো যে আমি আগ্রহ নিয়ে দেখতে গেছিলাম।”

“তার মানে এখানে থাকা একদম নিরাপদ না।”

“একদমই না।”

“তাহলে এখন কোথায় যাবো?” বাস্টার্ড সত্যি সত্যি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

“এখনই রওনা দিতে হবে।”

“কোথায়?”

“বর্ডারে। দেরি করলে আর যাওয়া যাবে না।”

এরপর মৃদুল যা করলো তা এক কথায় অসাধারণ।

প্রথমেই সে বাস্টার্ডকে নিয়ে হোটেলের কাছেই তার দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে চলে গেলো। বাস্টার্ডের মাথা কামিয়ে গেরুয়া রঙের একটি পাঞ্জাবি জাতীয় পোশাক আর ধূতি পরিয়ে কপালে চন্দনের তিলক লাগিয়ে তাকে রীতিমতো হরেকৃষ্ণ-হরে-রাম ভক্ত বানিয়ে ফেললো। এরপর সে নিজেও ওরকম সাজে সজ্জিত হলো।

ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেস-ইসকন!

মৃদুল নিজেও নাকি ইকনের সদস্য, তবে সক্রিয় নয়। তার অনেক আত্মীয়স্বজন ইসকনে আছে।

রাতের শেষ বাসটায় করে তারা রওনা দিলো পশ্চিমবঙ্গের হাবরা জেলায়। ভোরের দিকে হাবরায় নেমে খালি পায়ে খাঁটি ইসকন ভক্ত সেজে দু'জনে চলে এলো বর্ডারের কাছে।

ভারতবর্ষে সাধুসন্তদের জন্যে কোনো কালেই সীমান্ত বলে কিছু ছিলো না। এই আধুনিক যুগেও তারা অনেক জায়গায় চলে যেতে পারে বিনা বাধায়। ইসকনের অনেক সদস্য সীমান্তবর্তী এলাকায় এভাবেই এপার-ওপার করে। বিএসএফ আর বিডিআর এদের ব্যাপারে সহমর্মি। মৃদুল অতীতে অনেকবার এটা ব্যবহার করেছে যখন সে সর্বহারার সাথে সক্রিয় ছিলো। বর্ডারে খুব কড়াকড়ি, কোনোভাবেই ঘুষ দিয়ে সীমান্ত পার হওয়া যাবে না এরকম সময়গুলোতে ইস্কন সেজে নির্বিঘ্নে পাড়ি দিয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাই এখন কাজে লাগাচ্ছে সে।

বাস্টার্ড অবাক হয়ে দেখতে পেলো বিএসএফ হাসি হাসি মুখে তাদেরকে বর্ডার ক্রশ করতে দিলো। একই ঘটনা ঘটলো বিডিআর'র বেলায়ও।

“প্রতিদিন ইসকনের অনেক সদস্য এভাবেই বর্ডার ক্রশ করে,” সীমান্ত পার হয়ে একটা খোলা মাঠ দিয়ে নগ্নপদে হেঁটে যাবার সময় বললো মৃদুল। “এইসব ইসকনের লোকজন কখনওই ভিসা-পাসপোর্টের ধার ধারে না।”

অবাক হয়ে শুনতে লাগলো বাস্টার্ড। সে এটা জানতো না।

“তাদের ভিসা-পাসপোর্ট এক কথায়ই শেষ - হরে কৃষ্ণ হরে রাম!”

পায়ে হেঁটে, নৌপথে তারা দু'জন সাতক্ষীরা জেলায় এসে হাজির হলো। মৃদুলের এক পরিচিত আত্মীয়ের বাড়িতে উঠলো তারা। একরাত থেকে ওখান থেকে চলে গেলো মৃদুলের বাড়িতে।

ঐদিনই দুপুরের দিকে মৃদুল কিছু দৈনিক পত্রিকা নিয়ে এলো। সবগুলোর শিরোনাম ব্ল্যাক রঞ্জুর নিহত হবার খবর, সেইসাথে নিহত রঞ্জুর ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে কুখ্যাত সন্ত্রাসী চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার চোখ দুটো আধখোলা; মুখটা হা করা। ঠিক ডান চোখের উপরে গুলির ফুটো। কমবেশি সবগুলো পত্রিকায়ই বিভিন্ন ভঙ্গিতে রঞ্জুর ছবি ছাপা হয়েছে।

কোনোটা ক্লোজআপ কোনোটা বুক থেকে মাথা পর্যন্ত; বুকে আর পেটেও যে গুলি লেগেছে সেটা দেখানোর উদ্দেশ্যে।

তবে মজার বিষয় হলো এই হত্যাকাণ্ডকে তার নিজের দলের কোন্দলের ফল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে ঢাকায় ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের বেশ কয়েকজনকে হত্যা করে তারই এক সময়কার সঙ্গীরা। পরে সেটার জের ধরে কোলকাতায় ঘটে আরেকটি হত্যাকাণ্ড। আর সেই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। স্বয়ং রঞ্জু।

চমৎকার।

ঢাকায় রঞ্জুগ্রুপের লোকজনের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ন্যস্ত করা হয়েছিলো হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টকে। দক্ষ ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ এইসব খুনখারাবির সূত্র ধরেই নিশ্চিত হয় ব্ল্যাক রঞ্জু কোলকাতার কোথায় অবস্থান করছে। তার উদ্যোগেই কোলকাতার পুলিশকে ব্যাপারটা জানানো হলে সেখানকার পুলিশ ঝটিকা অপারেশন চালায়, কিন্তু পুলিশ পৌঁছানোর আগেই রঞ্জু তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের হাতে প্রাণ হারায়।

কথাটা পুরোপুরি সত্য নয় কিন্তু সব কিছুর মূলে যে জেফরি বেগ আছে সেটা বুঝতে পারে বাস্টার্ড।

তাহলে তুমিই কোলকাতা পর্যন্ত আমাকে পুলিশ দিয়ে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে!

ওদিকে পুরনো ঢাকার নবাবপুরের এক সুরক্ষিত কক্ষে বসে শুটার সামাদও পত্রিকা পড়ছিলো। রঞ্জুর নিহত হবার খবরটা অবশ্য কাল রাতেই সে পায় দুটি টিভি চ্যানেলের সংবাদে। তার ওখানে যে বোবা ছেলেটা থাকে তাকে দিয়ে পাঁচ-ছয়টি পত্রিকা কিনে আনিয়েছে সংবাদটার ডিটেইল জানার জন্য।

প্রায় সবগুলো পত্রিকাই একই রকম খবর ছেপেছে। কিন্তু শুটার সামাদ ভালো করেই জানে এটা রঞ্জুর দলের আভ্যন্তরীণ কোন্দল নয়, কাজটা করেছে বাস্টার্ড। সে খুব অবাক হলো বাস্টার্ড সুদূর কোলকাতায় গিয়ে সফলভাবে ব্ল্যাক রঞ্জুকে খুন করতে পেরেছে বলে। তার ধারণা ছিলো বাস্টার্ড কোনোভাবেই রঞ্জুর নাগাল পাবে না। ছেলেটা তাকে আবারো বিস্মিত করলো।

পাঁচটা পত্রিকা পড়ার পর ছয় নাম্বারটা হাতে নিতেই তার চোখ আঁটকে গেলো এক জায়গায়। ভালো করে চেয়ে দেখলো সে। কিছুক্ষণ চুপ মেরে রইলো। পাঁচ মিনিট পর টেলিফোনটা তুলে নিয়ে একটা জায়গায় ফোন করলো শুটার সামাদ।

***

মৃদুলের বাড়িতে দু'দিন থেকে ইসকনের বেশভূষা নিয়েই ঘুরপথে ঢাকায় চলে এলো বাস্টার্ড। প্রথমে সাতক্ষীরা থেকে মোংলায় চলে যায়, ওখান থেকে ট্রলারে করে বরিশাল, সেখান থেকে লঞ্চে করে সোজা ঢাকায়। এই নিরাপদ ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে মৃদুল। আগে ভেবেছিলো ছেলেটাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবে, কিন্তু যে কাজ সে করেছে তাতে বাস্টার্ড খুশি হয়ে দু'লাখ টাকা দিয়ে দিয়েছে। টাকা পেয়ে মৃদুল যারপরনাই খুশি। তারপরও বাস্টার্ড ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরে জানায় তার কাছে সে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে।

ঢাকায় আসার পর টানা একদিন নিজের বাড়িতে কাটিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় দিন তার ট্রাস্টিকে ফোন করলে লোকটা দারুণ সন্তুষ্ট হলো। তাকে জানালো কন্ট্রাক্টের টাকা দু'একদিনের মধ্যেই তার একাউন্টে চলে যাবে।

ফোনটা যে-ই না রাখতে যাবে অমনি বেজে উঠলো আবার। ডিসপ্লে'তে দেখলো শুটার সামাদ। তার কাছ থেকে নেয়া সাইলেন্সারটা চায়না টাউনেই ফেলে চলে এসেছে। ঢাকায় আসার পর তার সাথে আর যোগাযোগও হয় নি। পত্রিকা মারফত সামাদ ভাইও নিশ্চয় জেনে গেছেন তার মিশনের কথা।

"হ্যালো, ভাই কেমন আছেন?"

"ভালো। তোমাকে ফোন করেছি অনেকবার, ফোন বন্ধ ছিলো...কবে এসেছো?" জানতে চাইলো শুটার সামাদ।

"এই তো আজই," একটু মিথ্যে বললো। সত্যিটা বললে সামাদ ভাই হয়তো মনে কষ্ট পাবেন।

"তুমি ঠিক আছে তো?"

"জি, ভাই।"

"আমি তোমাকে নিয়ে একটু টেনশনে আছি। গত দু'দিন ধরে অনেকবার ফোন করেছি..."।

"টেনশন করার কোনো দরকার নেই, ভাই। পত্রিকায় সব দেখেছেন নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ। সবগুলো পত্রিকা আর টিভি চ্যানেলে খবরটা ভালোমতোই প্রচার করেছে। আমি অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম তুমি এরকম একটা কাজ করতে যাচ্ছো ..."

"আপনি যে বুঝতে পেরেছেন সেটা আমিও জানতাম কিন্তু আপনাকে বলতে পারি নি। আশা করি মনে কিছু করেন নি?"

"আরে, না। মনে করবো কেন। সব বিজনেসেরই গোপনীয়তা আছে।"

"আসলে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলাম কাজটা ভালোমতো করে আসতে পারলে আপনাকে জানাবো। কিন্তু ঘটনাটা এমন হয়ে গেলো যে-"।

তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন শুটার সামাদ, "তোমাকে একটা কথা বলি, মন

দিয়ে শোনো...”

“জি, বলেন।” বাস্টার্ড একটু অবাক হলো সামাদ ভায়ের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত কোনো কথা শুনতে না পেয়ে।

“তুমি যাকে মেরেছো সে ব্ল্যাক রঞ্জু না।”

“কি!” বাস্টার্ডের কাছে মনে হলো লোকটা ঠাট্টা করছে।

“ওটা ব্ল্যাক রঞ্জু না।” কথাটা আবার বললেন শুটার সামাদ। “আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত!”

চুপ মেরে রইলো সে। শুটার সামাদের কথাটা হজম করতে বেগ পেলো।

“পত্রিকায় তার ডান হাতটা দেখেছি, একদম ঠিক আছে। তাছাড়া ওর এক সময়ের ঘনিষ্ঠ এক লোককে ফোন করে কনফার্ম হয়েছি।” একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন সামাদ। “রঞ্জু খুবই ডেঞ্জারাস লোক। ঢাকা শহরে তার প্রচুর লোকজন আছে। তুমি একটু সাবধানে থেকো।”

জেফরি বেগ জানে না বাস্টার্ড দেশে ফিরে এসেছে কিনা। তবে তার ধারণা এ মুহূর্তে তার পক্ষে কোলকাতায় থাকা সম্ভব নয়। তাকে বাধ্য হয়েই দেশে ফিরে আসতে হবে। ওখানকার পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে। তাদের কাছে তার ছবি রয়েছে।

ব্ল্যাক রঞ্জুর নিহত হবার খবরে স্বস্তি নেমে এসেছে ঢাকা শহরে। তার চাঁদাবাজির ভয়ে যাদের রাতের ঘুম হারাম হতো তারা এখন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এরকম একজন শীর্ষ সন্ত্রাসী ও তার দলের বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর সংবাদে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও খুশি।

রঞ্জুর সহযোগী ঝন্টু শেষপর্যন্ত সঠিক ঠিকানা বলে দেয়াতে অনেক উপকার হয়েছে। ঝন্টু শুধু রঞ্জুর ঠিকানাই বলে নি, ষড়যন্ত্রের কথাও স্বীকার করেছে। দেশের ভেতর কারা কারা এতে জড়িত সবার নাম বলেছে সে।

ঝন্টুর জবানবন্দী থেকে যা জানা গেছে তাতে করে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হবে অচিরেই। ব্ল্যাক রঞ্জুর দলটি প্রায় শেষ হবার পথে। এ কাজ করবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এটা নিয়ে সে মোটেও চিন্তিত নয়। তার একটাই চিন্তা : বাস্টার্ডকে ধরা। যদিও এই খুনির হাতে ব্ল্যাক রঞ্জু নিহত হয়েছে, সাধারণ জনগণের মাঝে স্বস্তি বয়ে যাচ্ছে, নস্যাৎ হয়ে গেছে বিরাট একটি ষড়যন্ত্র, তারপরও সে তাকে ছাড়বে না।

জেফরি বেগ এখনও জানতে পারে নি বাস্টার্ডকে কে নিয়োগ দিয়েছে। সে জানে, এই খুনি মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে কাজ করে। রঞ্জুর দলের বিরুদ্ধে সে যেভাবে হত্যা-খুন করেছে তাতে মনে হচ্ছে প্রচুর টাকার একটি কন্ট্রাক্ট ছিলো সেটা। কিন্তু এতো বিপুল পরিমাণের টাকা দিয়ে কে তাকে নিয়োগ দিলো, কেন দিলো?

এসব অমীমাংসিত প্রশ্নের জবাব একভাবেই পাওয়া সম্ভব; বাস্টার্ডকে জীবিত ধরা। সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভুত করে ভাবতে লাগলো কিভাবে এই ধূর্ত খুনিকে দ্রুত ধরা সম্ভব। নিজের অফিসে একা বসে আছে। চোখ দুটো বন্ধ করে একটানা ভেবে গেলো বেশ কিছুটা সময়। হঠাৎ চোখ খুলে ইন্টারকমটা হাতে নিয়ে যখন সহকারী জামানকে ডেকে পাঠালো তখন বুঝতে পারলো না ঠিক কতোক্ষণ সময় গড়িয়ে গেছে। তবে চোখ খোলার পর থেকে তার মধ্যে নতুন প্রাণশক্তি ফিরে এলো যেনো। বাস্টার্ডকে ধরার সহজ একটা বুদ্ধি মাথায় চলে এসেছে।

জামান তার বসের ফোন পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ছুটে এলো। বসলো জেফরির ডেস্কের সামনে। বুঝতে পারছে হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটরের মাথায় নতুন কোনো চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে।

"জামান, ঢাকা শহরের পাঁচচল্লিশটি থানায় প্রতিদিন অনেক লোককে গ্রেফতার করা হয়, তাই না?"

জি, স্যার।"

"সংখ্যাটা কি রকম হয়?"

একটু ভেবে বললো তার সহকারী, "উমমম...গড়ে দশ পনেরো জন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। "এইসব লোকজনের মধ্যে বেশিরভাগই ক্রিমিনাল।"

"জি, স্যার...তবে নিরীহ লোকজনও থাকে।"

"তারা তো কোনো না কোনো এলাকায় বাস করে, তাই না?"

এবার জামান মাথা নেড়ে সায় দিলো। সে বুঝতে পারছে না হঠাৎ করে থানা-পুলিশ নিয়ে তার বস কেন আগ্রহী হয়ে উঠলো।

"বাস্টার্ড কিন্তু এ শহরেরই কোথাও না কোথাও থাকে।"

"তাতো ঠিকই, স্যার।"

"ঢাকা শহরের সবগুলো থানায় বাস্টার্ডের ছবিটা পাঠিয়ে দিলাম... প্রতিদিন গ্রেফতার হওয়া লোকজনকে সেই ছবি দেখিয়ে পুলিশ জানতে চাইলো এই লোকটাকে তারা কেউ দেখেছে কিনা...তাহলে কেমন হয়?"

খুব সহজ সরল একটি কাজ কিন্তু জামান সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলো আইডিয়াটা

দারুণ। খুব দ্রুত আর কার্যকরী। কোনো থানায় গ্রেফতার হওয়া পনেরো-বিশজন লোকজনকে ছবি দেখিয়ে জানতে চাওয়াটা তেমন কোনো কঠিন কাজই না। তাদের কিছুই করতে হবে না। শুধু ছবি দিয়ে বলে দিতে হবে লোকটার পরিচয় জানার জন্য। কেউ না কেউ ঠিকই তাকে চিনতে পারবে। খুব সম্ভবত তিন চার দিনের মধ্যেই একটা ফল যাবে যদি বাস্টার্ড ঢাকা শহরে থেকে থাকে।

"আমার মনে হয় আইডিয়াটা কাজ করবে, স্যার," বললো জামান।

"তাহলে দেরি না করে কাজে নেমে পড়ো।"

উঠে দাঁড়ালো জেফরির সহকারী। "আমি এক্ষুণি সবগুলো থানায় ছবি আর ইট্রাকশন ফ্যাক্স করে দিচ্ছি, স্যার।"

জামান রুম থেকে বের হয়ে গেলো। জেফরি বেগের মন বলছে, বাস্টার্ডের খোঁজ পাওয়া যাবে। এ শহরের অনেক লোকই তাকে চেনে। জানে সে কোথায় থাকে। আজ হোক কাল হোক, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ থানায় গ্রেফতার হবেই। সেই সম্ভাবনা অনেক বেশি।

শুটার সামাদের কাছ থেকে সব শুনে বাস্টার্ড যারপরনাই অবাক। যাকে সে খুন করেছে সে ব্ল্যাক রঞ্জু নয়! শুটার সামাদ একেবারে নিশ্চিত হয়েই তাকে ফোন করেছে। প্রথমে পত্রিকায় নিহত ব্ল্যাক রঞ্জুর ছবি দেখে তার সন্দেহ জাগে। সেই ছবিতে রঞ্জুর পেট থেকে মুখ পর্যন্ত একটা ছবি ছিলো, ছবিতে দেখা গেছে শরীরের দু'পাশে হাত ছড়িয়ে পড়ে আছে রঞ্জু। শুটার সামাদ দেখতে পায় বোমার আঘাতে এই সন্ত্রাসীর ডান হাতে যে ক্ষত হয়েছিলো তার কোনো চিহ্নই নেই।

প্লাস্টিক সার্জারি হতে পারে? পারে না? হ্যাঁ, এটা সামাদ নিজেও ভেবেছে। আর সেজন্যেই আরেকজনের কাছে ফোন করে নিশ্চিত হয়েছে সে। এমন এক লোক যে কিনা এক সময় ব্ল্যাক রঞ্জুর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলো। পরে মনোমালিন্য হলে রঞ্জুর দল ছেড়ে চলে যায় সে। কিন্তু রঞ্জু তাকে হত্যা করার চেষ্টা করলে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যায়, বুঝতে পারে রঞ্জুর হাত থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। সেজন্যে তড়িঘড়ি দেশ ছাড়ে, চলে যায় মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে। এই লোকটার সাথে শুটার সামাদের পরিচয় আছে। সামাদ জানতে কয়েক দিন আগে সে দেশে ফিরে এসেছে এক মাসের ছুটিতে। তাই নিশ্চিত হবার জন্য তাকে ফোন করলে সে জানায়, পত্রিকায় সেও ছবিটা দেখেছে, সামাদের ধারণাই ঠিক, এটা ব্ল্যাক রঞ্জু না। কোনোভাবেই না। ছবিটা কার সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই।

তাহলে যাকে খুন করলো সে কে? এ প্রশ্নের উত্তর এখন জানা সম্ভব নয়। বাস্টার্ডের সাথে ঐ শিল্পপতির যে কন্ট্রাক্ট ছিলো সেটা শেষ হয়ে গেছে। তার পাওনা টাকাও দিয়ে দেয়া হয়েছে, সেদিক থেকে এ নিয়ে তার খুব একটা ভাবনার দরকার নেই। কিন্তু দুদিন পর যখন সেই শিল্পপতি জানতে পারবে রঞ্জু খুন হয় নি তখন তার ট্রাস্টির কাছে সে মুখ দেখাবে কি করে? ব্যাপারটা কোনোভাবেই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলো না।

ঐ শিল্পপতি দেশে ফিরে এসেছে, ব্ল্যাক রঞ্জুর মৃত্যুর কথা জেনে নিশ্চিন্তে হয়েছে ভদ্রলোক। নির্বাচনে মনোনয়ন পাবার জন্যে ব্যস্ত আছে এখন। রঞ্জু যদি তাকে খুন করে ফেলে? তাহলে কি ট্রাস্টির মাধ্যমে জানিয়ে দেবে রঞ্জু খুন হয় নি? আগ বাড়িয়ে এটা বলে দেয়াটা কি ঠিক হবে? না। শুটার সামাদ তাকে যে কথা বলেছে সেটাই যে একশ ভাগ সত্যি তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। সে নিজে যদি নিশ্চিত হতে পারতো তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু নিশ্চিত হবার উপায়টা কি?

রঞ্জুর দলের অসংখ্য সদস্য এখনও বহাল তবিয়তে আছে। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই শহরেই। প্রায় প্রতিটি থানায় রয়েছে তাদের ছোটো ছোটো গ্রুপ। তার দরকার এমন একজন, যে কিনা রঞ্জুর খুব ঘনিষ্ঠ। রঞ্জুকে সচক্ষে দেখেছে। পিং সিটির ম্যানেজার?

সম্ভবত।

নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রেবার সাথে এসএমএস আদান প্রদান করছে জেফরি। বিকেলের পরই আজ অফিস থেকে ফিরে এসেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে এই এসএমএস খেলা চলছে। তার খুব ভালো লাগে। ফোনে কথা বলার চেয়ে এটা অনেক বেশি মজার। পাঁচ মিনিট এক নাগাড়ে ফোনে কথা বললেই তার বিরক্ত লাগে কিন্তু ঘন্টার পর ঘণ্টা এসএমএস-এ কোনো ক্লান্তি নেই। সবচাইতে বড় কথা ফোনে কিংবা সামনাসামনি যা বলা যায় না সেটা এসএমএস-এ লিখে দেয়া যায় খুব সহজেই!

রেবার সাথে এসএমএস-এ যখন চূড়ান্ত রোমান্টিক পর্ব চলছে ঠিক সে সময় বেরসিকের মতো জামানের ইনকামিং কলটা এসে পড়াতে একটু বিরক্ত হলো সে কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলো জরুরি কিছুই হবে। শহরে আরেকটা খুন?

কলটা রিসিভ করতেই জামান উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, “স্যার! বাস্টার্ডের খোঁজ পাওয়া গেছে!”

বিশ মিনিট পরই জেফরি চলে এলো ইরাকি কবরস্তান নামের ছোট্ট একটি গোরস্থানের সামনে। এটা আজিমপুর গোরস্তানের ঠিক পেছনেই। জামান আর স্থানীয় থানার বেশ কয়েকজন পুলিশ আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলো তার জন্য। তারা সবাই দাঁড়িয়ে আছে বৃত্তাকারের কবরস্তানের পাশে দোতলা একটি বাড়ির সামনে। ঘরের বাসিন্দাসহ অন্য একজন লোক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের পাশে। বুঝতে পারছে না পুলিশ কেন তাদের বাড়িতে এসেছে। এখানে আসার আগেই জামানের কাছ থেকে কিছুটা জেনে নিয়েছে জেফরি। নিউমার্কেট থানায় গ্রেফতার হওয়া এক আসামী বাস্টার্ডের ছবিটা দেখে চিনতে পেরেছে। তার কাছ থেকেই এই ঠিকানাটা জানা গেছে। কিন্তু এখানে এসে যা দেখতে পাচ্ছে সেটা একেবারেই হতাশাজনক। সেজন্যে অবশ্য লোকটাকে দোষ দেয়া যায় না। দু'মাস জেল খেটে বের হয়ে এসেছিলো গতকাল, নিজের এলাকায় আসার আগেই মামলার বাদীকে টেলিফোনে হুমকি দেয়ার অভিযোগে তাকে আবার গ্রেফতার করা হয়।

"স্যার, এই লোক বলছে দেড়-দু'মাস আগে সে ভাড়া নিয়েছে...এর আগে এখানে কে থাকতো সে জানে না," জেফরিকে বললো জামান।

"ঘরের মালিক কে?" কাচুমাচু হয়ে থাকা দু'জন লোককে জেফরি বললো।

"স্যার, মজিবর," দু'জনের মধ্যে বয়স্কজন জবাব দিলো। "পুলিশের কথা শুইনা পলাইছে...একটু ডরফাচ্চু টাইপের লোক।"

জামানের দিকে ফিরলো জেফরি। "দেড়-দু'মাস আগে...মানে জায়েদ রেহমানের খুনের পর পরই এ জায়গা ছেড়ে দিয়েছে তাহলে..."

"স্যার, এই লোকটা অনেক আগে থেকে এখানে থাকে, বাড়ির বাসিন্দার পাশে যে আরেকটা লোক দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখিয়ে বললো জামান। "সে বলছে দেড়-দু'মাস আগে একদিন হুট করেই বাস্টার্ড আর তার অসুস্থ বাবা এখান থেকে চলে যায়। তাদেরকে আর দেখা যায় নি।"

জেফরি লোকটার দিকে তাকালে সে জোরে জোরে মাথা নেড়ে সায় দিলো। "জি, স্যার, মালসামান নিয়া চইলা গেছে। আর দেহা যায় নি।"

একটু ভেবে বললো জেফরি, "মালপত্র কিসে করে নিয়ে গেছে?"

"গাড়িতে কইরা...কভার্ড ভ্যান আছে না...ওইরকম একটা গাড়ি লইয়া আইছিলো।"

এর বেশি আর কিছু জানা গেলো না। জানার কথাও নয়। কারণ বাস্টার্ড এখানে খুব বেশি দিন হয় নি এসেছিলো। জেফরি বুঝতে পারছে এই খুনি এক জায়গায় বেশি দিন থাকে না।

আবারো হতাশায় ডুবে গেলো জেফরি বেগ। তবে সে জানে একদিন না একদিন বাস্টার্ডকে সে ধরতে পারবেই। থানার পুলিশ আর জামানকে নিয়ে ওখান থেকে বের হতে হতে ভাবছিলো সে। ঠিক এমন সময় রাস্তার বাম দিকের একটি ইলেক্ট্রিক পোস্টের গায়ে কিছু একটা তার চোখে পড়লে হঠাৎ করে থেমে গেলো।

"কি, স্যার?" বুঝতে না পেরে বললো জামান।

মনে হলো কথাটা শুনতে পায় নি জেফরি। আস্তে আস্তে ইলেক্টক পোস্টের দিকে এগিয়ে গেলো সে। জামান কাছে এসে দেখতে পেলো হলুদ রঙের এ ফোর সাইজের কাগজে একটি কম্পিউটার প্রিন্টআউট পোস্টের গায়ে সাটানো আছে। বাড়িঘরের মালপত্র আনা নেয়ার কাজে যেসব কভার্ড ভ্যান আছে। সেরকম একটি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন।

"স্যার, কোন কোম্পানির ভ্যান ব্যবহার করেছে কে জানে," বললো জামান।

ফিরে তাকালো সহকারীর দিকে। "ভ্যান ভাড়া করার জন্য কেউ এতোটা সতর্ক থাকবে না। তাছাড়া হাতের কাছে যেটা পাবে সেটাই ব্যবহার করবে। আমার মনে হয় বাস্টার্ড এখান থেকেই ভাড়া করেছে। তার জায়গায় আমি হলেও তা-ই করতাম...একটু খোঁজ নিয়ে দেখতে সমস্যা কোথায়।"

জামান কিছু বললো না। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বিজ্ঞাপনটা কম করে হলেও দু'তিনমাসের

পুরনো। তার বসের কথা ঠিকও হতে পারে।

"ফোন করো," বিজ্ঞাপনে দেয়া দুটো ফোন নাম্বার দেখিয়ে জামানকে বললো জেফরি।

জামান একটা নাম্বারে ডায়াল করতে শুরু করে দিলো। কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছে এটা কোনো কাজে লাগবে না। এরকম অনেক কোম্পানি আছে। বাস্টার্ড ঠিক কোন কোম্পানির কভার্ড ভ্যান ব্যবহার করেছে কে জানে।

"শুধু বলো তাদের অফিসটা কোথায়?" পাশ থেকে বললো জামানকে। "আমরা তাদের সাথে দেখা করবো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জামান। ফোনালাপটি খুব সংক্ষিপ্ত হলো। জামান শুধু জেনে নিলো তাদের অফিসটা কোথায়।

খুব কাছেই, হাটা দূরত্বে ভ্যান কোম্পানির অফিসটি। সঙ্গে থাকা পুলিশদের বিদায় দিয়ে জামান আর জেফরি চলে এলো সেই অফিসে। অফিস বলতে ছোট্ট একটা ঘর, একটা ডেস্ক আর তিন-চারটা চেয়ার। মাঝবয়সী এক লোক বসে আছে। তাদের পরিচয় পেয়েই লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। নার্ভাস হয়ে গেছে।

"ঘাবড়ানোর কিছু নেই, আপনাদের রেকর্ডবুকটা একটু দেখবো," লোকটাকে আশ্বস্ত করে বললো জেফরি। দুটো চেয়ার টেনে বসে পড়লো তারা। জেফরি জানে এরকম ভ্যান কোম্পানিগুলো তাদের প্রতিটি ট্রিপের হিসেব রাখে। এটা মূলত রাখা হয় মালিকের সুবিধার জন্য, তবে তার মানে এই নয় যে, সব ট্রিপের হিসেবই তারা রাখে। ড্রাইভারের সাথে যোগসাজশে দুয়েকটা ট্রিপের হিসেব যে বেমালুম চেপে যাওয়া হয় সেটা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

লোকটা থতমত খেয়ে একটা টালি খাতা বাড়িয়ে দিলো জেফরির দিকে, কিন্তু খাতাটা হাতে তুলে নিলো জামান।

"সব হিসেব রাখেন তো?" জেফরি বললো লোকটাকে।

"জি, স্যার... আমার দুলাভাই এটার মালিক। খুব হিসাবি লোক।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো জেফরি। কয়টা ভ্যান আছে আপনাদের?"

"তিনটা।"

জামান দু'মাস আগের তালিকা থেকে ট্রিপের হিসেব দেখে যাচ্ছে একমনে।

"স্যার, সমস্যাটা কি কওয়া যাইবো?" হাত কচলাতে কচলাতে বললো লোকটি।

"একটা লোকের ঠিকানা জানতে চাচ্ছি...দেড়-দু'মাস আগে ইরাকি কবরস্তান থেকে মালামাল নিয়ে অন্য কোথাও গেছে।"

লোকটা কিছু বলার আগেই জামান বলে উঠলো, "স্যার?" খাতাটা বাড়িয়ে দিলো সে। "এই যে, এখানে মাত্র একটা ট্রিপই ইরাকি কবরস্তানের ঠিকানায় আছে।"

জেফরি খাতার হিসেবটা দেখলো। ইরাকি কবরস্তান থেকে কলাবাগান! কাস্টমারের নাম তওফিক আহম্মেদ। লোকটার দিকে খাতাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো সে, "এই ট্রিপটার ড্রাইভার কে ছিলো?"

খাতাটা ভালো করে দেখে লোকটা বললো, "এইটা তো ১৬২৩ নম্বরের গাড়িটা...মনু মিয়া চালায়।"

"মনু মিয়া কোথায় আছে এখন?"

"বাড়িতে...একটা ট্রিপ মাইরা কাম শেষ কইরা একটু আগেই গেছে।"

"তার সাথে ফোন আছে না?"

"আছে না মাইনে, দুইটা মোবাইল রাখে... ডেরাইবার অইলে কি অইবো, ফুটানি আছে," লোকটা বললো।

"ফোন নাম্বারটা দিন।"

মনু মিয়ার সাথে ফোন কথা বলার পর জানা গেলো ঐ ট্রিপটার কথা তার মনে আছে তবে বাড়িটা ঠিক মনে করতে পারছে না। শুধু গলিটার কথা মনে আছে। ঠিক আছে, তাহলে

মনু মিয়া যেনো দেরি না করে এক্ষুণি চলে আসে তার কোম্পানির অফিসে।

আধঘণ্টা পর মনু মিয়া নামের কভার্ড ভ্যান ড্রাইভার এসে হাজির হলো। জেফরি বেগ আর জামান লোকটাকে নিয়েই রওনা দিলো কলাবাগানের দিকে। যাবার পথে কলাবাগান থানায় ফোন করে জানিয়ে দিলো কিছু পুলিশ যেনো রেডি করে রাখা হয় বিশেষ একটা কাজে।

ঘরের বাতি নিভিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভেবে গেলো বাস্টার্ড, অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলো ব্ল্যাক রঞ্জু যে এখনও বেঁচে আছে সেটা অমূল্য বাবুকে জানিয়ে দেবে। ভালো করেই বুঝতে পারছে, রর অন্য কোনো ঘনিষ্ঠ লোককে ধরে আগের মতোই জেনে নেবার সুযোগ এখন আর নেই। রঞ্জু সতর্ক হয়ে উঠেছে। সে নিশ্চিত কোলকাতা ছেড়ে চলে গেছে অন্য কোথাও। নেপাল? ব্যাঙ্কক? কে জানে। তার বর্তমান ঠিকানা অনেক দিন পর্যন্ত অজানা থেকে যাবে। নিজেকে রক্ষা করার জন্য এই সন্ত্রাসী দীর্ঘদিন অন্তরালে চলে যাবে সন্দেহ নেই। অমূল্য বাবুকে সব খুলে বলাই ভালো।

ঠিক এমন সময় পাশের ঘর থেকে শোনা গেলো তার বাবার বাজখাই কণ্ঠটা। ভগ্ন স্বাস্থ্য হলেও লোকটার কণ্ঠের তেজ এখনও অটুট আছে। মজিদ মজিদ' বলে ডেকে যাচ্ছে শয্যাসায়ী বুড়ো। বাস্টার্ড জানে একটু পরই জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে দেবে। কিন্তু না, বাস্টার্ডকে অবাক করে দিয়ে বুড়ো এবার মজিদের স্ত্রী আমেনাকে ডাকছে। সেই ডাকে যতোটা না ক্রোধ তারচেয়েও বেশি উৎকণ্ঠা।

"আমেনা!...আমেনা...!" বুড়ো হাপিয়ে উঠেছে ডাকতে ডাকতে।

কি ব্যাপার, আমেনা তার বাবার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না কেন? সাধারণত আমেনাকে দুবারের বেশি ডাকতে হয় না। ঠিক তখনই মনে পড়ে গেলো, কিছুক্ষণ আগে একটা কাজে বাইরে গিয়ে সে যখন বাড়িতে ঢুকছিলো তখন মজিদের বখে যাওয়া ছেলেটাকে দেখেছে নীচের তলায় তার মায়ের সাথে কথা বলছে। বাস্টার্ডকে দেখে মা-ছেলে দুজনেই কাচুমাচু হয়ে যায়। মনে মনে মুচকি হেসে বাস্টার্ড নিজের ঘরে চলে আসে। এখন হয়তো সেই ছেলেকে নীচের তলায় কোনো ঘরে বসিয়ে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিচ্ছে। বাস্টার্ড এর আগেও এরকম দৃশ্য দেখেছে।

সে নিজেই তার বাবার ঘরে যাওয়ার জন্যে বিছানা থেকে নামতেই শুনতে পেলো তার বাবার গালাগালি।

"তোরা কারা? আমার ঘরে ঢুকেছিস ক্যান?...কি চাস-"

বাস্টার্ডের গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেলো। তার বাবার ঘরে অচেনা লোকজন ঢুকেছে? অসম্ভব! তারচেয়ে বড় কথা, মনে হচ্ছে কেউ তার বাবার মুখটা চেপে ধরেছে। মাঝপথেই বুড়োর কথা থেমে গেলো আচমকা!

দৌড়ে ড্রয়ার থেকে দুটি ম্যাগাজিন বের করে কোমরে গুঁজে নিলো, তারপর পিস্তলটা হাতে নিয়ে দরজার কাছে এসে আস্তে করে উঁকি মারলো বাইরে।

এই বাড়িটা একটু পুরনো ধাঁচের। দোতলা। চারদিকে বড় বড় চারটা ঘর, মাঝখানে বিশাল ফাঁকা জায়গা। তার বাবার ঘরটা চারকোনা ভবনের সিঁড়িঘরের ঠিক পাশেই, আর ঠিক তার কোণাকুণি বিপরীত দিকে তার ঘরটা। বাবার ঘর থেকে তার ঘরে যেদিক দিয়ে আসা হোক না কেন, এল' আকৃতির বেলকনি পেরিয়ে আসতে হবে। দরজা দিয়ে উঁকি মেরে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেলো সে।

তার বাবার ঘরের সামনে দু'জন অস্ত্রধারী দাঁড়িয়ে আছে। নিঃসন্দেহে ভেতরে রয়েছে আরো কয়েকজন। সিঁড়ি দিয়ে নামার কোনো উপায় নেই। তার ঘরের বাতি বন্ধ থাকায় লোকগুলো এখনও বুঝতে পারছে না সে কোন্ ঘরে আছে তবে ভালো করেই জানে একটু পরই তারা এ ঘরের দিকে ছুটে আসবে।

পুলিশ!

যারা এসেছে তারা সাদা পোশাকের পুলিশ হতে পারে। তবে সে নিশ্চিত নয়। পুলিশ ছাড়া অন্য কেউ হবার কথা নয়। হোমিসাইডের জেফরি বেগ হয়তো তাকে ধরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তার বাবার ঘরের দরজা লক্ষ্য করে পর পর তিনটি গুলি চালালো সে।

দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা দু'জনের মধ্যে একজন তাকে আগেই দেখে ফেলেছিলো, সে হুরমুর করে ঘরে ঢুকে পড়ে কিন্তু অন্যজন সে সময় পায় নি। একটা গুলি সম্ভবত তার তলপেটে লেগেছে। লোকটা দরজার কাছে পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু পাল্টা গুলি

চালাতে ভুললো না। বেলকনির রেলিংয়ের জন্য বাস্টার্ড তাকে পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে না। পুরনো দিনের রেলিং, একেবারে সলিড ইটের তৈরি, কোনো ফাঁকফোকর নেই।

পাল্টা গুলি ছোঁড়া হলো বাস্টার্ডকে লক্ষ্য করে। গুলিটা তার ঘরের দরজার উপরে বিদ্ধ হলো। তার বাবার ঘর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো তখনই।

"শূয়োরের বাচ্চা! তোর বাবাকে শেষ করে ফেলবো...আর একটা গুলিও চালাবি না!"

তার বাবাকে জিম্মি করা হয়েছে।

"বাবলু! তুই আমার কথা ভাবিস না...চলে যা!" তার বাবা চিৎকার করে বললো কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ। তারপর আবারো মুখে চাপা দেবার শব্দ। তার বাবাকে আঘাত করা হয়েছে! মুখ চেপে রাখা হয়েছে যাতে কোনো কথা বলতে না পারে।

আবার সেই কণ্ঠটা শোনা গেলো। "অস্ত্র ফেলে হাত তুলে সারেন্ডার কর, মাদারচোদ! তোর খেল খতম!"

কথাটা শেষ হতে না হতেই তার ঘরের দরজা লক্ষ্য করে পর পর তিন চারটা গুলি করা হলো। বাস্টার্ড কোনো জবাব দিলো না। চুপ মেরে দরজার কাছে নীচু হয়ে বসে রইলো, লক্ষ্য রাখলো তার ঘরের দিকে কেউ আসছে। কিনা। সে জানে নীচু হয়ে থাকলে তাকে কোনোভাবেই ওখান থেকে গুলি করে ঘায়েল করতে পারবে না।

"শূয়োরের বাচ্চা! আমার ভাইকে খুন করেছিস...আমার বউকে খুন করেছিস... গিয়াস... সুলতান... ঝন্টু... বিনয় বাবু!" চিৎকার করে বললো কণ্ঠটা।

ব্ল্যাক রঞ্জু।

একটু থেমে আবার গর্জে উঠলো। "তোর বাপকে এখন নিজের হাতে মারবো। নিজের হাতে!" উদভ্রান্ত নয় কণ্ঠটা, যেনো উন্মাদগ্রস্ত।

বাস্টার্ড দ্রুত ভেবে গেলো। সে যদি আত্মসমর্পণও করে তার বাপকে খুন করবে, সেও মারা যাবে। এ নিয়ে তার মধ্যে কোনো ভ্রান্তি নেই। তারপরও কিছু একটা করতে হবে। দ্রুত মাথাটা খাটাতে লাগলো। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হলো নিজের বাড়িতেই সে সবচাইতে বেশি অসহায় বোধ করছে। চায়না টাউনের অলিম্পাস হোটেলে আটকা পড়েও তার কাছে এমন মনে হয় নি। ওখানে গিয়েছিলো প্রস্ততি নিয়ে কিন্তু এখানে সে একদম অপ্রস্তত। ব্ল্যাক রঞ্জু শুধু বেঁচেই নেই, তাকে কতো দ্রুতই না খুঁজে বের করে ফেলেছে!

আরেকটা গুলি করা হলো। সেই সঙ্গে গর্জন। "আমি তোকে শেষবারের মতো বলছি... অস্ত্র ফেলে দে!" রঞ্জুর গলাটা শোনা গেলো। তাদের ফাঁকা। বাড়িতে সেটা যেনো প্রকম্পিত হলো আরেকবার।

মুহূর্তেই তার মাথায় একটা আইডিয়া চলে এলো।

"আমি তিন গুনবো, শূয়োরের বাচ্চা। তারপর তোর বাপকে গুলি করে মারবো?"

"বাবলু চলে যা-" সঙ্গে সঙ্গে তার বাবার মুখ চেপে ধরলো কেউ।

"বুড়োর মুখ চেপে রাখ, হারামজাদা!"

ব্ল্যাক রঞ্জুর ক্ষিপ্ত কণ্ঠটা শুনতে পেলো সে।

"এক!"

সে বুঝতে পারলো তার একটু সময় দরকার।

"দুই!"

"আমি আসছি..." চিৎকার করে বললো রর উদ্দেশ্যে। "কিন্তু কথা দিতে হবে..." ঘরের ভেতর কিছু একটা খুঁজতে লাগলো নিঃশব্দে।

"কি কথা, মাদারচোদ্দ?"

"আমার বাবাকে প্রাণে মারবে না," বললো সে, কিন্তু মনোযোগ একটা ছোট্ট জিনিস খুঁজতে।

হা-হা-হা করে উন্মাদের মতো হাসি দিলো রঞ্জু। "ঠিক আছে, তোর বাপকে মারবো না, শূয়োর...জলদি অস্ত্র ফেলে সারেন্ডার কর।"

ডেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা জেমস ক্লিপ খুঁজে পেলো সে। কিন্তু আমি গ্যারান্টি চাই!” চিৎকার করে বললো নিজের ঘর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে জেমস ক্লিপটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে টেনে লম্বা করে ফেললো। পুরোপুরি লম্বা হলো না কিন্তু যা হয়েছে তাতে কাজ হবে।

“গ্যারান্টি!” কথাটা বলেই আবার অট্টহাসি দিলো রঞ্জু। “তুই আসলেই বাস্টার্ড!”

আমার নাম জানে! দ্রুত ক্লিপটার দু'মাথা বাঁকিয়ে ইংরেজি সি অক্ষরে মতো করে নিলো।

“শূয়োরের বাচ্চা, কী গ্যারান্টি দেবো?” রঞ্জু পরিহাস করে বললো। “আর কোনো কথা না। এক্ষুণি...”

রঞ্জুর কণ্ঠটা থেমে গেলো আচমকা। সঙ্গে সঙ্গে এলোপাতারি গুলি। কিছুই বুঝতে পারছে না। চারদিক ঘন অন্ধকারে ডুবে গেছে।

সেই অন্ধকারে আরেকটা অট্টহাসি শোনা গেলো। তবে সেটা রঞ্জুর নয়। বাস্টার্ড অবাক হয়ে শুনতে পাচ্ছে তার শয্যাসায়ী বুড়ো বাপ জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে পিশাচের মতো হাসি দিচ্ছে। অন্ধকারে রঞ্জুর লোকজন সম্ভবত উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, এতোক্ষণ তার বাপের মুখ চেপে রেখেছিলো যে সে হয়তো নিজেকে রক্ষা করার জন্য অন্ধকারে এদিক ওদিক ছুটে গেছে।

বাস্টার্ড পর পর তিনটি গুলি চালালো দরজার কাছে পিস্তলটা মেঝেতে চেপে রেখে। অন্ধকারে ফায়ারিংয়ের যে আলো হলো সেটা রঞ্জুর দলকে বিভ্রান্ত করার জন্য যথেষ্ট। তা-ই হলো। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা জবাব দেয়া হলো দরজা লক্ষ্য করে। তবে এবার একটি দুটি নয়, সাত-আটটা। বাস্টার্ড ফায়ারিং করার টাইমিং থেকে আন্দাজ করলো কমপক্ষে পাঁচজন অস্ত্রধারী আছে, তার মধ্যে একজন আহত।

রঞ্জুর দল ভড়কে গেছে। বাস্টার্ড জানে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আবার সামলে উঠবে এ অবস্থা থেকে। কিভাবে বিদ্যুৎ চলে গেলো তারা হয়তো বুঝতে পারছে না। তবে কাজটা যে সে করেছে সেটা নির্ঘাত বুঝতে পারছে।

খুব সহজেই কাজটা করেছে সে। জেমস ক্লিপটা ঘরের সুইচবোর্ডের সকেট প্লগে ঢুকিয়ে দিয়ে সুইচ টিপে দিয়েছে। বিদ্যুতের পজিটিভ আর নেগেটিভ জেমস ক্লিপের কারণে এক হয়ে যাওয়াতে মেইনসুইচের সেফটি ফিউজ কেটে গিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে।

দ্রুত আরেকটা কাজ করলো অন্ধকারে। এটা তার নিজের বাড়ি, নিজের ঘর। অন্ধকারে সে অন্যদের চেয়ে বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। ঘর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হবার আগে বেডসাইড টেবিল থেকে দুটো মোবাইল ফোন নিয়ে দরজার কাছে একটা রেখে নিঃশব্দে চলে গেলো বাম দিকে। এখন তার বাবার ঘরটা ঠিক তার বিপরীতে। মাঝখানে ত্রিশ ফুটের মতো ফাঁকা জায়গা। চারকোনা বাড়ির ফায়দা লুটতে হবে।

এখনও হামাগুড়ি দিয়ে আছে। নিজের কাছে থাকা মোবাইলটা হাতে নিয়ে একটা কল করেই মাথাটা তুলে রেলিংয়ের উপর দিয়ে তাকালো।

সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরের দরজার কাছে থাকা মোবাইলটা সশব্দে বেজে উঠলো। ভড়কে গিয়ে তার বাবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে সেই মোবাইলের আলো লক্ষ্য করে দুই রাউন্ড গুলি করলো রঞ্জুর দলের এক ক্যাডার। কিন্তু অবাক ব্যাপার, শব্দ হলো তিনটি।

“শূয়োরের বাচ্চা!” একটা আর্তনাদ শোনা গেলো। তবে সেটা কার সে জানে না।

এরপরই রঞ্জুর কণ্ঠটা, “কেউ গুলি করবি না। শূয়োরের বাচ্চা টের পেয়ে যাবে!”

আরেকটা কণ্ঠ, “ভাই, ইসহাক গুলি খেয়েছে!”

“চুপ!” রঞ্জুর চাপা কণ্ঠ।

“ভাই, খানকির পোলায় মনে হয় সামনের দিকে আছে, ওইদিক থেইকা ফায়ারিংয়ের আলো দেখছি!” চাপা একটা কণ্ঠ বললো কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পেলো বাস্টার্ড।

“চুপ!” রঞ্জু বললো। সে জানে কথা বললে বাস্টার্ড টের পেয়ে যাবে তাদের অবস্থান। সুনসান। কবরের নীরবতা নেমে এলো পুরো বাড়িটাতে।

বাস্টার্ড বুঝতে পারলো পাঁচজনের মধ্যে এখন রঞ্জুসহ তিনজন আছে। দু'জন গুলিবিদ্ধ, তাদের মধ্যে একজন বেঁচে আছে কিনা বুঝতে পারছে না। তবে তাকে হিসেবের বাইরে রাখা যায়। এখানে যারা এসেছে তাদের সাহস অনেক বেশি থাকতে পারে কিন্তু রঞ্জুর মতো ঠাণ্ডা মাথার কেউ নেই। সে বুঝতে পেরেছে এই অন্ধকারে শব্দ করলে কিংবা ফায়ার করলে নিজেদের অবস্থান জানান দেয়া হবে। এখন তারা চুপ মেরে আছে, কিন্তু বাস্টার্ড জানে তারা বসে নেই, কিছু একটা করছে।

কি করছে?

চারকোণা বাড়ি। মাঝখানে ফাঁকা জায়গা। চারদিক দিয়ে বেলকনি সদৃশ্য প্যাসেজ। সে আছে অস্ত্রধারীদের ঠিক বিপরীতে। বেলকনির রেলিং সাড়ে তিনফুটের মতো উঁচু। রঞ্জুও তার মতো উপুড় হয়ে কিংবা হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে হয়তো। দু'দিক দিয়ে দু'জন এগোতে থাকলে সে ফাঁদে পড়ে যাবে। অন্ধকারটা এখন অনেকটা সহনীয় হয়ে উঠেছে। বাড়িটার বিভিন্ন অংশ আবছা আবছা চোখে পড়ছে। বুঝতে পারলো কিছু একটা করতে হবে। দুদিকে দু'জন এগোতে থাকলেও একজন বাকি থেকে যায়। না। তার বাবার মুখ বন্ধ। তার মানে একজন বুড়োর মুখ চেপে রেখেছে। তাহলে দুদিক থেকে দু'জন বেড়ালের মতো চুপিসারে এগিয়ে আসতে পারে হামাগুড়ি দিয়ে। সে জানে দু'জনকে একসাথে মোকাবেলা করতে পারবে না।

যেকোনো একজনকে...

আর কিছু ভাবলো না। তার একটা সুবিধা হলো তার ঘরের দরজাটা খোলা আছে। মনে মনে ঠিক করে নিলো কি করবে। হাতে থাকা মোবাইল ফোনটা ছুঁড়ে মারলো ডান দিকে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি। দুটো।

ফায়ারিংয়ের আলোতে বুঝে গেলো লোকটার অবস্থান। বিদ্যুতগতিতে ডান দিকে এমনভাবে ঝাঁপ দিলো যাতে করে তার ডান কাঁধটা মেঝেতে ল্যান্ডিং করে, সেই অবস্থায়ই যেখান থেকে ফায়ারিংয়ের আলো হয়েছিলো সেই জায়গা লক্ষ্য করে দুটো গুলি করে শরীরটা গড়িয়ে খোলা দরজা দিয়ে আবারো ঢুকে পড়লো তার ঘরের ভেতর।

একটা গগনবিদারি আর্তনাদ!

লেগেছে! হ্যাঁ, গুলিটা নিশ্চয় লক্ষ্যভেদ করেছে।

ঘরে ঢুকেই দরজার পাশে চলে গেলো সে। সঙ্গে সঙ্গে তার বাম দিক থেকে যে অস্ত্রধারী চুপিসারে এগিয়ে আসছিলো সে গুলি চালালো উদভ্রান্তের মতো। শুনতে পারলো না ক'টা গুলি করা হলো। কানে তালা লাগার জোগাড় হলো। সবগুলো গুলি তার দরজা লক্ষ্য করে করা হয়েছে।

"শাহজাহান!" একটা কণ্ঠ চিৎকার করে বললো। এটা রঞ্জুর কণ্ঠ না।

বাস্টার্ড আরো একটা গুলি করলো দরজার বাইরে, যাতে কেউ তার ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে না পারে। দ্রুত ম্যাগাজিনটা রিলিজ করে কোমর থেকে একটা লোডেড ম্যাগাজিন ভরে নিলো পিস্তলে।

"শাহজান!" কণ্ঠটা আবারো ডাক দিলো।

সে যাকে গুলি করেছে তার নাম শাহজাহান! এখন তাহলে বাকি আছে। দু'জন। সে নিশ্চিত ব্ল্যাক রঞ্জু তার বাবার ঘরে আছে। এই সন্ত্রাসী তার সঙ্গীদের ঠেলে দিয়ে তার বাবার মুখটা চেপে রেখেছে তাহলে! আরো বুঝতে পারলো একটু আগে সে যেখানে ছিলো অন্য লোকটা এখন ঠিক সেখানেই অবস্থান করছে। এই লোক তার ঘরের দিকে এক্ষুণি ছুটে আসবে না। তার এক সঙ্গী ঘায়েল হয়েছে, সুতরাং একটু সময় নেবেই।

বুঝতে পারলো একটা সুযোগ এসে গেছে। তার ঘরের দরজা থেকে বাম দিকে থাকা লোকটার অবস্থান এমন জায়গায় আছে যে একটা পুরনো কৌশল খাটাতে পারে সে।

দরজা থেকে চার-পাঁচ ফুট বামে গিয়ে বেলকনিটা সোজা নব্বই ডিগৃ কোণাকোণি চলে গেছে। অস্ত্রধারী যেখানে আছে সেখানে গুলি করা যাবে না। কিন্তু অন্যভাবে তাকে ঘায়েল

করা যেতে পারে।

হামাগুঁড়ি দিয়ে দরজার কাছে এসে উঁকি দিলো। আবছা অন্ধকারে আন্দাজ করে নিলো একটা জায়গা। তারপর পিস্তলটা অটো করে নিয়ে তাক করলো সেই কল্পিত জায়গা লক্ষ্য করে। এখন এক ট্রিগারে পুরো ম্যাগাজিনটা খালি হয়ে যাবে। ব্রাশ ফায়ারের মতো সবগুলো গুলি বের হয়ে যাবে এক নিমেষে। এটা একটা জুয়া, কিন্তু সে জানে এই জুয়াটা তাকে খেলতেই হবে।

পিস্তলটা নীচু করে ট্রিগার টিপে দিলো।

ধিম্! ধি! ধি! ধিম্....

একনাগাড়ে দশটি বুলেট বের হয়ে গেলো তার পিস্তল থেকে। সবগুলোই আঘাত করলো কল্পিত সেই জায়গায়।

একটা আর্তনাদ। যন্ত্রণাদায়ক গোঙানি।

জুয়া খেলায় সে জিতে গেছে। বাম দিকের রেলিংয়ের নীচে যে অস্ত্রধারী ছিলো সে ঘায়েল হয়েছে। তার পিস্তল থেকে বের হওয়া গুলি অস্ত্রধারীর ডান দিকের দেয়ালে লেগে পিছলে গেছে কারণ বাস্টার্ড কোণাকোণি ফায়ার করেছে। পিছলে যাওয়া দশটি গুলির মধ্যে কমপক্ষে একাধিক গুলি বিদ্ধ করেছে রঞ্জুর অস্ত্রধারীকে।

"শূয়োরের বাচ্চা!" রঞ্জুর কণ্ঠটা শোনা গেলো তার বাবার ঘর থেকে। সেই কণ্ঠে যতোটা না ক্ষোভ তারচেয়ে বেশি অসহায়ত্ব। সেও তার সঙ্গীর গোঙানিটা শুনতে পেয়েছে। "তোর বাবাকে কথাটা আর বলতে পারলো না, একটা যন্ত্রণাদায়ক চিৎকার দিয়ে উঠলো রঞ্জু। সঙ্গে সঙ্গে তিনটা গুলি।

কি হলো! বাস্টার্ড বুঝে উঠতে পারছে না। তার বাবা! স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে তার বাবার অস্ফুট আর্তনাদটা। বুড়ো আর নেই। রঞ্জু তাকে গুলি করেছে। কিন্তু রঞ্জু চিৎকার দিলো কেন? এখনও সে যন্ত্রণাদায়ক শব্দ করে যাচ্ছে তবে চেষ্টা করছে চেপে রাখার জন্য। খুব সম্ভবত তার বাবা কিছু একটা দিয়ে রঞ্জুকে আঘাত করেছে। রঞ্জু এখন আহত!

এই সুযোগ।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো সে। এক দৌড়ে ছুটে গেলো তার বাবার ঘরের দিকে।

"শূয়োরের বাচ্চা!" রঞ্জুর ক্ষুব্ধ কণ্ঠ। পর পর দুটো গুলি। ছিটকে দরজার বাইরে রেলিংয়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেলো বাস্টার্ড। দরজার কাছে আসতেই তাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে রঞ্জু। মরিয়া হয়ে আরো গুলি করতে চাইলো সে।

ক্লিক! ক্লিক! ক্লিক!

মেঝেতে পড়ে থেকেই উদভ্রান্তের মতো রঞ্জুর ট্রিগার চেপে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলো সে। তার আর বুঝতে বাকি রইলো না। টের পেলো গুলি খেয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়লেও পিস্তলটা এখনও বেহাত হয়ে যায় নি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অবয়বটা লক্ষ্য করে গুলি চালালো।

ক্লিক! ক্লিক!

সর্বনাশ। রঞ্জুর একার নয়, তারও গুলি ফুরিয়ে গেছে। একটু আগে পুরো পিস্তল খালি করে ব্রাশ ফায়ার করেছিলো, তারপর আর ম্যাগাজিন ভরতে পারে নি।

রঞ্জু অট্টহাসি হেসে সজোরে একটা লাথি মরলো তার বুক লক্ষ্য করে। ককিয়ে উঠলো সে। পর পর বেশ কয়েকটি লাথি। তারপর পিস্তলের বাট দিয়ে তার মাথা আর মুখে এলোপাতারি আঘাত করতে লাগলো। উন্মাদের মতো আচরণ করছে সে। যেনো খালি হাতেই শেষ করে ফেলবে তাকে। বাস্টার্ড কোনো প্রতিরোধই করতে পারলো না। সে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তবে গুলিটা কোথায় লেগেছে এখনও বুঝতে পারছে না, শুধু বুঝতে পারছে সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। তার উপর রঞ্জুর লাথি আর পিস্তলের বাটের আঘাতে একেবারে পর্যদস্ত। বুঝতে পারছে তার মাথা, নাক-মুখ ফেঁটে রক্ত পড়ছে। ঝাপসা হয়ে আসছে দু'চোখের দৃষ্টি। কানের উপর রঞ্জুর কয়েকটা লাথি পড়তেই মাথাটা চক্কর দিয়ে

উঠলো।

রঞ্জু তার হাতে পিস্তলটা ফেলে দু'হাতে রেলিং ধরে ম্যানিয়াকের মতো লাথি মেরে যেতে লাগলো। শরীরটা কুকড়ে এলোপাতারি লাথি থেকে নিজেকে বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে।

"শূয়োরের বাচ্চা! আমাকে খুন করতে চেয়েছিলি!" রঞ্জু লাথি মারছে আর বলছে। "কে তোকে আমার পেছনে লাগিয়েছে...বল?"

একটা লাথি তার ঠোঁটের উপর লাগার সাথে সাথে টের পেলো একটা দাঁত ভেঙে গেছে, অন্য আরেকটা বেঁকে গেছে কিছুটা।

"বাস্টার্ড! এই যে আমি এসে গেছি!" গর্জে উঠে রঞ্জু দ্বিগুন শক্তিতে লাথি মারতে লাগলো। পেটে, বুকে, মুখে। "বল, শূয়োরের বাচ্চা!"

দুহাত দিয়ে মুখটা কোনো রকম আড়াল করে রক্ষা করে গেলেও বুক আর পেটে উপুর্যপরি আঘাতে সে বিধ্বস্ত। রেলিংটা দুহাতে শক্ত করে ধরে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে লাথি মারছে ব্ল্যাক রঞ্জু।

হঠাৎ সাইরেনের শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে উঠলো সন্ত্রাসী। মারামারি থামিয়ে আশেপাশে তাকালো উদভ্রান্তের মতো।

পুলিশ!

সঙ্গে সঙ্গে শরীরের শেষ শক্তিটুকু জড়ো করে বাস্টার্ড শুধু একটা কাজই করলো : ব্ল্যাক রঞ্জুর দু'পা খপ করে ধরে ফেললো সে। তার ডান হাত আর ডান কাঁধের মাঝখানে রঞ্জুর পাদুটো চেপে ধরে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো। দু'পা কিছুটা শূন্যে উঠে যেতেই ভারসাম্য হারিয়ে ভড়কে গেলো ব্ল্যাক রঞ্জু। দু'হাতে রেলিংটা শক্ত করে ধরে রাখলো সে। বুঝতে পারলো বেকায়দা পড়ে গেছে, কিন্তু কিছু একটা করার আগেই বাস্টার্ড শরীরের সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করে এক ঝটকায় রেলিংয়ের উপর দিয়ে উল্টে ফেলে দিলো সন্ত্রাসীকে। চার হাত-পা ছড়িয়ে সোজা নীচে পড়ে গেলো রঞ্জু।

একটা গগনবিদারি চিৎকার।

বাস্টার্ড ধপাস করে আবারো পড়ে গেলো মেঝেতে। সাইরেনের শব্দটা কানে এলেও চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। যেনো শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। হঠাৎ ক্ষীণ একটা কণ্ঠ শুনে বোঝার চেষ্টা করলো। কণ্ঠটা এখন কাশছে। মরণকাশি!

তার বাবা! মৃত্যুর আগে কিছু বলতে চাচ্ছে যেনো, কিন্তু মুখ দিয়ে যে শব্দ বের হচ্ছে সেটা একেবারেই জড়ানো আর ক্ষীণ। আবারো ভয়ানকভাবে কাশির আওয়াজ শোনা গেলো।

"বাবলু...তোর মা...!"

স্তব্ধ হয়ে গেলে কণ্ঠটা। সাইরেনের শব্দটা এখন প্রকট হয়ে উঠেছে।

তার বাবার শেষ কথাটা কি ছিলো? নিশ্চিত হতে পারলো না। জীবনের শেষ সময়ে হয়তো তার বাবা সত্যি কথাটা বলে যেতে চেয়েছিলো কিন্তু তার কপালটাই খারাপ। বুড়ো বলতে পারলো না। কী বলতে চেয়েছিলো? তার মা বেশ্যা ছিলো না?

গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবার আগে শুধু ভাবতে পারলো সে মারা যাচ্ছে। তারপরই গাঢ় অন্ধকার আর শব্দহীন হয়ে পড়লো তার জগতটা। শরীরের সমস্ত যন্ত্রণা আর ভয় দূর হয়ে এক স্বস্তিদায়ক বিবশতা গ্রাস করলো তাকে।

দু'চোখ খুলে নতুন জগতটা দেখার চেষ্টা করলো।

এক মায়াবী মুখের নারী উপুড় হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। পরম মমতায় তার কাঁপালে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে। সেই বিবশতা, সেই ঘোরের মধ্যেও টের পেলো মহিলার হাতের পরশে তার শরীরে অনাবিল সুখের অনুরণন ছড়িয়ে পড়ছে। খুব ভালো লাগছে তার। এই জীবনে এতো ভালো আর কখনও লাগে নি।

মা।

কলাবাগান থানার পুলিশের একটি দল নিয়ে জেফরি বেগ আর জামান সংকীর্ণ একটা গলিতে ঢুকতেই শুনতে পায় ব্যাপক গোলাগুলির আওয়াজ। লোকজন ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে; কেউ কেউ উঁকিঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছে। ছোটোখাটো একটা ভীড় লেগে আছে গলির মাঝামাঝি জায়গায়। সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন বাজিয়ে দেয় পুলিশ। ভীড়টা ভেঙে যায় মুহূর্তে।

পুলিশের গাড়ি আরেকটু এগোতেই দেখতে পায় তিন-চারজন সাহসী লোক একটি দোতলা বাড়ির দিকে চেয়ে আছে, তাদেরকে দেখেই হাত তুলে বাড়িটা দেখিয়ে দেয় তারা। এই বাড়ির ভেতর থেকেই গোলাগুলি হচ্ছে। পুলিশ দ্রুত পজিশন নিয়ে নেয় বাড়ির আশেপাশে।

তবে ভেতরে ঢোকার আগেই জেফরি বেগ বুঝে গিয়েছিলো দেরি করে ফেলেছে। একটা আর্তনাদ হতেই সেটা থেমে যায়। হুট করেই যেনো কবরের নিস্তব্ধতা নেমে আসে সেখানে।

ভেতরে ঢোকার পর নীচ তলা থেকে এক মহিলাকে হাত-পা-মুখ বাধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়, মহিলা আর কেউ না, মজিদের স্ত্রী আমেনা। মজিদ একটা কাজে বাইরে গিয়েছিলো ফিরে এসে দেখে পুরো বাড়ি পুলিশ ঘিরে রেখেছে। দোতলায় পাঁচটি লাশ পড়ে আছে।

বাস্টার্ডের বাবার নিথর দেহটা আবিষ্কার করা হয় তার বিছানায়। বুড়োর বুকে তিনটি গুলিবিদ্ধ হয়েছে। মারা যাবার আগে মুখ দিয়ে রক্ত বমি করেছে সে। তার বিছানার সাইডটেবিলে একটা প্লেটে পেপের টুকরো আর পনির ছিলো। চামচ থাকলেও কাটা চামচটা পাওয়া যায় রক্তাক্ত অবস্থায় দরজার কাছে। দোতলা থেকে পড়ে মারাত্মক আহত লোকটার ডান উরুতে একটা আঘাতের ক্ষত আছে। পুলিশ বুঝতে পারে এটা ঐ কাটা চামচের আঘাতের কারণেই হয়ে থাকবে।

রঞ্জুর চার সহযোগীর লাশ দোতলার বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া গেছে। তারা সবাই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। প্রত্যেকের সাথে অস্ত্র ছিলো। বোঝ গেছে। এদের সাথেই গানফাইট হয়েছিলো বাস্টার্ডের। সব দেখে পুলিশ বিস্মিত না হয়ে পারে নি, একজন মানুষ কিভাবে পাঁচজন অস্ত্রধারীকে ঘায়েল করতে পারলো! তবে হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ জানালো বাস্টার্ড খুবই ভয়ঙ্কর প্রকৃতির খুনি। তারপক্ষেই কেবল সম্ভব এ কাজ করা। আর যেসব সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে তারা যে সবাই ব্ল্যাক রঞ্জুর দলের লোক সে ব্যাপারে জেফরির মনে কোনো সন্দেহ নেই।

বাস্টার্ডের নিথর দেহটা খুঁজে পায় তার বাবার ঘরের দরজার ঠিক বাইরে। বুকে গুলিবিদ্ধ। অবস্থা একেবারে সংকটাপন্ন। তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও জেফরির ধারণা এই আঘাত থেকে সেরে উঠতে পারবে না। হয়তো হাসপাতালে নেবার পথেই সে মারা যাবে।

অবশেষে জেফরি বেগ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তার মিশন শেষ হয়েছে। লেখক জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠেছে সে। এতোগুলো খুনের বীভৎসতার মাঝেও এক ধরণের সন্তুষ্টি পেলো, তবে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও অপরাধ বোধে আক্রান্ত হলো তুখোড় এই ইনভেস্টিগেটর।

সব আলামত সংগ্রহ করে, ঘটনাস্থল দেখে যখন মাঝরাতের দিকে গাড়িতে করে বাড়িতে ফিরছে তখন বুঝতে পারলো, আজ অনেক দিন পর তার ভালো ঘুম হবে।

"মা!" অস্ফুট কণ্ঠে বললো সে। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে পেলো একটা মায়াবি মুখ তার দিকে চেয়ে আছে উপুড় হয়ে। মুখটা খুব চেনা চেনা লাগছে। নরম হাতের পরশ পেলো কপালে। সারা দেহে বয়ে গেলো অদ্ভুত এক ভালো লাগার অনুভূতি।

চারপাশটা দেখার চেষ্টা করলো। যতোটুকু দেখতে পেলো শুধু সাদা আর সাদা। যে মুখটা তার দিকে চেয়ে আছে সেও সাদা পোশাক পরে আছে। ধবধবে সাদার জগতে আছে সে। এতো ভালো তার কখনই লাগে নি। আবার চোখ বুজে ফেললো। তবে কপালে নরম হাতের পরশ ঠিকই টের পাচ্ছে। সে জানে সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছে। তার মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে। স্বপ্নটা ভেঙে বাস্তবে ফিরে আসতে চাইছে না। এই সুন্দর, নরম, সাদা স্বপ্নে হারিয়ে যেতে চায় সে।

একটা শব্দ শুনে চোখ খুলে তাকালো সে। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো স্বপ্নটা এখনও দেখছে। চারদিক ধবধবে সাদা। মায়াবী মুখটা এখনও চেয়ে আছে তার দিকে। পরম মমতায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে তার কপালে।

মুখটা চেনা চেনা লাগছে। চোখ দুটো অনেক মায়াবী। অতীতের কোনো এক সময় এ চোখ দুটো প্রবল আকুতি জানিয়েছিলো তার কাছে।

"এখন কেমন লাগছে?" নারীকণ্ঠটা বললো।

কী মিষ্টি কণ্ঠটা। সে কিছু বললো না। শুধু চেয়ে রইলো।

"ভগবানের কৃপায় বেঁচে গেছেন।" মিষ্টি করে হাসলো মায়াবী মুখটা।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

উমা!

ঘটনার চার দিন পর বাস্টার্ডের জ্ঞান ফিরে আসে। যে গুলিটা তার বুকের বাম দিকে বিদ্ধ হয়েছে সেটা ফুসফুস ভেদ করলে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠতো। কিন্তু ভাগ্য ভালো, গুলিটা ফুসফুস ঘেষে তার পিঠ ভেদ করে চলে গেছে। দ্রুত অপারেশন করতে হয়েছিলো। গুলি ছাড়াও তার শরীরে মারাত্মক আঘাত ছিলো বেশ কয়েকটি। পাঁজরের হাড় ভেঙেছে কমপক্ষে দুটো। নাক-মুখ একেবারে থেতলে গেছে। দুটো দাঁতও পড়ে গেছে। মুখমণ্ডল ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ডাক্তার বলেছে এ রোগীর সেরে উঠতে কমপক্ষে এক মাস লাগবে।

পাঁচদিনের দিন জেফরি বেগ হাসপাতালে আসে বাস্টার্ডকে দেখতে। তাকে দেখে অবাক হয় নি সে। কারণ ইতিমধ্যেই জেনে গেছে পিজি হাসপাতালের প্রিজনসেলে রয়েছে সে। তার এক হাত স্টিলের বেডের সাথে হ্যান্ডকাফ দিয়ে বাধা থাকে সব সময়। প্রিজনসেলের দরজায় প্রহরীও থাকে সার্বক্ষণিক।

"এখন কেমন লাগছে?" তার বিছানার কাছে একটা চেয়ার টেনে বসে জানতে চাইলো হোমিসাইডের ইনভেস্টিগেটর জেফরি বেগ।

"ভালো," সেলাই করা ঠোঁট একটু ফাঁক করে কোনোমতে বলতে পারলো সে। একদৃষ্টে চেয়ে রইলো সামনের লোকটার দিকে।

"বিশাল বাঁচা বেঁচে গেছো," কথাটা বলে ঘরের দিকে চেয়ে দেখলো, এককোণে নার্সের ইউনিফর্মে উমা দাঁড়িয়ে আছে। তার উদ্দেশ্যে বললো সে, "তুমি একটু ঘর থেকে বাইরে যাও, আমি ওর সাথে কিছু কথা বলবো।"

বাস্টার্ড জানে না এই মেয়ে এখানে কিভাবে এলো। নার্সই বা হলো কেমন করে। উমা চুপচাপ চলে গেলো ঘর থেকে।

"ও থাকলে সমস্যা হতো না," নীচু কণ্ঠে বললো বাস্টার্ড। তার ঠোঁটে মৃদু হাসি।" ও অনেক ঘটনাই জানে।"

"সেটা আমিও জানি," জেফরি বেগ বললো। তবে এখন যে কথাটা বলবো সেটা তার শোনার দরকার নেই।"

"কি কথা?"

"আছে। লম্বা একটা গল্প," মাথা নেড়ে বললো সে। "ব্ল্যাক রঞ্জুকে কোলকাতায় গিয়ে মারার কন্ট্রাক্টটা কে তোমাকে দিয়েছিলো?"

রঞ্জু। এ নামটা তার মনেই ছিলো না। জ্ঞান ফিরে আসার পর এই প্রথম নামটা শুনলো। রঞ্জু কি বেঁচে আছে? নাকি মরে গেছে?

"রঞ্জু কোথায়?" উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলো সে।

ভুরু কুচকে তাকালো জেফরি বেগ। "তুমিই তো কোলকাতায় গিয়ে ওকে খুন করে এসেছো..."

আৎকে উঠলো বাস্টার্ড। এরা দেখি জানে না। সর্বনাশ। "ওটা রঞ্জু ছিলো না!"

"কি?!" রীতিমতো ভিমরি খেলো জেফরি বেগ।

"ওটা রঞ্জু ছিলো না...কোলকাতায় যাকে মেরেছি..."

"তাহলে?" টেরই পেলো না চেয়ার থেকে উঠে গেছে সে।

"দোতলা থেকে যাকে নীচে ফেলে দিয়েছি...ও-ই রঞ্জু। আসল রঞ্জু!"

"মাইগড!" জেফরি বেগ বাস্টার্ডের কাঁধটা ধরে ফেললো। "তুমি এসব কী বলছো?"

"আমি সত্যি বলছি। ওটাই রঞ্জু। আমার বাড়িতে এসেছিলো আমাকে মারতে...নীচে ফেলে দিয়েছি...ও কোথায়.. বেঁচে আছে, নাকি...?" বাস্টার্ড উত্তেজিত হয়ে বলে গেলো কথাগুলো। মনে মনে ভাবতে লাগলো বোকাচোদা : পুলিশ নিশ্চয় আহত রঞ্জুকে চিনতে না পেরে ছেড়ে দিয়েছে। হাত ফসকে বের হয়ে গেছে ভয়ঙ্কর সেই সন্ত্রাসী।

জেফরি বেগ ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লো। তাকে দেখে বাস্টার্ড যারপরনাই হতাশ। একদৃষ্টে চেয়ে রইলো হোমিসাইড ইনভেস্টিগেটরের দিকে।

"তুমি যা বলছো, সত্যি বলছো তো?" বেশ শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো জেফরি বেগ।

“একদম সত্যি।”

“কিভাবে জানলে কোলকাতার ঐ লোকটা আসল রঞ্জু নয়?”

মুখটা সরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে রইলো বাস্টার্ড। তার খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। কথা বলতে ভালো লাগছে না। কয়েক মিনিট এরকম নীরবতায় কেটে গেলো।

“রঞ্জু বেঁচে আছে।”

জেফরি বেগের কথাটা শুনে ফিরে তাকালো সে।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আবার বললো, “হাসপাতালে আছে...তোমার মতোই প্রিজনসেলে।” চওড়া একটা হাসি ফুটে উঠলো জেফরি বেগের মুখে।

বাস্টার্ডের নিষ্প্রভ চোখ দুটো প্রাণ ফিরে পেলো যেনো।

“তার অবস্থা তোমার চেয়েও খারাপ। দুই পা ভেঙে গেছে...কোমরের অবস্থাও ভালো না। বেঁচে থাকলেও এ জীবনে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। ডাক্তার সেরকমই বলেছে।”

ভালো লাগার অনুভূতিটা আবার ফিরে এলো বাস্টার্ডের মধ্যে।

“আমরা অবশ্য তাকে রঞ্জু হিসেবে নয়, রঞ্জুর সহযোগী হিসেবে বন্দী করে রেখেছি।”

বাস্টার্ড কিছু বললো না, যদিও কথাটা তাকে দারুণ স্বস্তি দিয়েছে।

একটু চুপ থেকে জেফরি বেগ আবারো জানতে চাইলো, “রঞ্জুকে হত্যা করার কন্ট্রাক্টটা কে তোমাকে দিয়েছে?”

“আমি আমার ক্লায়েন্টের নাম বলি না,” দূর্বল কণ্ঠে বললেও কথাটার মধ্যে দৃঢ়তা আছে।

জেফরি একদৃষ্টে চেয়ে রইলো তার দিকে। “তুমি কি জানো, তোমার ক্লায়েন্টরা কেন তোমাকে দিয়ে রঞ্জুকে হত্যা করাতে চেয়েছিলো?”

“জানি,” আস্তে করে বললো সে।

“তাই নাকি?” অবাক হলো জেফরি। “সব জেনেও এরকম একটি ষড়যন্ত্রে নিজেকে জড়িয়ে ফেললে?”

বিস্ময়ে তার দিকে তাকালো বাস্টার্ড। “ষড়যন্ত্র?...একজন শীর্ষ সন্ত্রাসী মোটা অঙ্কের চাঁদা চেয়ে কাউকে হুমকি দিলো, আর সেই লোক যদি তাকে খুন করতে চায় তাহলে সেটা ষড়যন্ত্র?”

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো জেফরি বেগ। “চাঁদাবাজি?”

“হ্যাঁ। চাঁদাবাজি। এর বেশি কিছু বলবো না।”

“ওহ্।” মাথা দোলাতে লাগলো জেফরি বেগ। তার মানে তুমি কিছুই জানো না!”

জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইলো বাস্টার্ড।

“ব্ল্যাক রঞ্জু যে কিছুদিন পর ভয়াবহ একটি অপারেশন করতে যাচ্ছিলো সে সম্পর্কে তুমি আসলেই কিছু জানো না?”

“অপারেশন?” বাস্টার্ড কিছুই বুঝতে পারছে না। এই ইনভেস্টিগেটর এসব কী বলছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো জেফরি, “এতো দেখি ভয়াবহ ষড়যন্ত্র!”

“আপনি এসব কী বলছেন?”

জেফরি বেগ বুঝতে পারলো বাস্টার্ড আসলেই কিছু জানে না। স্পেশাল ব্রাঞ্চের সেই গোপন ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট সম্পর্কে তাকে বিস্তারিত বলে গেলো। আরো জানালো, ব্ল্যাক রঞ্জুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ঝন্টুও এই ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করেছে।

সব শুনে থ বনে গেলো বাস্টার্ড।

মি: টেন পার্সেন্ট হিসেবে খ্যাত সাবেক প্রধানমন্ত্রীর স্বামীর দুর্নীতির কারণে গত নির্বাচনে বর্তমান বিরোধী দল জনগনের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়। স্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে এক ধরণের দ্বৈতশাসন চালিয়েছিলো ভদ্রলোক। সব ধরণের কাজ আর সিদ্ধান্ত তার অনুমতি ছাড়া হতো না। সে-ই হয়ে উঠেছিলো ক্ষমতার আসল কেন্দ্রবিন্দু। ভদ্রলোক নিজের এই অবৈধ ক্ষমতার পুরোটাই ব্যবহার করে টাকা কামানোর কাজে। এমন কি প্রধানমন্ত্রীর দলের ভেতর প্রচুর অনুগামীও তৈরি করে ফেলে সে।

পরবর্তী নির্বাচনে ভরাডুবি হলে মি: টেন পার্সেন্টের বিরুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির মামলা করে নতুন সরকার। সেই মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রীর স্বামী দীর্ঘদিন ধরে জেলে আছে। তার অনেক মামলার বিচার কাজ শুরুও হয়ে গেছে এরইমধ্যে। এভাবে পাঁচটি বছর কেটে যাবার পর, আরেকটি নির্বাচনের দ্বারপ্রান্তে যখন দেশ তখন মি: টেন পার্সেন্টের সাথে তার স্ত্রী, অর্থাৎ সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়ে যায়। মহিলা দেরিতে হলেও নিজের ভুল বুঝতে পারেন। স্বামীর পছন্দের লোকজনকে দলের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে তিনি সৎ ও যোগ্য লোকজনকে অধিষ্ঠিত করতে থাকেন। স্বামীর দুর্নীতির সব কিছু জানতে পেরে এই কলঙ্ক থেকে নিজেকে এবং দলকে উদ্ধার করার জন্য ব্যাপক সংস্কার হাতে নেন।

জেলে বসে মি: টেন পার্সেন্ট বুঝতে পারে তার স্ত্রী সামনের নির্বাচনে জিতলেও দুর্নীতির মামলা থেকে সে মুক্তি পাবে না। এমনকি তার স্ত্রী তাকে ডিভোর্স করার চিন্তাভাবনা করছে বলেও তার কাছে খবর আসতে থাকে। অন্য দিকে বর্তমান সরকার পুণরায় নির্বাচিত হলে তার আর কোনো আশাই থাকবে না।

এরকম পরিস্থিতিতে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা মি: টেন পার্সেন্ট অস্থির হয়ে ওঠে। এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্র করে ভদ্রলোক।

কুখ্যাত সন্ত্রাসী ব্ল্যাক রঞ্জুর সাথে মি: টেন পার্সেন্টের আগে থেকেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থেকে রঞ্জুও হাঁপিয়ে উঠেছে। প্রস্তাবটা পাওয়া মাত্র লুফে নেয় সে। পুরো পরিকল্পনাটি সফল হলে দেশে ফিরে আসতে পারবে, চলে যেতে পারবে ক্ষমতার অনেক কাছাকাছি।

মি: টেন পার্সেন্টের ষড়যন্ত্রটি ছিলো এরকম :

বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষ হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসবে। দেশে বইবে নির্বাচনী হাওয়া। শুরু হবে প্রধান প্রধান দলগুলোর নির্বাচনী ক্যাম্পেইন। ঠিক এমন সময় তার স্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচনী জনসভা করার সময় ব্ল্যাক রঞ্জুর দল হত্যা করবে। মহিলা খুন হলে সন্দেহের তীর গিয়ে পড়বে বিগত সরকারী দলের উপর। জনগণের সেন্টিমেন্ট চলে যাবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং তার দলের অনুকূলে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাধ্য হবে মি: টেন পার্সেন্টকে প্যারোলে মুক্তি দিতে। মুক্তি পেয়ে সে পাবলিক সেন্টিমেন্ট কাজে লাগিয়ে আর প্রচুর টাকা খরচ করে স্ত্রীর দলের আপদকালীন প্রধান হিসেবে অধিষ্ঠিত হবে। তার নেতৃত্বে দল নির্বাচনে যাবে আর বলাই বাহুল্য এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক লিগ্যাসির কারণে জনগণের আবেগকে পুজি করে নির্বাচনে নির্ঘাত জয় লাভ করতেও সক্ষম হবে। মি: টেন পার্সেন্ট হয়ে যাবে এ দেশের সর্বেসর্বা। নতুন প্রধানমন্ত্রী।

মোক্ষম একটি চাল। ভয়ঙ্কর একটি পরিকল্পনা। ঠিকমতো বাস্তবায়ন করতে পারলে দেশের ইতিহাস পাল্টে যেতো। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয় নি।

হাসপাতালের এক ডাক্তারের সহায়তায় প্রিজনসেলে বসে মোবাইল ফোন হাতে পেয়ে মি: টেন পার্সেন্ট বাথরুম থেকে ব্ল্যাক রঞ্জুকে যখন ফোন করে তখন দেয়ালের ওপাশ থেকে তৃতীয়শ্রেণীর এক কর্মচারি মিরাজ শেখ সব শুনে ফেলে। মিরাজ শেখ হাসপাতালের এক মহিলা কর্মচারির সাথে অবৈধকাজে লিপ্ত হবার জন্যে একটা স্টোররুমে অপেক্ষা করছিলো সেই সময়। আর সেই স্টোর রুমটা ছিলো প্রিজনসেলের বাথরুমের দেয়ালের ওপাশে। এক সময় ওটাও ছিলো একটা সেল। পরে দেয়াল ভেঙে বাথরুমসহ পুরো সেলটাকে পরিণত

করা হয় স্টোররুমে।

গোয়েন্দা কর্মকর্তারা খবর পেয়েছিলো, হাসপাতালের এক ডাক্তার শিডিউলের বাইরে মি: টেন পার্সেন্টের কাছে গেছে। তারা কিছুটা আঁচ করতে পেরে তড়িঘড়ি ছুটে এলেও মি: টেন পার্সেন্টকে থামাতে পারে নি। বাথরুমের দরজা ভেঙে যখন তারা ঢোকে তার আগেই লোকটা কথাবার্তা সেরে ফেলে মোবাইল ফোনটা কমোডে ফ্ল্যাশ করে দেয়। কিন্তু গোয়েন্দাদের একজনের তীক্ষ্ম চোখে প্রিজনসেলের বাথরুমের দেয়ালের ফুটোয় কিছু একটা ধরা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গোয়েন্দাবাহিনীর লোকজন ছুটে যায়, হাতেনাতে ধরে ফেলে মিরাজ শেখকে।

গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদে মিরাজ শেখ বলে দেয় মি: টেন পার্সেন্টের ফোনালাপে সে কি শুনতে পেয়েছে। তারপর, যে ডাক্তার মি: টেন পার্সেন্টকে মোবাইল ফোন সরবরাহ করেছিলো তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও এর সত্যতা মেলে। সামান্য একটা ফোন কলের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য পাঁচলক্ষ টাকা দেয়া হয়েছিলো সেই ডাক্তারকে। কথাটা জানতে পেরে গোয়েন্দারা নড়েচড়ে ওঠে। সুইপার দিয়ে পিজি হাসপাতালের সুয়ারেজ লাইন থেকে বহুকষ্টে মি: টেন পার্সেন্টের মোবাইল ফোনটা উদ্ধার করে তারা। ফোন সেটটা নষ্ট হয়ে গেলেও এর ভেতরে থাকা সিমটা অক্ষত ছিলো। সেই সিমের সূত্র ধরে তারা জানতে পারে মি: টেন পার্সেন্ট আসলেই কোলকাতায় একটি ফোন করেছে।

এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রটি উন্মোচিত হলে তারা এটি রিপোর্ট আকারে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠায়। রিপোর্ট পড়ে প্রধানমন্ত্রী দুটো কাজ করেন : প্রথমত তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করার নির্দেশ দেন। দ্বিতীয়ত, রিপোর্টে যে ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে সেটা নিজের প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দেন দু'পক্ষের কাছে বিশ্বস্ত এক লোকের মাধ্যমে।

ঠিক এমন সময় ব্ল্যাক রঞ্জু চাঁদা চেয়ে টেলিফোনে হুমকি দেয় ঐ দুই ব্যবসায়ীকে। এ নিয়ে ব্যবসায়ী দু'জন বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ঢাকা ক্লাবের এক আড্ডায় কথাটা তারা শেয়ার করে অমূল্য বাবু আর প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ লোকটির সাথে। ব্যবসায়ীরা অবশ্য জানতো না ব্ল্যাক রঞ্জুর দল সামনে কী করতে যাচ্ছে।

ঐ দুই ব্যবসায়ীকে বিদায় দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ লোক আর অমূল্য বাবু যখন একই গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিলো তখনই অমূল্য বাবুকে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ লোকটি ষড়যন্ত্রের কথাটা জানায়। ভদ্রলোক এ থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় কি জানতে চাইলে অমূল্য বাবু প্রস্তাব দেয় একজন প্রফেশনাল হিটম্যানকে দিয়ে ব্ল্যাক রঞ্জুকে খুন করার জন্য। কিন্তু এরকম কেউ কি আছে-এ প্রশ্নের জবাবে অমূল্য বাবু মুচকি হেসে জানায়, একজন লোকই এটা করতে পারবে। আর সেরকম একজন লোকের খোঁজ তার কাছে আছে।

শুরু হয় পাল্টা একটি ষড়যন্ত্রের।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার আগে বাস্টার্ডকে হোমিসাইড ডিপার্টমেন্ট থেকে ঘুরে আসতে হয়। ইন্টেরোগেশন রুমে তাকে টানা তিন ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে জেফরি বেগ। কিন্তু খুব কম কথাই সে স্বীকার করে।

জেফরি বেগের কাছে যখন সে জানতে চায় ব্ল্যাক রঞ্জু তাকে কিভাবে খুঁজে বের করলো এতো দ্রুত, তখন ইনভেস্টিগেটর জানায় সমগ্র ঢাকা শহরের প্রায় সবগুলো এলাকায়ই কমবেশি ব্ল্যাক রঞ্জুর লোকজন রয়েছে। তো বাস্টার্ড যেখানে থাকে সেই কলাবাগানেও তার কিছু লোকজন আছে, আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাস্টার্ডের বাড়িতে থাকা বিশ্বস্ত লোক মজিদ আর আমেনার বখে যাওয়া একমাত্র ছেলে রিপন রঞ্জু গ্রুপের ছোটোখাটো সদস্য।

কোলকাতায় বাস্টার্ড যাকে খুন করেছে তারও নাম রঞ্জু। তার ছবিই ঢাকার সবগুলো থানায় রয়েছে। এটা ব্ল্যাক রঞ্জুর একটি অভিনব কৌশল। তার বস্ রঞ্জুর সাথে থাকার সময়েই বুঝতে পেরেছিলো একই দলে এক নামের দু'জন সন্ত্রাসী থাকলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়।

অন্য একজনকে পাপেট বানিয়ে নির্বিঘ্নে ঢাকা-কোলকাতা আসা যাওয়া করতে ব্ল্যাক রঞ্জু। তার দলের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ছাড়া বাকিরাও তাকে চিনতো না। কোলকাতায় আর ঢাকায় সে রঞ্জুর আশ্রয়দাতা মৃণাল হিসেবেই পরিচিত ছিলো তার দলের কাছে। বাস্টার্ড নকল রঞ্জুকে খুন করার কিছুক্ষণ আগে কাকতালীয়ভাবে মাউন্ট অলিম্পাস থেকে ব্ল্যাক রঞ্জু অর্থাৎ মৃণাল বের হয়ে যায়। তারপর যখন জানতে পারে অলিম্পাসে খুনখারাবি হয়ে গেছে, তার গোপন আস্তানার কথা ঢাকা এবং কোলকাতার পুলিশ জেনে গেছে তখন সে দেরি না করে ঢাকায় চলে আসে। এখানে এসেই রঞ্জু খোঁজ নেয় কে তার পেছনে লেগেছে। ঢাকা শহরের বেশ কয়েকটি থানার কিছু দুর্নীতিবাজ পুলিশ অফিসার রঞ্জুর হয়ে কাজ করতো, তাদেরই একজন হোমিসাইড থেকে পাঠানো বাস্টার্ডের পরিচয় আর ছবি সরবরাহ করে রঞ্জুকে।

ছবি আর পরিচয় জানার পর ব্ল্যাক রঞ্জুর জন্য কাজটা খুব সহজ হয়ে যায়। ঢাকায় তার পুরো নেটওয়ার্কটাকে ব্যবহার করে সে। খুব দ্রুতই খোঁজ পেয়ে যায় বাস্টার্ড নামের খুনি বাস করে কলাবাগানের একটি দোতলা বাড়িতে। খবরটা আর কেউ নয়, ঐ বাড়িরই কেয়ারটেকার মজিদের ছেলে রিপন তাকে দেয়। সে একেবারে নিশ্চিত করে, বাস্টার্ড বর্তমানে ঐ বাড়িতেই আছে। চরম প্রতিহিংসায় জ্বলতে থাকা ব্ল্যাক রঞ্জু তার বিশ্বস্ত চারজন ক্যাডার নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় কলাবাগানের ঐ বাড়িতে। তারপরই ঘটে এইসব খুনখারাবির ঘটনাগুলো।

তার কাছ থেকে কিছু জানতে না পেরে হতাশ হয়ে জেফরি বলে, "জানি, তুমি কিছু বলবে না, তবে মনে রেখো, একদিন না একদিন আমি ঠিকই সেটা জানতে পারবো।"

কথাটা বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সে। "জায়েদ রেহমানের হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে তোমাকে হয়তো আঁটকাতে পারবো না, কিন্তু ব্ল্যাক রঞ্জর ঘনিষ্ঠ লোকদের হত্যা করার জন্য তোমার বিরুদ্ধে মামলা হবে। মনে রাখবে, তুমি শেষ পর্যন্ত একজন প্রফেশনাল খুনি। স্রেফ খুনি।" কথাটা বলে দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকায় জেফরি বেগ। "এই উমা মেয়েটার বোধহয় তোমার প্রতি এক ধরণের মায়া জন্মে গেছে," বলে সে। "আমি জানি না তোমার মতো একজনের প্রতি তার এই মায়া মমতার কারণটা কী।"

স্থিরচোখে তাকিয়ে থাকে বাস্টার্ড।

"তবে এটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। এটা নিতান্তই তোমার সমস্যা, মি: তওফিক।" কথাটা বলেই চলে যায় জেফরি বেগ।

আহত হবার বিশ দিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাস্টার্ড সোজা চলে গেলো জেলখানায়। তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি হত্যার অভিযোগ তদন্ত করছে হোমিসাইড। মামলা করারও প্রস্তুতি চলছে। জেলখানায় চলে যাবার পর তার সাথে শুধুমাত্র তিনজন লোক দেখা করতে এলো। তাদের মধ্যে উমা বেশ কয়েকবার, শুটার সামাদ আর অমূল্য বাবু একবার করে। অমূল্য বাবু তাকে আশ্বস্ত করে বলে যায় আর কিছু দিন অপেক্ষা করার জন্য। তবে সে জানতো না অপেক্ষা করলে কী এমন হবে।

উমা মেয়েটি কেন তার সাথে জেলখানায় দেখা করতে আসতো সে জানতো না। তবে মেয়েটা এলে তার খুব ভালো লাগতো।

দীর্ঘ দুই মাস তাকে জেলে থাকতে হলো। এই সময়ে দেশে অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় নির্বাচন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, যাকে তার নিজের স্বামী হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলো, সবাইকে অবাক দিয়ে তার দলই নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করলো। নতুন সরকার গঠিত হবার দু'মাসের মাথায় অদৃশ্য এক ইশারায় বাস্টার্ডের জামিন হয়ে যায়। জেল থেকে বের হয়ে এলে অমূল্য বাবু তাকে জানায় দেশে না থেকে সে যেন বিদেশে কোথাও চলে যায় দু'একবছরের জন্য। তারপর ফিরে এসে স্বাভাবিক জীবনযাপন করলে তার কোনো সমস্যা হবে না। এই ফাঁকে তার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। জেফরি বেগও তার পেছনে লাগতে পারবে না।

বাস্টার্ড আর উমা বসে আছে এক রেস্তোরাঁর নির্জন কোণে। দিনের এ সময়টাতে খুব একটা ভীড় নেই। আজ উমার ডিউটি অফ। নার্সের চাকরিটা পারমানেন্ট করতে গিয়ে বরখাস্ত হয়েছিলো তারা অনেকেই। তাদের মধ্যে কয়েকজন সেই বরখাস্তের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করলে শেষ পর্যন্ত রায় তাদের পক্ষে যায়। চাকরিতে পুণর্বহাল হয় তারা সবাই। হোমিসাইড থেকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বিধ্বস্ত অবস্থায় ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরেই জানতে পারে এই সুখবরটা। খুব দ্রুততই ফিরে যায় পুরনো চাকরিতে।

উমা এখনও রামপুরায় থাকে। চাকরিতে জয়েন করার কারণে তার ব্যস্ততা বেড়ে যায় ফলে বাড়ি বদলানোর সময় আর পায় নি। কাকতালীয়ভাবে উমার ডিউটি পড়ে ক্রিমিনাল ওয়ার্ডে, আর বাস্টার্ড আহত হয়ে ঠিক সেই ওয়ার্ডেই ভর্তি হয়। হাসপাতালে দীর্ঘ বিশ দিন থাকার কারণে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরো গাঢ় হয়ে ওঠে। যদিও তারা দুজনেই জানে না তাদের সম্পর্কটা আসলে কি। কেউ কাউকে মুখে কিছু বলে না কিন্তু দু'জন দু'জনের সঙ্গ পছন্দ করে। কথা না হলে ভালো লাগে না। দেখা না হলে অস্থির হয়ে ওঠে।

"কালকেই তোমার ফ্লাইট?" আস্তে করে বললো উমা। বাস্টার্ড খেয়াল করলো মেয়েটার দুচোখ ছলছল করে উঠেছে।

মাথা নেড়ে সায় দিলেও কিছু বলতে পারলো না সে। তারও কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এলো।

"আমার সাথে যোগাযোগ রাখবে নিয়মিত?" চোখে চোখ রেখে বললো উমা। সেই চোখ ভেজা।

আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। তার বুক ফেঁটে যাচ্ছে। কান্না চেপে রেখেছে। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। জীবনে এতোটা ভঙ্গুর কখনই ছিলো না। এতোটা আপন করে কাউকেই ভাবতে পারে নি। এরকম সুখও বোধহয় কখনও পায় নি সে। হাসপাতাল থেকে জেলে চলে যাবার পর যে লোক বের হয়ে এসেছে সে একেবারেই ভিন্ন মানুষ।

উমা শাড়ির আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছে দিলো। সে বাধা দিলো না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর একটা সিএনজি করে উমাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলো। উমার সাথে দেখা করার আগে থেকেই একটা কথা বলার জন্য মনস্থির করে রেখেছে কিন্তু বলতে পারছে না। অবাক হয়ে বুঝতে পারলো, তার হৃদপিণ্ডটা রীতিমতো লাফাচ্ছে। মানুষ খুন করতেও এরকম হয় নি কখনও।

উমা যখন সিএনজি থেকে নামবে তখনই মনে হলো এ জীবনে বোধহয় কথাটা আর বলা হবে না। কিন্তু হঠাৎ করেই তার মুখ দিয়ে একটা কথাটা বের হয়ে গেলো।

"আমি যদি বলি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি কি কিছু মনে করবে?"

স্থির চোখে চেয়ে রইলো উমা। তার চোখ দুটো কেমন যেনো দেখাচ্ছে। কিছু না বলে সিএনজি থেকে আস্তে করে নেমে গেলো সে। জীবনে এই প্রথম তার হৃদপিণ্ডটার কোনো শব্দ শুনতে পেলো না। চারপাশটা কেমন জানি অচেনা হয়ে উঠলো মুহূর্তে।

হঠাৎ উপুড় হয়ে সিএনজির ভেতরে তাকালো উমা।

"না, বাবলু!"